ভ্রাম্যমাণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুরসুধাকর

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

নূতন সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ,
১৮৮৬ শকাব্দ

টা. ৭·৫০

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ
পরম স্নেহাস্পদেষু !

এমন সকাল, সুখের সবুজ পথ — সুমিষ্ট বেশে
কাছে এসে নিতি নিতি শিশুর যে প্রীতি — সে-তোমার অন্তরের
নেই চাওয়ার স্বীকৃতি তোমার সকল স্বপ্নময়,
কোথা সে যায় ফিরে কেবল প্রাণ যে নবীন অভিযান।

আমি কিছু দেব? হে চির-উদার! কে তোমায় দেয় দান?
শুধু বলি — "ভাই, আমার কাছে পাই ঠিকানা নেই তোমায়।
তুমি শেষে যখন যাবে — যখন তখন, চলার সময় বেলা:
শুধু দূরে দিনে যে, সে এসে দিনে প্রাণে যে-চলার খেলা,
তবু হে স্নেহের আজ দাও তব : জয়, জয়, জয়, জয়
জয়-গান গাইবার এ-পুরস্কার — স্নেহ তব, স্নেহময়!"

ইতি। চিরশুভার্থী
নি-লিমাদা



প্রথম সংস্করণের নিবেদন

"ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা" ধারাবাহিকভাবে একাধিক মাসিকী ও সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। যখন লিখতে আরম্ভ করি, তখন ভেবেছিলাম আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাছে ওস্তাদ-বাইজীর গানবাজনার প্রসঙ্গে এ-হেন লেখা অবজ্ঞাত হবেই হবে। সৌভাগ্যবশতঃ তা হয়নি এবং পরে অনেকেই আমাকে ধরেছিলেন "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা" পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে। তাই মনে হ'ল—প্রবন্ধগুলি একত্রে সম্বদ্ধ হ'য়ে প্রকাশিত হ'লে অন্ততঃ জনকয়েক সঙ্গীতানুরাগীও সেগুলি হাতের কাছে পাবেন ও কখনো কদাচিৎ এ-বিষয়ে একটু-আধটু ভাবলেও ভাবতে পারেন।

য়ুরোপ থেকে দেশে ফিরে যখন প্রথম দেশবিদেশের গুণীর গান শোনার খেয়াল চাপে, তখন আমি নিছক গান শোনার লোভেই পরিব্রাজক হই। এ-শোনার অভিজ্ঞতাকে ছাপার হরফে প্রকাশ করবার দুঃসাহস হয় আমার পরে—যখন ১৯২৩ সালে আমি মহাপ্রাণ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শে আসি: কারণ তিনিও দেশদেশান্তর ঘুরে আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করতে যথেষ্ট অর্থ ও সময় ব্যয় করেছিলেন। তবে আমাদের উচ্চ সঙ্গীতকে তিনি যে-ভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, আমি ঠিক সেভাবে দেখতে চাই নি। তিনি ভ্রাম্যমাণ হয়েছিলেন—ভিন্ন ভিন্ন দেশের ওস্তাদ ও সমজদারদের মধ্যে আমাদের সঙ্গীতের প্রচলিত স্বরূপটি নির্ধারণ ক'রে আমাদের রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ রচনা করতে। আমি বেরিয়েছিলাম—আমাদের বর্তমান সঙ্গীতের মধ্যে যেটুকু খাঁটি আর্ট আজও বিরাজ করছে সেটুকুর খবর নিতে। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন—আমাদের সঙ্গীতের বিকাশকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে, আমি যাযাবর হয়েছিলাম নিছক রসের লোভে।

এ বইটি প্রকাশ করতে সাহসী হ'বার আরো একটা কারণ আছে: আমাদের হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের বিকাশধারার একটা মূলগত পরিবর্তনের সময় এসেছে, যে জন্য আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্ভীক আলোচনা ও সশ্রদ্ধ মনোযোগ আবশ্যক। এখন সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কর্তব্য আমাদের সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কেননা একথা আমরা না বুঝলে

আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই যে, আমাদের ললিতকলাটি আজ যে-সম্প্রদায়ের একচেটে হ'য়ে পড়েছে তাঁদের দ্বারা আর যে-ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভব হোক না কেন, সুর-ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এ সাদা সত্য কথাটিও জোর ক'রে বলতে হয়: পাশ্চাত্য জগতে এটা স্বতঃসিদ্ধবৎ গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ ললিতকলার নবযুগ প্রবর্তনের সঙ্গে যথার্থ 'কাল্‌চারের' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সচেতন হননি। অথচ কাল্‌চারের সঙ্গে প্রতিভার মিলনে যে ললিতকলার বিকাশ কী দ্রুতগতি হয় তার প্রমাণ—চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ ও অভিনয়কলায় শিশিরকুমারের অভ্যুত্থান: কেবল দুঃখ হয় ভাবতে যে আমাদের সঙ্গীতের এ হেন কোন উজ্জ্বল বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের সমসাময়িক পেশাদারী ওস্তাদদের কারুর কোনও স্ফুট ধারণাই নেই—সৃজনশীল অন্তর্দৃষ্টি তো দূরের কথা। তবে এ কথা আমি প্রবন্ধান্তরে বিশদভাবে বলবার প্রয়াস পেয়েছি।*

আমাদের সনাতন সঙ্গীত ও ওস্তাদদের সমালোচনা ক'রে আমি স্পর্ধা প্রকাশ করেছি—এ-অভিযোগের উত্তরে আত্মরক্ষার্থ আমার আরও একটি বক্তব্য আছে। তবে সে সাফাইটির অবতারণা করতে হ'লে অভিযোগটি একটু খোলসা ক'রে বলা দরকার।

কথাটা এই যে, প্রবীণের দল সময়ে অসময়ে তারস্বরে ঘোষণা ক'রে থাকেন যে পলিত কেশ, স্খলিত দন্ত, লোল চর্ম ও কুব্জ দেহ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের কোনও স্বাধীন মতই প্রকাশ করবার অধিকার জন্মাতে পারে না। বিশেষতঃ যখন অজাতশ্মশ্রু আমরা তাঁদের যুগের সে-সব ত্বরিৎকর্মা ঐন্দ্রজালিক গুণীর গান-বাজনা শোনবার সুযোগ পাইনি, যাঁদের গানালাপের সময়ে সাক্ষাৎ তুম্বুরু-হাহা-হুহু প্রমুখ গন্ধর্ব- কিন্নরগণ তাঁদের কণ্ঠে গজিয়ে উঠতেন, তখন আমাদের পক্ষে ব্রহ্মমুখ-নিঃসৃত সে-সনাতন হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা না হ'য়েই পারে না। কেন না (তাঁরা উন্নাসিক হেসে বলেন) আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপটি সম্বন্ধে আমরা কী-ই বা জেনেছি!

এ অভিযোগটিকে যাঁরা সারগর্ভ মনে ক'রে থাকেন, তাঁরা প্রায়ই

* বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩—"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধে।

সেকালকার মানুষ—যাঁদের চোখে শুধু আজকালকার ছেলেরা নয়, আজকালকার সবই অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য হ'য়ে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক হিউম বলেছেন: **To declaim against present times and magnify the virtues of remote ancestors, is a propensity almost inherent in human nature.** এ-মনোভাবের তলস্পর্শ করা খুব কঠিন নয়: যে মাছটা পালায় সে মাছটাকে বড় ক'রে দেখার সস্তা প্রবণতা আর কি।

সুতরাং আমরা আজকাল যে-সব ওস্তাদের গানবাজনা শুনে থাকি তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গায়ক যে আমাদের ঠিক অব্যবহিত আগেকার যুগে ঝাঁকে ঝাঁকে মিলত, বিজ্ঞভাষীদের গম্ভীর সাক্ষ্যেও একথা সরাসর মেনে নেওয়া কঠিন। বস্তুতঃ নানা কারণে আমাদের জাতীয়-জীবনে তামসিকতার প্রভাব বহুদিন ধরে খুবই বেশি ও বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে—যার ফল ললিতকলার উপর না ফলেই পারে না। তাই মনে হয় যে আমাদের ঠিক আগেকার যুগেও আজকের মতন দু-চারজন মুষ্টিমেয় গুণীই সত্য শিল্পের মন্দিরে প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখতেন। প্রবীণেরা হয়ত এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্যে ডজন দুই তিন সাত আট গজী কালোয়াতি নাম আওড়ে আমাদের হকচকিয়ে দেবার প্রয়াস পাবেন। কিন্তু তবু অবুঝ মন মানা মানে না, শুধায়—শুধু পরলোকগমনের জোরেই জঙ্গ বাহাদুর বা রাও সাহেব ওস্তাদ উপাধি দাবি করতে পারেন কি না। এ-সন্দেহ যে অমূলক নয় তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যদি আমরা একটু নির্ভীকভাবে সে-যুগের মহাকালের ভুক্তাবশিষ্ট দু একজন কালোয়াতের গান শুনতে যাই—যেমন ধরুন সঙ্গীতরত্নাকর বৈরম-কুলতিলক মহাধনুর্ধর আল্লাবন্দে খাঁর খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের হুহুঙ্কার আলাপ। ইনি কতকটা আভাষ দিতে পারেন—সে-যুগে কাদের ওস্তাদ ব'লে লোকে দূর থেকে দণ্ডবৎ করেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত। কথায় বলে এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়। আজ যে-সব ওস্তাদদের স্বরূপ আমরা ধ'রে ফেলেছি, ঢাক বাজাতে জানলে পরবর্তী যুগে সেই সব কালকবলিত ওস্তাদকেই প্রতিভার অবতার ব'লে সাব্যস্ত করা খুব কঠিন কাজ হবে না এইজন্যে যে, তখন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করবার কোনো উপায়ই থাকবে না—পরের মুখে ঝাল খেয়েই বলতে হবে—তাঁরা ছিলেন অতিকায় ওস্তাদ। তাই নবযুগের সঙ্গীতানুরাগী আমরা

নির্বিচারে মেনে নেব কেমন ক'রে যে, আমাদের সঙ্গীত দেড়শো দুশো বছর আগে এমন একটা অদ্ভুত কিছু ছিল যার কোনও ধারণাই আমরা করতে পারি নে?

দ্বিতীয়তঃ যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার ক'রেও নেওয়া যায় যে, হায়রে-সেকালের ওস্তাদি-সঙ্গীত অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা হলেও তা থেকে প্রমাণ হয় না যে চলতি ওস্তাদি-সঙ্গীতের দোষগুণ বিচার নিরর্থক। যে-অতীতের নবোদয় অসম্ভব সে অস্তমিত ব'লে বৃথা অশ্রুপাত ক'রে ফল নেই। বস্তুত আমার বক্ষ্যমাণ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য—বর্তমান সঙ্গীতেরই দোষগুণ বিচার ক'রে তা থেকে তার উচ্চতর আদর্শ নিরূপণের যথাসাধ্য চেষ্টা পাওয়া—"তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ" ব'লে কেঁদে ভাসিয়ে অতীত গৌরবের জয়ধ্বনি করা নয়।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে চাই। সেটা এই যে, আমাকে নিতান্ত দায়ে প'ড়েই অনেক স্থলে আমাদের ওস্তাদ সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে হয়েছে। কেন না তা না ক'রে শুধু তাঁদের গুণগানে মুখর হ'য়ে চললে তাতে ক'রে দৃশ্যতঃ সুশীল হওয়া হয়ত সহজতর হ'য়ে উঠত, কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের ধারার ভবিষ্যতে কি ভাবে সংস্কার করা উচিত, সে বিষয়ে কোনো হদিশ দেওয়া সম্ভব হ'ত না। অবশ্য সঙ্গীতকলার মনোহারিত্ব বাড়াতে হ'লে তার মধুরতা বাড়ানো দরকার, তার সশ্রদ্ধ চর্চা দরকার—এ রকম ফাঁকা বুলি আওড়ানো শক্ত নয়। কিন্তু কোথায় এবং কেমন ক'রে আমাদের সঙ্গীতকলার পতন হয়েছে—সে সম্বন্ধে গঠন-মূলক কোনও ইঙ্গিত করতে হ'লে অন্তরায়গুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালেই নয়। তাই আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ওস্তাদি-পন্থীরা আমার দোষদর্শী সমালোচনায় প্রথম থেকেই অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠে যেন একটু সহৃদয় ভাবে এই কথাটি বুঝবার চেষ্টা করেন যে ওস্তাদ সম্প্রদায়ের নানা কুরীতি ও কুসংস্কারকে আক্রমণ করায় আমার শুধু যে কিছু লাভ থাকতে পারে না তাই নয়, লোকসানের ভয়ই ষোলো আনা—কারণ আমাদের গানকে বড় করতে হ'লে তার ঐতিহ্যের খবর নিতে হবে, আর এ-খবর দিতে পারেন কেবল ওস্তাদেরা। বস্তুতঃ আমি কোনো ওস্তাদকে কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণ করিনি; প্রতি ওস্তাদের গান বাজনার সমালোচনাই আমার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে আমি এমন অনেক

ওস্তাদের ঐকান্তিক সাধনার তথা নিষ্ঠার প্রতি মনেপ্রাণে শ্রদ্ধাবান্, যাঁদের গান আমি নিম্নশ্রেণীর মনে করি। কেবল আমার মনে হয় যে, আমাদের কালোয়াৎ সম্প্রদায় আজকাল যে গতানুগতিকের পথে ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ করবার প্রয়াসী সেটা ভুল পথ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বনামধন্য শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমার এই সামান্য পুস্তকখানির একটি সুচিন্তিত তথা দীর্ঘ পরিচায়িকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

বৈশাখ ১৩৩৩ শ্রীদিলীপকুমার রায়

পরিচায়িকা

১

কোন পুস্তকের ভূমিকা লেখার অর্থ তার দোষগুণ বিচার করা নয়, তার পরিচয় দেওয়া। এ-সত্য কিন্তু অনেকে ভুলে যান। বিলেতি বইয়েও দেখতে পাই, ভূমিকালেখক যে সমালোচক নন—এ ধারণা সকলের নেই। ফলে অনেক গ্রন্থের ভূমিকা তার সমালোচনাচ্ছলে বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণ বোধহয়, এ-জাতীয় ভূমিকা গ্রন্থলেখকের নয়, গ্রন্থপ্রকাশকের অনুরোধেই লেখা হয়।

শ্রীমান্ দিলীপকুমারের ভ্রমণবৃত্তান্তের ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই লিখতে বসেছি, সুতরাং এ-ভূমিকা উক্ত গ্রন্থের প্রশংসাপত্র হবে না, হবে তার পরিচয়পত্র মাত্র।

শ্রীমান্ দিলীপকুমার গুণী হিসেবে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত, এবং লেখক হিসেবেও বাঙলায় সুপরিচিত। অতএব কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁকে আবার পাঠকসমাজের নিকট পরিচিত ক'রে দেবার সার্থকতা কি? সে প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি লেখককে পরিচিত ক'রে দিতে চাইনে, আমি পরিচয় দিতে চাই শুধু তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর।

"ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা" (এ-সংস্করণে "ভ্রাম্যমাণ") বাঙলাভাষায় যথার্থ একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। ইতিপূর্বে এ-ধরণের বই কেউ কখনো লেখেন নি। প্রথমতঃ আমাদের সাহিত্যে ভ্রমণবৃত্তান্তই একান্ত দুর্লভ। প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরে শত শত বাঙালী বিলাতে প্রবাসী হয়েছেন ও প্রবাসান্তে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন বিলেত দেশটা মাটির। কথাটা খাঁটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু সেই মাটির উপর সে দেশে যা আছে, তা এ দেশের মাটির উপর যা আছে, তার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি, সে দেশের সূর্যের আলোও এ দেশের সূর্যের আলোর সবর্ণ নয়। সে দেশের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে পূর্বপরিচিত নয়; সুতরাং এ-সবের সঙ্গে নব পরিচয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম সজাগ হয়ে ওঠবার কথা। কিন্তু শতকরা নিরানব্বই জন বিলেত-ফেরত যে এ বিষয়ে মূক, তার কারণ তাঁরা পৃথিবী পর্যটন করেছেন চোখ কান বুজে।

২

শ্রীমান্ দিলীপকুমার বলেছেন—"প্রায় সকলেই ভ্রাম্যমাণ হন কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই।" অবশ্য তাই। কিন্তু কে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর ছেড়ে ঘুরতে যান, তারই উপর নির্ভর করে, তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত অপরকে শোনাবার ম'ত কি না, আর অপরে তা' ধৈর্য ধ'রে শুনতে পারে কি না।

আমাদের দেশে যাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন, তাঁরা প্রায় সকলেই বিদেশে যান হয় অর্থ উপার্জন করতে, নাহয় অর্থকরী বিদ্যা অর্জন করতে। এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি বিদেশে যান, তিনি প্রায়ই একলম্ফে কোনো একটি বিশেষ স্থানে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ তিনি ডাকের পার্সেলের ম'ত বাঁধা পথ ধ'রে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হন, এবং ঠিক সেই বাঁধা পথ দিয়ে একই উপায়ে বিদেশ থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। এ হচ্ছে একরকম এক ঘর থেকে অপর ঘরে যাবার মতন। তফাতের মধ্যে এই যে, এ-ক্ষেত্রে ঘর দুটির মধ্যে অনেকখানি মাটির অথবা জলের ব্যবধান থাকে, এবং এই ব্যবধানটাও বহুলোকের পক্ষে দেশের ব্যবধান নয়, কালের ব্যবধান মাত্র। কলিকাতা হতে লণ্ডন যেতে কতদিন লাগল, তার হিসেব থেকেই অমরা কতটা পথ উত্তীর্ণ হলুম তার হিসেব পাই। কাল পদার্থটি মনোগ্রাহ্য আর দেশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কাজেই এজাতীয় যাত্রার সঙ্গে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। এ-শ্রেণীর ভ্রমণকারীরা নিজেরা চোখে কিছু দেখে না বলে অন্যকেও কিছু দেখাতে পারে না; নিজের কানে কিছু শোনে না বলে অন্যকেও কিছু শোনাতে পারে না। ত্রেতাযুগে ভগবান্ পবননন্দন এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন; কলিযুগে আমরাও এক লম্ফে সমুদ্র লঙ্ঘন করে ইংলণ্ডদ্বীপে উপস্থিত হই। ফলে ভগবান পবননন্দন সমুদ্রযাত্রার কোনও বর্ণনা লিখতে পারেন নি, আমরাও পারি নে।

৩

শ্রীমান্ দিলীপকুমার যে উদ্দেশ্য নিয়ে সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করেছেন, সেটি হচ্ছে অর্থ-উপার্জন নয়, একটি বিশেষ জ্ঞান অর্জন। এজাতীয় জ্ঞানার্জনের প্রয়াস ইতিপূর্বে কেউ কখন পেয়েছেন ব'লে আমার জানা নেই। তাঁর নিজের কথায়—"সেটি হচ্ছে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের

গান শোনা, অবশ্য গানের মধ্যে বাজনাও বুঝে নিতে হবে।” এক হিসেবে তাঁর এ-ভ্রমণ হচ্ছে একরকম তীর্থভ্রমণ। কারণ সঙ্গীত তাঁর কাছে ধর্মের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। সঙ্গীতের সাধনা যে একরকম ধর্মের সাধনা, এ-বিশ্বাস এ-দেশে সনাতন। এমন কি, যদি কেউ বলেন যে একাগ্র-ভাবে সঙ্গীতের সাধনা করা মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়, তাহলে সে-কথায় কোন সেকেলে হিন্দু আপত্তি করবে না। ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে অবশ্য সঙ্গীতের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীমান্ দিলীপকুমার আমাদের আর পাঁচজনের মত, ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী। সুতরাং তাঁর পক্ষে এরূপ সঙ্গীতভক্তি বাস্তবিকই অসাধারণ। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইংরাজীপড়া লোক, শিক্ষার গুণে বা দোষে, অধিকাংশই উদাসীন। আর যে-অল্পসংখ্যক লোকের এ-বিষয়ে প্রীতি আছে, তাদেরও সে প্রীতি ভক্তি অর্থাৎ পরাপ্রীতিতে গিয়ে পৌঁছয় নি।

শাস্ত্রে বলে সাধনের উপায় তিনটি—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ যে সাধনের একটি অঙ্গ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবত এক পলিটিকাল সাধন সম্বন্ধে এ-শাস্ত্রমত খাটে না। ও ক্ষেত্রে সাধনার একাগ্র উপায় হচ্ছে বাচন—শ্রবণ নয়। সে যাই হোক, সঙ্গীতের সাধনা করতে হ'লে, সে-বস্তু যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর করতে হয়, সে বিষয়ে আশা করি জ্ঞানী ও গুণি-সমাজে মতভেদ নেই। সুতরাং শ্রীমান্ দিলীপ যে “গান শুনতে” বেরিয়েছিলেন, তার মূলে আছে বিদ্যা অর্জন করবার অদম্য প্রবৃত্তি। ইংরাজীতে যাকে বলে নিরর্থক কৌতূহল (idle curiosity) সে-সোখীন মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি ভ্রাম্যমাণ হন নি।

৪

শ্রীমান্ দিলীপকে এ-উদ্দেশ্যে যে কত দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তা যিনি “ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা” আদ্যোপান্ত পাঠ করবেন তিনিই তাঁর পরিচয় পাবেন। শ্রীমান্ দিলীপ সত্যসত্যই ভ্রাম্যমাণ হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণের পথ বৃত্ত, সরল রেখা নয়। তিনি কম্পাসের কাঁটার সাহায্যে তাঁর ভ্রমণের দিক নির্ণয় করেন নি, তাঁর গতিও নিয়ন্ত্রিত করেন নি। আজ বেরিলি, কাল সাগর, পরশু বম্বে, তার পরদিন মহীশূর: পাঠকের নেত্রপথে বায়স্কোপের ছবির মত ভারতবর্ষের নানা নগরী এই উদয় হচ্ছে, এই অন্তর্হিত হচ্ছে।

অপর কোনও পর্যটক এ-বইকে guide-book হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন না। লেখক নিজমুখেই বলেছেন যে,—"আমার ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে একদিকে যেমন কোনও ধারাবাহিকতা বা পর্যায় খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই, তেমনি অপরদিকে ভ্রমণসংক্রান্ত নানান খুঁটিনাটি খবরের আশাও যেন কেউ রাখেন না।" ফলে তিনি ভারতবর্ষের জিওগ্রাফির তাস আমাদের চোখের সুমুখে সাজিয়ে ধরে দেন নি।

শ্রীমান্ দিলাপ দেশ দেখতে যান নি, গিয়েছিলেন শুধু গান শুনতে। তাহলেও তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে ঘুরে বেড়ান নি। এই ভেস্তানো তাসের মধ্যেও অনেক ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে-সব ছবি প্রায়ই স্ত্রী-পুরুষের অর্থাৎ গায়ক-গায়িকার। ভারতবর্ষের গায়ক-গায়িকার দল ইংরাজ কবির বর্ণিত Cuckoo-র মত অশরীরী ধ্বনিমাত্র নয়। এঁদের সকলেরই দেহ আছে, এবং কারও বা সে দেহ বিপুল। জনৈক বাইজির দেহে নাকি একখানি গরুর গাড়ী বোঝাই করবার মত মেদ, মাংস ও বসা বিরাজ করে। আশা করি চন্দ্রপ্রভা নর্তকী নন। এ গ্রন্থে চিত্রের অভাব নেই, portrait এরও নয় landscapeএরও নয়; তবে তার সংখ্যা বেশি নয়। মনে রাখবেন শ্রীমান্ দিলীপের সাধনার ধন ছবি নয়—গান।

৫

এই অনন্যসাধারণ দেশহিণ্ডনের ফলে শ্রীমান্ দিলীপকুমার কী সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? তিনি যা আবিষ্কার করেছেন, তা তিনি অতি স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন। তাঁর কথা এই—"আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে,—ভাবলে মন বিস্ময়ে ও আক্ষেপে অভিভূত না হয়েই পারে না।"

এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেননা অনেকের বিশ্বাস যে, সঙ্গীতবিদ্যা ভারতবর্ষের একটা প্রধান গৌরবের বস্তু, এবং সে-মহাবস্তু আজও কালোয়াৎদের কণ্ঠস্থ আছে। সুতরাং শ্রীমান্ দিলীপের মুখে এ-অপ্রিয় সত্য শুনে, অনেকের জাতীয় অহঙ্কারে আঘাত লাগবে। ব্যাপারটা যে আক্ষেপের বিষয় সে কথা শ্রীমান্ দিলীপও স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, এবং এ-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়ে তিনিও বিস্মিত হয়েছেন; কারণ তিনিও এই আশায় ভর করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে এ-মহাবিদ্যার জীবন্ত মূর্তির দর্শনলাভ করবেন।

যে-সকল কারণে ওস্তাদজীদের গান তাঁর মনস্তুষ্টি সাধন করতে পারে নি, সে-সব কারণে শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালীর কাছে, সে-সঙ্গীত একেবারে অসহ্য হত। বিকৃত মুখভঙ্গী, কর্কশকণ্ঠ, বিকট চীৎকার, সুরের ডন বৈঠক, তালের দৌড়ঝাঁপ, আমাদের অনেকেরই পক্ষে যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি শ্রুতিকটু। বাঙলাভাষায় "কালোয়াতি" কথাটা কি হীনার্থে ব্যবহৃত হয় না? কালোয়াতির যে-নমুনা শুনে সাধারণ বাঙালীরা উচ্চাঙ্গের হিন্দু সঙ্গীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, শ্রীমান্ দিলীপ নানা দেশে গিয়ে সেই বস্তুর বহু লম্বাচৌড়া নমুনার পরিচয় পেয়েছেন। এর ফলে তিনি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকেন যে, অধিকাংশ ওস্তাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শুধু কস্‌রৎ মাত্র তাতে আর যারই হোক আমাদের অবাক্ হবার কোনোই কারণ নেই।

৬

ভারতবর্ষের অধিকাংশ নামজাদা গায়কের গান শ্রীমান্ দিলীপের ভাল লাগে নি, এবং কেন যে ভাল লাগে নি সে-কথাও তিনি খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন। তাঁর বক্তব্য এই: "সমগ্র ভারত ঘুরে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা আজ মুমূর্ষু। অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না, এ-সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই।" এ কথা শুনে অনেকে ক্ষুব্ধ, এমন কি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা যে মুমূর্ষু, এ-সংবাদে আমরা দুঃখিত হতে পারি, কিন্তু সংবাদ-দাতার উপর ক্রুদ্ধ হবার কোনোই কারণ নেই। তিনি যে বলেছেন যে "এ-সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই"—এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। আর যিনি এ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়ে দেন, তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়াই কর্তব্য। তবে দিলীপকুমারের এই মত সত্য কি না, তাই হচ্ছে বিচার্য।

দিলীপকুমার দেদার ওস্তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কিন্তু দুই চারটি ছাড়া আর্টিস্টের সাক্ষাৎ পান নি। ওস্তাদে ও আর্টিস্টে প্রভেদ কোথায়? ওস্তাদ হচ্ছেন তিনি, যিনি সঙ্গীতের একমাত্র **technique**এর চর্চা করেন, কিন্তু তার রসের খবর রাখেন না। এ-কথা শুনলেই তাঁদের অহমিকায় আঘাত লাগে,

যাঁরা মনে করেন যে তাঁরা ওস্তাদ। **Technique** হচ্ছে সঙ্গীতের দেহ, তার প্রাণ নয়। প্রাণহীন দেহ যে থাকতে পারে, সে তো প্রত্যক্ষ সত্য। অপর-পক্ষে দেহই যে প্রাণ—এ-ধারণাও বহু লোকের আছে। আর্টের জগতেও দেহাত্মবাদীর সংখ্যা কম নয়। ব্যাকরণের বন্ধন ব্যতীত ভাষা সাকার হয় না। কিন্তু ব্যাকরণ ও ভাষা যে এক জিনিষ নয়, এ কথা আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে যাদের বলে "ব্যাকরণাভ্যাসাৎ জড়বুদ্ধিঃ", তাদের বোঝানো অসম্ভব। শাস্ত্র বলে রস জিনিষটে হচ্ছে "সহৃদয় হৃদয়-সংবেদ্য"। এই হচ্ছে কথা। অবশ্য সংস্কৃত হৃদয়ের সঙ্গে বাংলা হৃদয়ের নাড়ীর যোগ নেই। আমরা ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীরা হৃদয় বলতে বুঝি **sentiment**; কিন্তু **senti-mentalism** আর্টের নিকট অস্পৃশ্য। এ-জ্ঞান শ্রীমান্ দিলীপের আছে। তিনি বলেছেন যে—"গানের মধ্যে **intellectual** আবেদন না থাক্‌লে গান উচ্চ সঙ্গীত হয় না।" এই সূত্র ধ'রেই সঙ্গীত নামক আর্টের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করবার অধিকার আমরা পাই।

৭

শ্রীমান্ দিলীপের এ-ভ্রমণ কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা হয়নি। তিনি ভারতবর্ষে এমন জনকতক গুণীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁরা যথার্থ আর্টিস্ট। এ বিষয়ে তাঁর কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন যে ঃ

"শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কি তা বুঝতে হলে, আলাউদ্দিন, আবদুল করিম, চন্দন চৌবে, ফৈয়াস খাঁ, মন্মোহনলাল, ফিদা হোসেন, শেষণ, উজীর খাঁ, জয়পুরের গহর বাই, মম্মন খাঁ প্রমুখ জনকয়েক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকেই কষ্টিপাথর হিসেবে ধরে নিলে বোঝা সহজ যে, কোন্‌টা সত্য আর্ট, আর কোন্‌টা লম্ফঝম্প।"

এ কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। কারণ আমার বিশ্বাস যে, কোনো দেশে কোনো যুগেই যথার্থ আর্টিস্টের সংখ্যা অসংখ্য ছিল না, এখনও নেই। ভারতবর্ষে বর্তমানে যদি এতগুলি যথার্থ আর্টিস্ট বিদ্যমান থাকেন, তাহলে স্বীকার করতে হবে এ দেশে আজও সঙ্গীতকলার মৃত্যু হয়নি। অপর একটি আর্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই আমার কথার সার্থকতা সবাই উপলব্ধি করবেন। বাংলায় আর যে জিনিষের অভাব থাক্, লেখকের অভাব নেই। কিন্তু কাব্য নামক আর্টের শুধু একজন আর্টিস্ট আছেন, এবং তাঁর নাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর ওই এক কবিই সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

৮

শ্রীমান্ দিলীপ যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন যন্ত্রসঙ্গীতের সাধক। কণ্ঠের অনেক দোষ যন্ত্রে বর্তায় না। যন্ত্রের ধ্বনি কর্কশ হয় না, যন্ত্রের মুদ্রাদোষ নেই। তারপর সুরকে ব্যস্ত-সমস্ত করবার, তার কান মুচড়ে দেবার, সংক্ষেপে রাগবিস্তার করবার যতটা অবসর যন্ত্রে আছে, কণ্ঠে ততটা নেই। যন্ত্রের হুবহু অনুকরণ করতে গেলেই কণ্ঠ স্বধর্ম হারিয়ে বসে, এবং সেই সঙ্গে তার মাত্রা-জ্ঞানও লুপ্ত হয়। যন্ত্র অবশ্য কণ্ঠকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করতে পারে, কিন্তু কণ্ঠের পক্ষে যন্ত্রকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করা অসাধ্য। ইউরোপে কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ-বিচ্ছেদের প্রসাদে উভয়েই মুক্তি লাভ করেছে। প্রথমটি এখন **Melody**-র অধিকারে, দ্বিতীয়টি **Harmony**-র।* সুতরাং সে দেশের গায়কদের স্বাধিকারপ্রমত্ততার পরিচয় দেবার সুযোগ নেই। এ-দুটি-যে সঙ্গীত হিসেবে বিভিন্ন আর্ট, আমাদের দেশের লোকের আজও সে-ধারণা নেই। এবং আমার বিশ্বাস যে, আমাদের কণ্ঠ-সঙ্গীতের অনেক বিকারের মূল কারণ এই।

শ্রীমান্ দিলীপের বই প'ড়ে আর একটি কথা আমার মনে উদয় হয়েছে। তিনি যে-সকল শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগ গুণীই Native States অর্থাৎ সেকেলে ভারতবর্ষের অধিবাসী। সঙ্গীত-কলা মুমূর্ষু দশা প্রাপ্ত হয়েছে শুধু ইংরাজ-শাসিত ও ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবর্ষে। ভক্ত শ্রোতার অভাবে সঙ্গীত প্রাণধারণ করতে পারে না— যেমন সহৃদয় পাঠকের অভাবে কাব্য থাকতে পারে না। বাণী কিছুকাল ধরে অরণ্যে রোদন করে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েন।

ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সকলপ্রকার আর্টের প্রতিই অল্পবিস্তর অবজ্ঞা আছে। যাকে আমরা নবসভ্য মনোভাব বলি, তা ষোলো আনা **materialistic**—অপরপক্ষে আর্ট জিনিষটি spirit-এর বস্তু। এ দেশের মুমূর্ষু-সঙ্গীতকলাকে যদি আবার সঞ্জীবিত করতে হয়, তাহলে তার উপায় **Reformation** নয়—**Renaissance**; **technique**-এর বাহ্য-সংস্কার নয়—আমাদের অন্তরাত্মার নব উদ্বোধন। শ্রীমান্ দিলীপের গ্রন্থ আশা করি বহু পাঠকের এ বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দেবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

---

* তথ্যহিসেবে একথা সত্য নয়। কণ্ঠসঙ্গীতে part-singing বা counterpoint-ও আছে যার প্রতিষ্ঠা হার্মনি-তে। —গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু,

তুমি সেদিন যখন "ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা"-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার প্রস্তাব করলে, আমি প্রথমে বলেছিলাম যে এ-বইটি পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে লিখেছিলাম সে-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, কাজেই দ্বিতীয় সংস্করণ নাই বা বেরুল। তুমি তবু ছাড়লে না ব'লে আমি বইটি নিয়ে বসলাম ফের মাজাঘষা করতে। তুমি এ-বইটি পড়েছ কি না জানি না, তবে একসময়ে 'ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা' সঙ্গীতকোবিদদের কাছেও আদরণীয় ছিল। এমনকি স্বনামধন্য গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ও একবার আমাকে বলেছিলেন যে, পুরাকালে তিনি এ-বইটি থেকে নানা সঙ্গীততথ্য তথা তত্ত্ব আহরণ করতেন। তাই এ-সম্পর্কে কিছু বলি বহুদিন বাদে এ-বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়। স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতেই লিখি, কারণ এ-ভঙ্গিতে বক্তব্য সরস ও স্বচ্ছন্দ হয় সহজেই।

বলেছি ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে। শ্রীপ্রথম চৌধুরী ওরফে বীরবল একটি নাতিদীর্ঘ পরিচিতি লিখে বইটিকে রাতারাতি সর্বাদরণীয় করেন। কিন্তু করলে হবে কি, আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে বইটি পড়তে গিয়ে দেখি যে এর মধ্যে অনেক বর্ণনাবাহুল্য আছে যা ছেঁটে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং এমন অনেক স্থলে ভাষার আড়ষ্টতা আছে যাকে সহজ সাবলীল করাই চাই। গদ্যের ভাষায় হাত খুলতে সময় লাগে। আমারও লেগেছে। ধীরে ধীরে বহুসাধনায় আঁচ পেয়েছি বাংলা ভাষার প্রাণপুরুষের। আধুনিক বাংলায় গদ্যসিদ্ধির গোড়াকার কথা—সরলতা ঋজুতা ও যথাসম্ভব অলঙ্কার বর্জন—যেখানে বাংলা ইডিয়মে মনের কথাটি সহজে ফুটে ওঠে সেখানে গুরুগম্ভীর শব্দ চয়ন পরিহার। এর মানে নয় অবশ্য যে সংস্কৃত তৎসম শব্দ সর্বথা বর্জনীয়। সে অসম্ভব। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নাড়ীর সম্বন্ধ—নাড়ী কাটলেও উভয়ের অন্তরঙ্গতা কমতে পারে না। তবে কোথায় সংস্কৃত ধ্বনিসম্পদের আমদানি করতে হবে আর কোথায় ঘরোয়া

বাংলা ইডিয়মকে সোজাসুজি চালু করতে হবে সে-কৌশলটি যোগসিদ্ধির মতনই বহুসাধনা বিনা আয়ত্ত হয় না। শুধু এইটুকু বলা চলে যে লেখক যদি ভাষার সাধনার সঙ্গে সমান তালে আন্তরিকতার (**sincerity**) সাধনা ক'রে চলেন, তবে তিনি যথাকালে বঙ্গবাণীর প্রসাদ পানই পান—যার ফলে চোখের ঠুলি খসে, দেখতে পাওয়া যায়—কোথায় **Sound must seem an echo to the sense,** অর্থাৎ অনুভবের কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে ভাষার মধ্যেও জেগে ওঠে হিল্লোল, সুষমা, সঙ্গীত।

তাই ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকার ভাষাশুদ্ধি করতে গিয়ে আমি এই আন্তরিকতার সাধনাও করতে চেয়েছি সজাগ ভাবে—অর্থাৎ যতটা সহজে পারি মনের কথা বলতে চেষ্টা করেছি। কেবল একটা কথা : আমি আমার সে-যুগের ভাষার কাঠামো বা শৈলী বদলাই নি। কারণ বদলালে ভ্রাম্যমাণ হয়ে দাঁড়াত নতুন বই। তা আমি চাই নি। কেবল এখানে ওখানে অনেক কিছু বাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু জুড়ে দিয়েছি যা সেকালেও আমার মনে ছিল কিন্তু বলা হয় নি মনের মতন করে। সর্বশেষে একটি পরিশিষ্ট দিয়েছি—বইটির সম্পূর্ণতা দিতেও বটে, আমার সঙ্গীত সাধনা কী ভাবে জীবন সাধনার সুরে সুর মিলিয়ে ধীরে ধীরে ভজন কীর্তনের দিকে মোড় নিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রেখে যেতেও বটে। সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্ভবতঃ এইই আমার শেষ রচনা।

বইটির পরিমার্জনা করতে করতে দুটি সত্য আবিষ্কার ক'রে আমার মন খুশি হয়েছে : প্রথম, বইটির নানা চরিত্র চিত্রণ তথা টীকা-টীপ্পনি এখনো তাজা আছে; দ্বিতীয়, আমার সে-যুগের নানা মন্তব্যের মধ্যে অনেক কিছু আছে যা এ-যুগেও সঙ্গীতানুরাগীদের মন টানতে পারে--আরো এইজন্যে যে তাঁরা দেখতে পাবেন যে আমার যে-সব মন্তব্য আজ সবাই মেনে নিয়েছেন যদিও—তোমরা জানো না—সে সময়ে সে-সব কথা বলার জন্যে কী বিষম নিন্দা সইতে হয়েছিল ওস্তাদ সমাজে! বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি অভিমানের কীর্তনে এই ধরণের একটি আখর ছিল :

হিয়া গোপিকার ছলনে তোমার
পাষাণ না হ'লে ফাটিয়া যেত।

ভগবানের করুণায় সে-যুগে কাঠিন্যে আমার হৃদয় এই বীরবালার হৃদয়ের

সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত বৈ কি, নৈলে আজ তোমরা দেখতে পেতে দিলীপদার হাসিভরা মুখ নয়, ফাটাফুটি হৃদয়।

পরিশিষ্ট ছাড়া একটি প্রায়-প্রবন্ধ এ-দ্বিতীয় সংস্করণে জুড়ে দিয়েছি : হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে আমার যা যা মনে হয়েছে। অনেক দিন থেকেই আমার কয়েকটি সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু এ-বিষয়ে লিখতে অনুরোধ ক'রে আসছেন—আরো এইজন্যে যে নানা কারণে তাঁরা এবিষয়ে প্রকাশ্যে লিখতে সাহস পান না। তাঁরা বলেন যে রেডিও কর্তৃপক্ষের অনেকেই অন্তরে অন্তরে হার্মোনিয়মের পুনঃ-প্রবর্তন চান, কিন্তু হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তিগুলি পেশ করতে পারছেন না দুটি কারণে : এক, কয়েকজন ওস্তাদি-পন্থী তাঁদের অপবাদ রটাবেন সুরানভিজ্ঞ ব'লে ; দুই, উপর-ওয়ালাদের মধ্যে কেউ কেউ বিরক্ত হবেন ব'লে। কিন্তু আমার মনে হয় এ-দুটি ভয়ই ভিত্তিহীন, কারণ এ-ওপরওয়ালারা কখনই বলবেন না যে সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষজ্ঞ, সুতরাং সে সম্বন্ধে তাঁদের মতামত প্রামাণ্য, এবং বহু সুরেলা গায়কই আজ হার্মোনিয়মের সঙ্গতে গেয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন সঙ্গীতকোবিদ ব'লে। যাইহোক, এসম্পর্কে আমার যা যা মনে হয়েছে, আমি ব'লে খালাস—য়া লিখলাম তাতে সুফল ফলবে কি না জানেন এক সর্বকর্মের ফলদাতা।

পরিশেষে তোমাকে ধন্যবাদ দেই শুধু তুমি আমার লেখার অনুরাগী ব'লেই নয়, তোমার উৎসাহ না পেলে ভ্রাম্যমাণ পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না ব'লেও বটে। আশা করি তোমার পয়মন্ত পাবলিসিটির প্রসাদে এ-বইটি আমার অন্য বইগুলির ম'তই জনপ্রিয় হবে। ইতি—

আষাঢ়, ১৩৭১ দিলীপদা

পুনশ্চ। প্রসিদ্ধি আছে পত্রের শেষে পুনশ্চ থাকলে তার দাম বাড়ে যেমন উপন্যাসের শেষে উপসংহার। তাই এখানে একটি পুনশ্চ জুড়ে দিলামই বা।

"ভবঘুরে"-র একটি প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, আমাদের ওস্তাদি সঙ্গীতের প্রগতির পথে পলি পড়তে পড়তে তার বিকাশ থেমে যাবেই যাবে যদি আমরা তার শ্রেষ্ঠ প্রেরণার প্রতিবন্ধকদের দূর করতে না পারি স্বাধীন-

চিন্তার আলোহাওয়ায়—dredging-এ। আজকের দিনে একথা সর্বস্বীকৃত, কিন্তু সে-সময়ে ওস্তাদি-পন্থী গোঁড়াসম্প্রদায় কিভাবে সব বাঞ্ছনীয় সংস্কারেরই পথ আগলে বসে ছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত হঠাৎ মনে পড়ে গেল—শোনোই না। বলতে লোভ হচ্ছে দুটি কারণে: এক সে কালের ওস্তাদি-পন্থীদের দৃষ্টি তথা শ্রুতিভঙ্গির ছবি আঁকতে; দুই, ইংরাজিতে যাকে বলে **unconscious humour** অর্থাৎ গম্ভীর কথা বলতে গিয়ে অজান্তে হাস্যরসের অবতারণা করলে কেমন উপভোগ্য হয় তার খবর দিতে।

আমি সে-সময়ে বাংলা গান, কীর্তন তথা টপ্পাঠুংরির রসালতা সম্বন্ধে সোৎসাহে নানা সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি ও ছাত্রছাত্রী নিয়ে নানা আসরেও চ্যারিটি কন্সার্টে সঘনে গান গেয়ে প্রমাণ করছি যে গানে কাব্য ও সঙ্গীতের সমাহার হ'লে যে-কাব্যসঙ্গীতের উদ্ভব হয় তার রস অতি উপাদেয়—যাকে বলে সোনায় সোহাগা। এই সময়ে খ্যাতনামা ধ্রুপদী তথা মৃদঙ্গী ৺সতীশচন্দ্র দত্ত ওরফে দানিবাবুর খুব প্রতিপত্তি। তিনি তখন গান আর বেশি করেন না, তবে পাখোয়াজ বাজান চমৎকার। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন আন্তরিক কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার মতামতের ছিলেন বিষম বিরোধী। আমি বাংলা গানের স্বপক্ষে কিছু বলতে না বলতে রুখে উঠে বলতেন তারস্বরে: "আরে মশাই, রেখে দিন—বাংলা গান কীর্তন ভজন বাউল আর ঐ ঐ—কী বললেন কাব্যসঙ্গীত না?—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি জানি, অহিনকুল আর কি—এ হেন কাব্য-সঙ্গীতে চতুর্বর্গ! ক্ষ্যাপা না পাগল? কাব্যসঙ্গীত? দূর, ও না সঙ্গীত না কাব্য—যেন গণেশ ঠাকুর—না হাতী না মানুষ। গান তো ধ্রুপদ খেয়াল। টপ্পা ঠুংরি—হ্যাঁ—চলে, তবে একটু আধটু, চাটনি হিসাবে। ভোজ হতে পারে শুধু ধ্রুপদ খেয়ালে—আর কিছুতে ক্ষিধে কি মেটে মশাই? হাল্কামিতে হাসা যায়, কিন্তু মন ভরে কেবল গম্ভীরে। ধ্রুপদ খেয়াল গানের রঙিন রাজা ও মধুর মন্ত্রী বাকি সব বরকন্দাজ, মশাই, বড় জোর কোতোয়াল—ব্যস্, তার বেশি নয়।"

কিন্তু আমাকে সত্যিই স্নেহ করতেন ব'লে আমার এমন কি বাংলা গানেও ধ্রুপদী চৌতাল ধামার তেওরায় সঙ্গত করতেন যথা পিতৃদেবের বিখ্যাত "প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে"—জয়জয়ন্তী চৌতাল কি "যাও হে সুখ পাও" ইমন কল্যাণ ধামার, কি গোবিন্দদাসের "নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন" কীর্তন

তেওরা ইত্যাদি। আমি খুব সম্‌ঝে গাইতাম ধ্রুপদী ভঙ্গিতে। তখন শ্রীরাধিকা গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদে তালিম নিচ্ছি কাজেই বাংলাগানকে নানা ধ্রুপদী জঁাকালো তালে বসিয়ে পাখোয়াজের সঙ্গতে গাইতে পারতাম স্বচ্ছন্দেই। আমার নির্ভুল তালিয়ানায় দানিবাবু প্রসন্ন হ'য়ে সখেদে বলতেন: "আহা! দিলীপবাবু! কোত্থেকে এমন কুমতি হ'ল আপনার বলুন তো? এমন ভগবদ্দত্ত ধ্রুপদী কণ্ঠ পেয়েও আপনি কি না বাংলা গানের দ-য়ে মজতে ছুটেছেন!" দানিবাবু মানুষটি ছিলেন ক্রোধন হ'লেও সহৃদয় তথা স্নেহশীল, তাই তাঁর আক্ষেপ শুনে আমার দুঃখ না হ'য়ে আমোদই হ'ত।

এহেন মানুষ কয়েক বৎসর বাদে—(তখন ওস্তাদি গানের পাশাপাশি বাংলা গানেরো পাত পড়া সুরু হয়েছে, বাংলা গান গুণী সমাজেও একটু একটু ক'রে প্রতিষ্ঠা পেতে আরম্ভ করেছে)—একদা দানিবাবু আমার এক সঙ্গীত-ভাষণের আসরে আহূত হ'য়ে ঠায় একঘণ্টা আমার বক্তৃতা শুনলেন! আমি বললাম: বাঙালী চিরদিনই কবি তথা সুরকার, গায়ক তথা ভাবুক—কাজেই তার পক্ষে শুধু সুরের কুস্তিকসরতে মেতে ওঠাটা হবে পরধর্মবরণে আত্মহত্যারই সামিল। বাঙালী নব নব গানে নব নব সুর বসিয়ে গান করলে তবেই হবে কৃতকৃত্য—হিন্দুস্থানি সঙ্গীত সে শিখবে শ্রদ্ধাভরেই, কিন্তু নিজে সৃষ্টি করতে, শুধু হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীতের পুনরাবৃত্তি ক'রে তার মহিমার ধামাধরা হ'তে নয়। সৃষ্টি জীবনের ধর্ম, পুনরাবৃত্তি নয়, আদর্শ হ'ল **"creation, not repetition"** —বলেছেন স্বয়ং এমার্সন। এইভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়েই আমি ব'লে চললাম—আরো দানিবাবুকে এক হাত নিতে, তাঁর নাম না ক'রে তাঁর বাংলাগান-নিন্দাকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করতে। ভাষণের শেষে আমার বক্তব্যকে প্রমাণ করতে গাইলাম প্রথমে হাফেজের বিখ্যাত ফার্সী গান সপ্তমাত্রিক ধামারে:

অগর অন তুর্কে শিরাজী
বদস্ত্ আ রদ্ দিলেমারা।
বখালে হিন্দু অশ্ বখ্শম্
সমর্কন্দ্ ও বুখারারা। ইত্যাদি

(পুরো গানটি আমার সাঙ্গীতিকীতে ছাপা হয়েছে)

কীর্তন ও ইমনে মিশিয়ে গাইলেও দানিবাবু পার্সী কথা শুনে ভাবলেন উর্দু বা হিন্দি—অর্থপরিগ্রহ করা যায় না—এইই তো চাই—নৈলে কি আর

ওস্তাদি গান ? এই সব ভাবতে ভাবতে আহ্লাদে আটাত্তর খানা হ'য়ে তিনি পাখোয়াজ প্রায় ফাটিয়ে দিলেন ধামার সঙ্গত করতে করতে : কা ধে টে। ধে টে ধা আ॥ গা দি নে। দে নে তা আ॥ তাঁর মুখে সে কী মধুমাখা আনন্দের হাসিরে !—এই তো চাই দুর্বোধ্য বাণীর ওস্তাদি গান—আমারে দুন চৌদুন বোল পড়নের ফুলঝুরি ধরিয়ে দিলেন আত্মহারা উচ্ছ্বাসে।

কিন্তু হা হতোস্মি—এর পরে যেই এর বাঙলা তর্জমা গাইলাম ঐ সুরে তালেই : আমার সেই অন্তরের কান্তা—মিলন তার চায় উছল এই প্রাণ তিলের তার করতে তর্পণ দেই—সমর্কন্দ আর বুখায়রায় দান। রূপের তার করবে বন্দন কে ?—আমার প্রেম—তার কোথায় সম্বল ? আনন যার অপ্সরায় দেয় লাজ—কে দেয় তায় সাজ, ভূষণ, সম্মান !

হৃদয় ! গাও গান অঝোর-ঝংকার :
কে পায় সৃষ্টির রহস্যের তল ?
জ্ঞানের দীপ জ্বালতে চাও ? হায় রে !
আলোয় তার মিলবে কোন্ সন্ধান ?
হাফেজ ! আজ গাঁথলে মুক্তার হার,
গজল মঞ্জুল ঝরুক কণ্ঠে :
অপার নক্ষত্র নীল ছন্দে
বিছাও সুরনন্দনের ফুলতান !

আমার প্রার্সী গানে দানিবাবু মেতে উঠলে হবে কি, সাধারণ শ্রোতা দুন চৌদুনের চরকি বাজিতে উঠছিল অতিষ্ঠ হ'য়ে। কিন্তু যেই বাংলা গান ধরেছি সভায় আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে গেল। বাঙালীর স্বভাব তো—শুধু সুরে তালে সে তৃপ্ত হয় না, সেই সঙ্গে চায় কাব্যরস। দানিবাবু দেখলেন স্বচক্ষে—যেই আর একজন এ-বাংলা গানের সঙ্গে তবলা ধরলেন। গানের শেষে দেখা গেল শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের মধ্যে পুলকের উচ্ছ্বাস : "আর একটা দিলীপ বাবু, আর একটা বাংলা গান।"···ইত্যাদি।

তুমুল উৎসাহের মধ্যে আমার দ্বিতীয় বাংলা গান গাওয়া শেষ হ'লে দানিবাবু খানিক চুপ ক'রে থেকে বললেন : "দিলীপবাবু ! আপনার ভাষণ ও বিশেষ ক'রে আপনার দুটি ঠুংরি চালে গাওয়া বাংলা গানদুটি শুনে আমার আজ চৈতন্য হয়েছে। আর আমি তর্ক করব না। কারণ আমি বুঝতে

পেরেছি আপনি ঠিকই বলেছেন : এখন আপনারই দিন—বাংলা গানেরই যুগ। আপনাকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না—এ অবধারিত। কারণ কী জানেন ? কারণ ভালো ভালো গাইয়ে—ওস্তাদ যাঁরা ছিলেন—তাঁরা প্রায় সবই ম'রে গেছেন।"

টীকা অনাবশ্যক। ইতি।

শুভার্থী
দিলীপদা

প্রায় সকলেই ভবঘুরে হন কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমারও পাঁচ-ছয় মাস ধ'রে সারা স্বদেশে ঘুরে বেড়ানোরও নিশ্চয়ই একটি বা একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। তার মধ্যে প্রধান সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের গান শোনা—অবশ্য গানের মধ্যে বাজনাও বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল, নানারকম চিত্তাকর্ষক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা; ও তৃতীয় উদ্দেশ্য—দেশ দেখা। অবশ্য "দেশ দেখা" বলতে সকলের মুখেই একরকম শোনালেও, প্রত্যেকের দেশ দেখার মধ্যে তার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবেই। আপিসের কাজে আমাদের প্রায় কারুরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। তার কারণ, সে-কাজটার মধ্যে কোনও সহজ স্ফূর্তি বা প্রেরণা নেই, করি প্রাণের দায়ে। কিন্তু ভ্রমণটা অন্ততঃ অধিকাংশ লোকেই আনন্দের প্রেরণাতেই ক'রে থাকে—এক আমেরিকান যাযাবর ছাড়া অবশ্য যাদের উদ্দেশ্য হ'ল ইংরাজিতে যাকে বলে "doing it।" বার্লিনে আমার পরিচিতা এক সুরসিকা সম্ভ্রান্ত জর্মন মহিলা এ-সম্পর্কে আমাকে বেশ একটি গল্প বলেছিলেন। তাঁর পরিচিত একটি আমেরিকান তরুণী দেশভ্রমণে বেরিয়ে তাঁকে এসে বলেছিলেন যে, লণ্ডনে দ্রষ্টব্য কি কি স্থান আছে, সেগুলি তাঁর guide-bookএ তিনি যেন দাগ দিয়ে দেন—কারণ তিনি তার পরদিন লণ্ডন ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাবেন। এ কথা শুনে জর্মন মহিলাটি সবিস্ময়ে বলেছিলেন, "কিন্তু একদিনে সব দেখবে কেমন করে?" তিনি প্রশান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "দেখার ত আমার দরকার নেই মাদাম! আমার দরকার শুধু আমেরিকা ফিরে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলির নাম করতে পারার।" আমাদের মধ্যেও এ রকম লোক আছেন সন্দেহ নেই,

যাঁরা নানা স্থান দেখতে চান শুধু বাড়ি ফিরে "অমুক অমুক জায়গা দেখেছি" বলার গৌরব (?) করতে। কিন্তু এরূপ পরিচিত নমুনা ছেড়ে দিলে বোধ হয় এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকেই তাঁর ভ্রমণের মধ্যে থেকে কেবল সেই সব ঘটনা বা বস্তুই লক্ষ্য করেন, যাতে তাঁর মন প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে। তাই আমি ব'লে রাখতে চাই যে, আমার ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে একদিকে যেমন কোনও ধারা-বাহিকতা বা পর্যায় খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই, তেমনি অপর দিকেও ভ্রমণ-সংক্রান্ত নানান খুঁটিনাটি খবরের আশাও যেন কেউ না রাখেন। কারণ, আমি কি উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হয়েছিলাম তা গোড়ায়ই ব'লে সাফাই গেয়ে রেখেছি। অতএব এবার নারায়ণং নমস্কৃত্য স্থরু করা যাক্।

লক্ষ্ণৌয়ে এবার অনেক দিন থেকে গিয়েছিলাম। তার প্রধান কারণ এই যে, গান শোনার জন্য সারা স্বদেশটা টহল দিতে গিয়ে প্রথমেই সেখানে উচ্চশ্রেণীর গান শুনবার সুযোগ যেন হঠাৎ উপস্থিত হ'ল বললেই চলে। তা ছাড়াও অবশ্য অন্য কারণও ছিল।

লক্ষ্ণৌ পুরাকালে গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। হাল আমলে এরকম অনেক সমৃদ্ধিশালী নগরীতেই সঙ্গীতের চর্চা একেবারে নিভে গেছে। তবে লক্ষ্ণৌয়ে এখনও দুই একজন ভাল গায়ক-গায়িকা আছেন যাঁদের গানবাজনা শুনে মনে ভারি তৃপ্তি পাওয়া গিয়েছিল। বাজনার মধ্যে সব চেয়ে ভাল যন্ত্রী ঠাকুর নবাবালি। এঁর চেয়ে ভালো হার্মোনিয়াম আমি জীবনে দু'বার মাত্র শুনেছি—এক, গয়ার বিখ্যাত গায়ক হনুমান দাসের পুত্র সোনির কাছে; ও—দুই, ইন্দোরের অন্ধ বাদক দেবীদাস রাওয়ের কাছে। কিন্তু ঠাকুর নবাবালির হাতও অত্যন্ত মিষ্ট। গানবাজনার যাতে আবার উন্নতি হয় সেজন্যেও এঁর মাথাব্যথা কম নয়। কাজেই এঁর গানবাজনার অনুরাগের প্রশংসা করতে হয় বৈকি। ইনি আমাদের উত্তর ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছেন।

গায়কদের মধ্যে একজন মাত্র ভাল গুণীর পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর নাম আবদুল রশিদ। এঁর কণ্ঠের নমনীয়তা—modulation—এঁর গানকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আমাদের ওস্তাদদের মধ্যে খুব কম লোকের গলায়ই নমনীয়তা পাওয়া যায়। এটা আমি দুঃখের বিষয় বলে মনে করি। সুরের নমনীয়তায় গানের সৌন্দর্য যে কতটা বাড়ে, তা লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত গায়িকা অচ্ছন বাইয়ের গান শুন্‌লে অনেকটা বোঝা যায়। অচ্ছন বাইয়ের কণ্ঠস্বর এলাহাবাদের বিখ্যাত জানকী বাইয়ের চেয়ে কম মিষ্ট হওয়া সত্বেও, অচ্ছন বাইয়ের গানের মাধুর্য যে অনেক বেশি, তার একটা প্রধান কারণ তাঁর কণ্ঠের নমনীয়তা। তা ছাড়া এঁর গানের মধ্যে এমন একটা সমাহিত প্রশান্তি ও দরদ আছে যে, তাঁর গান সহজেই কানের মধ্যে দিয়ে মরমে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

এলাহাবাদের বিখ্যাত জানকী বাই এবার আবার গান শুনিয়েছিলেন। সবাই জানেন তাঁর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও গলার তানকর্তবও অতি পরিষ্কার। তবে এঁর গানের মধ্যে সে সমাহিতি নেই, যেটা অচ্ছন বাইয়ের গানের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তানালাপ তাঁর অতি সুন্দর। বর্তমান সময়ে জানকী বাই ভারতের শ্রেষ্ঠ বাইদের মধ্যে অন্যতম তো নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ ভৈরবী এঁর মতন কম বাই-ই গাইতে পারেন।

লক্ষ্ণৌয়ে এক তালুকদারের প্রাসাদে দেওয়ালি উপলক্ষে আর একজন গায়িকার গান শুনেছিলাম, যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। নাম ইন্দর বাই। লক্ষ্ণৌয়ের কাছে কোথায় থাকেন। এঁর বয়স কম দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি কখনই ভালো গাইতে পারবেন না। কিন্তু, তিনি রাত দশটায় আরম্ভ করলেন ও রাত বারটা থেকে তিনটে পর্যন্ত এমন চমৎকার গান গাইলেন যে, শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে দু'তিন জন গম্ভীরানন প্রফেসার ছিলেন, ওঁদের গম্ভীর আননও একটু তরল হ'য়ে এল। ইন্দর বাই-এর গলাটি মধুর

হলেও তিনি কিন্নরী নন। কিন্তু তাঁর কলকণ্ঠের একটি অমূল্য সম্পদ—দরদ। বিশেষতঃ গজল তিনি এত সুন্দর গাইলেন যে গজলের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। এঁর খেয়াল খুব উঁচুদরের নয়, তবে ঠুংরি ও গজল অবর্ণনীয় সুন্দর। আমাদের এই আসরে এক নবাব ছিলেন—খুব মূর্খের মত জরীর পোষাক পরা, যেমন নবাবদের সচরাচর হয়ে থাকে। কিন্তু তবু মানতেই হবে যে তাঁর সুরবোধ ছিল, কারণ, সুরের যে সব মোচড়ের জায়গায় তিনি আমাদের পানে অষ্টমীর ছাগশিশুর ন্যায় করুণ নয়নে চাইছিলেন, সে সব স্থলে সুরের মাধুর্য বাস্তবিকই সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। বে-সমজদার লোক যে কখনই ঠিক জায়গায় মাথা নাড়তে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক এঁর সেই করুণ অতি দরদী চাহনি ইন্দর বাইকে উস্কে দিয়েছিল বৈকি। সঙ্গীতে অরসিক কখনও ঠিক জায়গায় মাথা নাড়তে পারে না বা আহা উঁহু বলতে পারে না। কিন্তু এঁর তারিফ-ব্যঞ্জক অব্যক্ত চাহনি যথাস্থানে প্রযুক্ত হলেও তার মধ্যে একটা কেমন যেন হাস্যকর উপাদান ছিল। বোধ হয় সেটা ইনি নবাব বলে। কিন্তু সে যাই হোক, এঁর সেই করুণ অতিদরদী চাহনি গায়িকাকে উস্কে দিয়েছিল বৈকি। জহুরীর দেখা না পেলে জহর যে মুষড়ে পড়ে—না জানে কে?

লক্ষ্ণৌয়ে এ সব বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার মধুর কণ্ঠে গীত হিন্দুস্থানি গান উপভোগ করতে করতে আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্যের চরম বিকাশের পক্ষে কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের মূল্য যে কতখানি, তা যেন আমি আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম। মনে হয়েছিল যে, গানের গভীর আনন্দ দানের পক্ষে মধুর স্বরের আমরা যথেষ্ট দাম দিতে শিখি নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে লেখার ইচ্ছে আছে—তাই এখানে শুধু এই কথাটি মাত্র বলে রাখি যে, কণ্ঠ-সঙ্গীতে রাগালাপের চরম মাধুর্য কখনই কর্কশ গলায় তেমন বিকাশ পেতে পারে না। আমি

কাশীতে ও গোয়ালিয়রে দু'জন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাদের নাম মঙ্গু বাই ও হুশ্‌না জান। একজনের বয়স প্রায় ৭০, অপর জনের ৬০।৬৫। গানে এঁদের দুজনেরই অসাধারণ দখল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই—কিন্তু বয়সের দরুণ তাঁদের কারুরই কণ্ঠস্বর তেমন মিষ্ট ছিল না বলে তাতে ততটা তৃপ্তি পাইনি, যতটা তাঁদের গলা মিষ্ট হলে পেতাম।

রামপুরে কতিপয় সুগায়ক তথা সুবাদক নবাবের আশ্রয়ে বহুদিন যাবৎ খুশখেয়ালে আছেন শুনে সেখানে গেলাম। সেখানে গিয়ে দুই একজনের সুপারিশে নবাব সাহেবের "মেহমান" (অতিথি) হয়ে মহা মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। নবাব সাহেবের সেক্রেটারি মহাশয় স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে ধুতি পরা দেখেই কি না জানি না, প্রথমটা তারা বিশ্বাসই করে নি যে, বাঙালীবাবু নবাব সাহেবের মত হোমরাও চোমরাও লোকের অতিথি হ'তে পারে। কিন্তু ট্রেন থেকে অন্য কোনও ভদ্রলোককে দেখতে না পেয়ে তারা অগত্যা সিদ্ধান্ত করল যে আমিই নিশ্চয় নবাবসাহেবের মেহমান হব। ইতিমধ্যে রামপুরের টঙ্গাওয়ালারা নষ্টনীড় মৌমাছির মত আমাকে ছেঁকে ধ'রে প্রায় বিহ্বল ক'রে ফেলেছিল। আমার বিছানা এক টঙ্গায় ও তোরঙ্গ অপর টঙ্গায় দেখে এবং কুলি ও বিভিন্ন টঙ্গাওয়ালাদের মধ্যে বাদবিতণ্ডার শোরগোলে আমি যখন প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি, তখন নবাবসাহেবের সারথি আমাকে খুঁজে পেতে দেরি হবার অগণ্য সন্তোষজনক কারণ জ্ঞাপন করলেন। আমি আগে থেকেই রামপুরে এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের ওখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু নবাবের সারথি-পুঙ্গব আমাকে সটাং এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। আমি ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব বলাতে, সকলেই একবাক্যে আমাকে জানালেন যে, সেটা অসম্ভব, যেহেতু আমি এবার নবাব সাহেবের অতিথি, আর খাওয়াদাওয়ার ভাবনা নেই যেহেতু—

বললেন তাঁরা সমস্বরে—"সিধে আসছে—রেঁধেবেড়ে খেয়েদেয়ে হাসিখুসি হ'য়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন।"

ক্ষুধাশান্তির এহেন সহজ উপায় কল্পনা ক'রেই আমার প্রায় চক্ষুস্থির দেখে তারা ভরসা দিয়ে বলল: "রাঁধতে না জানলেও ভাবনা নেই, সিধে রেঁধে দেবার লোকও আছে।" সেই রাতে আমার নবাব সাহেবের সিধে এনে তার পর তাকে রাঁধিয়ে খেতে হবে, (যখন ডাক্তার সাহেবের ওখানে তাঁর স্ত্রী স্বহস্তে আমার জন্যে রেঁধে অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছেন) যতই ভাবি ততই আপশোষ হয়—কুক্ষণে নবাব সাহেবের অতিথি হতে সাধ গিয়েছিল! কিন্তু অবশেষে ঝাঁ করে বুদ্ধি এসে গেল—পুরুষোচিত উদ্দীপ্ত ক্রোধে হাঁকলাম: আমি যে ডাক্তার সাহেবের ওখানে উঠব তা নবাব সাহেব জানেন। একথায় তারা একটু থতমত খেয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে শেষে বলল, "আচ্ছা, আপনি ডাক্তার সাহেবের ওখানেই থাকতে পারেন; কিন্তু জেনে রাখুন যে 'মেহমান' আপনি নবাব সাহেবের, আর কারো নন।" হাসি পেল বৈকি, মনে প'ড়ে গেল বৈষ্ণব পদাবলীর "আমার নাগর যায় পর ঘর আমার আঙিনা দিয়া"—অভিমান। যাহোক যথাসাধ্য হাসি চেপে সানন্দে বললাম: "তথাস্তু।" মনে মনে বললাম: "আমি চিত্রগুপ্তের অতিথি জেনে রাখতেও আপত্তি ছিল না—যদি বাংলা রান্না খেতে পাই।" অতি কষ্টে নবাব সাহেবের আতিথ্যের হাত হতে ত্রাণ পেয়ে, সোজা ডাক্তার সাহেবের ওখানে গিয়ে আমার নবাবী আতিথ্য-সৎকারের গৌরবময় লাঞ্ছনার কাহিনী তাঁদের খুলে বললাম। শুনে সপরিবারে ডাক্তারবাবুর সে কী হাসি!

সে রাত্রে ত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাক্তার বন্ধুর ওখানে কাটানো গেল। তার পরদিন সকাল বেলা ভিষক্-জায়া আমাকে হেসে বললেন: "নবাব সাহেব ভারে ভারে আপনার জন্যে যে সিধে পাঠিয়েছেন, একবারটি দেখে যান।" গিয়ে দেখলাম যে সে সত্যিই এলাহি কাণ্ড—চাল, ডাল, নুন, তেল, ঘি, কপি, মাংস, চিনি ইত্যাদি

ইত্যাদি মায় কয়লা পর্যন্ত। তাতে অন্ততঃ ৩।৪ জনের দু'বেলা খাওয়া হ'তে পারে। অথচ আমার নাকি সে-সব এক বেলায় ফুরিয়ে দেবার কথা, কারণ ওবেলায়ও নাকি ঐ পরিমাণ ভেট আসবে। তার ওপর নবাব সাহেব এক পরিচারক পাঠিয়েছিলেন। আমি তাকে বললাম: "নবাব সাহেবকে আমার অনেক সেলাম জানিও; কিন্তু তোমার সেবা গ্রহণ করার আমার কোনও দরকার নেই; যেহেতু আমি ডাক্তার সাহেবের অতিথি।" সে কিন্তু নাছোড়বন্দ্। বল্ল: "আপনার সেবা না করলে আমার নিস্তার নেই।" আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, অধম-তারণের ভার আমার নয়—কল্কি দেবের; উত্তরে সে আমাকে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিল যে, যেহেতু আমি বস্তুতঃ নবাব সাহেবের মেহমান, সেহেতু আমার সেবা করার অধিকার তার মারে কে? বুঝলাম যে "হাঁ, সনাতন নবাবী অতিথি-সৎকার বটে!" পাছে আমাদের দেশের আর কেউ নবাব সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেই আশঙ্কায়ই আমার এত কথা লেখা।

সে যাই হোক, রামপুরের একজন বড় ওস্তাদ মুস্তাক হুসেনের গান, আর বিখ্যাত স্বনামধন্য উজীর খাঁর বীণা শুনলাম। গান বিশেষ ভাল লাগল না কারণ (১) গায়কের গলা ভাল নয়, (২) গায়কের গানের মধ্যে সুষমার ছিটেফোঁটাও ছিল না। শুধুই তান দেওয়া যে বড় আর্ট নয় ও অত্যন্ত শ্রান্তিকর তার যদি কেউ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে তিনি যেন অন্ততঃ একবার রামপুরের মুস্তাক হুসেনের কিম্বা বম্বের বালগন্ধর্বের গান শোনেন। উজীর খাঁ সাহেবের বীণা-আলাপ কিন্তু চমৎকার লাগল। সেদিন বেশিক্ষণ শোনা হয়ে উঠল না, কিন্তু একটি গৌড় সারঙ্গের আলাপেই খাঁ সাহেবের অসামান্য মিষ্ট হাতের পরিচয় পাওয়া গেল। তার পর বম্বেতে খ্যাতনামা জিলণ্ডের বীণা শুনেছিলাম; কিন্তু খাঁ সাহেবের পরে বড়ই সাধারণ লেগেছিল। সঙ্গীতের আর্ট ঠিক কোথায়, সে সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয়

কারুর কারুর একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে, যদিও শিক্ষার অভাবে সেটা প্রায়ই তারা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ ক'রে বোঝাতে পারে না।

বেরিলিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছিলাম; কিন্তু যেদিন আমি সেখানে গিয়েছিলাম, ঠিক সেইদিন সেখানকার কয়েকজন প্রবাসী বাঙালী মিলে এক গানবাজনার আসর করে তুলেছিলেন।

বেরিলিতে এই আসরে আমার অনুরোধে ঘুরন ব'লে সেখানকার একজন বড় মুসলমান গায়ককে আনা হয়েছিল। এমন চমৎকার টপ্পা বড় শোনা যায় না—বিশেষতঃ এমন সুন্দর টপ্পার দানা। আমাদের গিট্‌কারীর বা মূর্ছনার সৌন্দর্য নির্ভর করে তার পরিচ্ছন্নতার উপর। ঘুরনের গিট্‌কারী শুনলে এ কথার যাথার্থ্য আরও উপলব্ধি হ'বে। ঘুরনের গান আরো ভালো লাগল এইজন্যে যে খাস টপ্পার চল বাংলার বাইরে প্রায় নেই বললেই হয়। বাঙালীরা তাদের হাজারো প্রেম-সঙ্গীতে, শ্যামাসঙ্গীতে, কীর্ত্তনে বাউলে টপ্পার দানা বসিয়েছে, কিন্তু বাংলার বাইরে গানে তানকর্তব প্রায়ই খেয়াল বা ঠুংরিভঙ্গিম। টপ্পার দানা কচিৎ মেলে।

আগ্রার তাজমহল দেখে যে মুগ্ধ হয়েছিলাম এ কথা বলাই বেশি। তবে তাজমহল সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস করে ফল নেই। কেবল পিতৃদেবের মন্ত্রের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করলেই চলবে:

আমি কহি—না না, আমি কিছু নাহি কহি,
আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি, আর স্তব্ধ হ'য়ে রহি।...
সুন্দর অতুল হর্ম্য! হে প্রস্তরীভূত
প্রেমাশ্রু! হে বিয়োগের পাষাণ প্রতিমা!
মর্মরে-রচিত দীর্ঘনিশ্বাস! আপ্লুত
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা!...
হয় নি রচিত বর্ণে, ছন্দে কিম্বা স্বরে
এ হেন বিলাপ। ধন্য ধন্য সেই কবি,
প্রথম জাগিয়াছিল যাহার স্বপনে এই ছবি!

এই সূত্রে মনে পড়ে আমার একবার বেরার-ভ্রমণের কথা। সবাই জানেন বেরার শৈলময় প্রদেশ তথা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনোহর। কিন্তু সেখানে গিয়ে বেশ একটু বিপদে পড়তে হয়েছিল বৈ কি, যেহেতু বেরারীরা তুলো ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই কানে তুলো দেন—খানিকটা ভাগবত বৈষ্ণবদের মতন যাঁরা বলেন : "কিমন্যৈরসদালাপৈ-রায়ুষাং যদসদ্ব্যয়ঃ ?" অর্থাৎ কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোনো কথা শোনা আয়ুঃক্ষয়।

বেরারে যে-বাঙালী বন্ধুটির অতিথি হয়েছিলাম তাঁকে এহেন তুলোধ্যান-তুলোজ্ঞান দেশে আছেন কেমন ক'রে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে-উত্তর দিলেন তাতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ মনে প'ড়ে গেল—বাঙালী রাতারাতি মাড়োয়ারী না বনলে তার ঐহিক প্রগতি বা পারত্রিক সদ্‌গতি হ'তেই পারে না। বেরারে গিয়ে দেখলাম শুধু ঐহিক প্রগতির রূপ। বন্ধুবরের পারত্রিক সদ্‌গতি কী ভাবে হবে জানতে হয়ত কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বোম্বাইয়ে ভারতের অন্যতম সঙ্গীতরত্ন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। উচ্চসঙ্গীতের এহেন একনিষ্ঠ সাধক বোধ হয় আজ ভারতবর্ষে আর নেই। আমাদের সঙ্গীতে এঁর দান যে কতখানি সে সম্বন্ধে গুণগান পরে করব, তাই এখানে শুধু তাঁর নামকীর্তন ক'রেই থামি।

সেখানে তারাবাইয়ের গান খুব ভালো লাগল। এমন মধুর কণ্ঠস্বর কমই শোনা যায়; এবং পেশাদার গায়িকাদের মধ্যে তারাবাইয়ের চালচলনে, আচার-ব্যবহারে সত্যিকার মার্জিত রুচির পরিচয় মেলে। গানের সৌন্দর্য যে কতখানি মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে, তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই।

বম্বেতে একদিন অপেরা হাউসে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি ও চিন্নস্বামী আয়ারের বেহালা শুনতে গিয়েছিলাম। আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার বম্বের 'হোস্ট' সুরসিক মনীষী

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন—তখন তিনি বম্বে হাইকোর্টের জজ। বেহালার কথা পরে বলছি কিন্তু বাঁশের বাঁশি যে কী গুণ জানে, তা সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি যিনি শোনেন নি, তিনি কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারবেন না। বাঁশিতে যে এত কাণ্ডকারখানা করা যায়, আমার সত্যি ধারণাই ছিল না। য়ুরোপীয়দেরও কখনও এত আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফ্লুট বা ক্লারিওনেট বাজাতে শুনি নি। তবে সঞ্জীব রাও বাজালেন কর্ণাটী ওরফে দক্ষিণী সঙ্গীত। তা ছাড়া, দক্ষিণী গানবাজনায় মিড়ের প্রয়োগ অত্যন্ত কম। কাজেই বাঁশির সুস্বর ও অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও আমাদের খুব বেশিক্ষণ ভালো লাগে নি। সেদিন আমাদের একটি ভারি করুণ-মধুর হাসি-অশ্রুর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের বক্সে একটি ভারিক্কি মান্দ্রাজী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নেওয়া গেল। দেখা গেল, তিনি সঙ্গীতরসিক—অন্তত: দক্ষিণী সঙ্গীতের তো বটেই। তিনি সোৎসাহে দক্ষিণী সঙ্গীত সম্বন্ধে একগঙ্গা ব্যাখ্যা ক'রে আমাদের সবই বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সঞ্জীব রাও যে দাক্ষিণাত্যের সেরা ব্রজরাজ না হোন সেরা বংশীধর একথার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ পেশ করছিলেন। আমরা ঘণ্টা দেড়েক শুনে আর ভাল না লাগাতে, চলে আসবার উপক্রম করাতেই, তিনি আমাদের ধ'রে পড়লেন: "এখনই যাবেন কি? এ-ও কি সম্ভব? সব চেয়ে ভাল জিনিষ এখনও আসে নি; আর মাত্র ঘণ্টা দুই বই ত নয়? যাবার এত তাড়া কি? বাঁশি কি ভালো লাগছে না?"...ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকটির ব্যথিত প্রশ্নে বাস্তবিকই আমাদের শেষ পর্যন্ত থাকতে ইচ্ছে হল; কিন্তু যখন তিনি বল্লেন, আর "মোটে" দু'ঘণ্টা বাজনা চলবে, তখন তাঁকে আমরা বলতে বাধ্য হলাম যে, আমাদের যেতে হবেই, তবে ভালো লাগছে না ব'লে নয়, কাজ আছে ব'লে। তিনি কিন্তু নাছোড়বন্দ্: "সত্যি এখন গেলে সব মাটি, কারণ, এইবারেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বাজনা আরম্ভ হবে।"

এতক্ষণ ত অশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বাজানো হয়নি বলাতে, তিনি বললেন

যে, হাঁ মন্দ নয় বটে, তবে সবার সেরা সঙ্গীত এখনও আসেনি—এইবার আসবে, আর দুঘন্টার মধ্যেই। আমরা তাঁকে ব্যথা দিই না কী ক'রে? কাজেই সুসভ্য কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম—তাঁর আগ্রহের আতিশয্যে। "কি করি? কাজ আছে। দুঃখিত" ইত্যাদি। ভদ্রলোক কিন্তু আমাদের এমন বাঁশি ছেড়ে যাওয়ার উপক্রমে ব্যাকুল হয়ে শেষটায় সাভিমানে বললেন: "কী কাজ?" বাইরে বেরিয়ে আমার রসিক বন্ধু ক্ষিতীশচন্দ্র হেসে বললেন: "আর কিছুক্ষণ থাকলে নিশ্চয়ই উনি পায়ে প'ড়ে বলতেন: "যেও না এখনি—এখনো আছে রজনী।"

মহারাষ্ট্রীয় থিয়েটারগুলির অভিনয় প্রায় দুঃসহ। তার ওপর এই বিংশ শতাব্দীতে নারীর ভূমিকায় পুরুষকে দেখলে শান্তচিত্তে বরদাস্ত করা এক মহাত্মাজীর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব। তবে এদের থিয়েটারে রাগসঙ্গীতের আদর খুব বেশি। কিন্তু হ'লে হবে কি, মারাঠী গানে আ-আ সম্বলিত তানাদির উপদ্রব এতই বেশি যে, একটু শুনতে না শুনতেই একঘেয়ে মনে হয়। এঁদের মধ্যে দু'জন অভিনেতা আছেন—সিরনায়ক ও বালগন্ধর্ব। এঁরা দুজনেই মহিলার ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকেন। সিরনায়ক মহারাষ্ট্র-কোকিল উপাধি পেয়ে নিশ্চয়ই ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, কেন না তাঁর তান সুরু হয় কিন্তু আর সারা হয় না। কিন্তু বালগন্ধর্ব লোকপ্রিয় বটে। তাঁর গানে লোকের যে কী উৎসাহ! তিনি "স্বয়ম্বর" বলে একটি অভিনয়ে রুক্মিণীর ভূমিকা নিয়ে একটি ভীমপলশ্রী গাইলেন অন্ততঃ একঘণ্টা ধ'রে—কিন্তু সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল। প্রথমটা তাঁর গান মন্দ লাগছিল না; কারণ, তাঁর গলার মধ্যে এক সময়ে যে দরদ জাতীয় কিছু ছিল, তা তাঁর আজকালকার ভাঙা গলা থেকেও খানিকটা বোঝা যায়; কিন্তু তাঁর নিরন্তর আ—আ-র মল্লযুদ্ধে শেষে আমাদের প্রথম অঙ্কের শেষেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে হ'ল। কিন্তু বালগন্ধর্ব গান ধরলে দেখলাম মারাঠী শ্রোতাদের ক্লান্তি আসে না—উৎসাহে তারা প্রায়

ক্ষেপে উঠবার জোগাড়। তাঁর গান বম্বেতে কিরকম লোকপ্রিয়, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই : তাঁর গান আমার ভাল লাগেনি শুনে, বম্বের একজন ক্রোরপতি বালচাঁদ হীরাচাঁদ এতই ক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তিনি আমাকে, বালগন্ধর্বকে ও পটবর্ধন বলে আর একজন নামজাদা থিয়েটারী গায়ককে তাঁর বাড়িতে ডেকে চর্বচুষ্যলেহ্যপেয় খাওয়ালেন। ভাবটা : খেয়ে দেয়ে তবে না মন দিয়ে গান শোনা যায়। কী করি? খাইয়েছেন—ঠায় ব'সে শুনতে হ'ল আ—আ-র মল্লযুদ্ধ। শুনতে শুনতে শরীর মন যখন অবসন্ন হয়ে যখন ভাবছি গৃহে ঢুকবার সময় কেন বেরুবার কৌশলটি ঠিক ক'রে রাখিনি, ঠিক তখনই গৃহকর্তা সগর্বে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন : "কেমন? বলেছিলাম কি না?" উত্তরে আমার কিছু বলা উচিত ভেবে আমি ব্যতিব্যস্ত ভাবে বল্লাম, বালগন্ধর্ব মহাশয়ের চেহারার মধ্যে বেশ একটা নম্রতা আছে। এসূত্রে এক ফরাসী মহিলার গল্প মনে পড়ে। তিনি এসেছিলেন ইংলণ্ডের কোথাও এক ইংরাজ অভিনেতার অভিনয় দেখতে। অভিনয় তাঁর মোটেই ভালো লাগে নি, কিন্তু যে-বন্ধুটি তাঁকে ডেকেছিলেন অভিনয় দেখতে তাকে মনঃক্ষুণ্ণ করেন কোন্ মুখে? কাজেই বলতে হ'ল : "অভিনেতাটি অতি মাতৃভক্ত—তাঁর মার সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেন।" পিতৃদেবের মন্দ্রের কবিতা মনে পড়ে : "শীলতার অন্য নাম—শুভ্র মিথ্যা কথা।"

গুজরাতের নানা দেশেই দেখতে পাই ওরা অত্যন্ত ভালোবাসে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য—গর্বা। এ-নৃত্যগীতে সুন্দর সুন্দর সুর ও তালফের পাওয়া যায়। এ লোক-সঙ্গীতের ঐতিহ্য অনেকদিন থেকে চলে আসছে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, এর মধ্যে জীবন্ত রস আছে, কারণ গর্বায় আজো নতুন নতুন গান বাঁধা হয় ও মেয়েরা গায় সহজ আনন্দে মনোরম ছন্দে। চক্রাকারে হাততালি দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একজন সুরু করে, বাকি সব আমাদের কীর্তনের দোয়ারদের মত তাকে অনুসরণ করে। একটা জিনিষ দেখে বড়

আনন্দ হয় যে, শত লোক-চক্ষুর সাম্‌নেও লজ্জাশীলা গুজরাতী রমণীর এই নৃত্যভঙ্গীতে গান গেয়ে যেতে একটুও বাধে না, বা তাঁদের ভর্তারাও এতে কোনো দোষ দেখেন না। এ জন্যে তাঁদের সাধুবাদ না দিলে অসাধু হ'তে হয়।

দক্ষিণে এবার যে বীণা শোনা গিয়েছিল, জানি না, সেরকম আশ্চর্য বীণা আর কখনও শোনা ভাগ্যে আছে কি না। ইনি মহীশূরের রাজার সভাবীণকার—নাম শেষণ। দাক্ষিণাত্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীণকার বলে খ্যাত। এত বড় খাঁটি গুণী তন্ত্রী যে-কোনো দেশেই বিরল। গৌরব করবার মতন প্রতিভা বৈ কি—শুধু গৌরব নয়—আনন্দ আরাম, পুলক শিহরণ। আমাদের দেশে সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেই হাড়ে হাড়ে জানেন যে সুরের প্রান্তরে কান্তারে গোলাপের বাগান কত বিরল। সাড়ে পনর আনা মজলিশেই মন নিরাশ হ'য়ে ফেরে। তবু আশা কুহকিনী, তাই যদি কোথাও হঠাৎ পরশ পাথরের দেখা মেলে এই আশায় ক্ষেপাকে কত পাথরই না কোমরের নিকষ লোহা ঠেকাতে হয়! কিন্তু যখন এ-পরশ পাথর একবার মেলে, যখন শেষণ একবার উদয় হয়, তখন শত নিরাশা অতৃপ্তির সঞ্চিত কুয়াশাও কেটে যায় এক মুহূর্তেই। শেষণের আঙুলের প্রথম ঝঙ্কারেই বোঝা গিয়েছিল যে, হাঁ এই বটে, একেই বলে সঙ্গীত! দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন সঙ্গীত এত বিরল যে, বেশির ভাগ সঙ্গীতানুরাগীই এতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হন, কারণ তাঁরা শোনার সুযোগ পান না। মনে আছে, আমরা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষণের বীণাবাদন শুনেছি, কিন্তু মন বলেছে,—আরও শুনি। কত বাজিয়েরেই তো বাজনা শুনেছি, কিন্তু কজনকেই বা এমন অবলীলাক্রমে বাজাতে শুনেছি? য়ুরোপে শুনেছিলাম জগদ্বিখ্যাত Kreisler, Mischa Elman ও Vescheyর বেহালা। ভারতে শেষণ প্রতিভায় এদের কারুর চেয়েই কম নয়। তাঁর বীণা শুনে বুঝতে পারা গেল যে, বেহালার চেয়েও মধুর যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের

সৌন্দর্য-সৃষ্টির কীর্তির কথা মনে হ'য়ে মন গর্বে ও উল্লাসে ভ'রে না উঠেই পারে না। একটা কাঠের ওপর ধাতুর তার যে মানুষের মনপ্রাণকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে—সৃষ্টির এ-রহস্যের সমাধান কে করবে জানি না, কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমিক এটুকু জানে যে, জড় বস্তু মোটেই জড় নয়, তার মন্দিরের প্রতিমায় প্রাণ আছে—যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবল এক শেষণের মতন শিল্পী-পুরোহিতে।

শেষণের আঙ্গিকের বিস্তর তারিফ করা যেতে পারে, তাঁর বৈচিত্র্যের সুখ্যাতি করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে দিতে পারা যায়। বাজনার সময় এ অন্ধ-প্রায় গুণীর চোখ মুখের অপূর্ব ভাবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে অগণ্য উপমা দিতে পারা যায়; কিন্তু পারা যায় না কেবল—তাঁর সুরের আলোর আভাষ ও কথার আড়ম্বরে প্রকাশ করা। এত কথা বলা এই জন্যে যে, শেষণ এখনও জীবিত, তাই যদি কেউ মহীশূর অঞ্চলে যান, তবে যেন এঁর বাজনা শুনতে ভুলে না যান।

শেষণের বীণার মধ্যে অনেক সময় য়ুরোপীয় সুরের বা চালের একটু আমেজ আসে—অবশ্য তাই বলে বেপর্দায় তাঁর হাত পড়ে না। এরূপ সুরের পথিকৃতের প্রতি ওস্তাদের সন্তুষ্ট হবার কথা নয়, কাজেই দক্ষিণের একজন গোঁড়া সমালোচক আমাকে বলেছিলেন, "শেষণ গুণী হ'তে পারেন, কিন্তু ওস্তাদ নন।" আমি মনে মনে মস্ত তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বলেছিলাম, "তথাস্তু! আমার কাঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধরতে পারে, তবে বেঁচে থাক আমার কাঠের বিড়াল।" ওস্তাদি না করে যদি সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া যায়, তবে ওস্তাদির অভাবে কেউই খিন্ন হয়ে পড়বে না। কিন্তু শেষণ ওস্তাদ নন এটাও সত্য কথা নয়। রাগের জ্ঞানও শেষণের যথেষ্ট—আমি পরে একজন নিরপেক্ষ শিক্ষিত সমাজদারের কাছে শুনলাম। তবে রাগকে নিয়ে মল্লযুদ্ধ করায় শেষণ বিশ্বাস করেন না, রাগকে নিয়ে খেলা করা, আদর করা, তাকে নিজের ঢঙে ফলিয়ে তোলা এই সবেই শেষণের আনন্দ। যিনি সঙ্গীতে কুস্তিকসরৎ চান, তাঁর শেষণের গান ভাল লাগার সম্ভাবনা কম, কিন্তু

গানের মধ্যে দরদ যাঁর কাছে মূল্যবান্, মিষ্টত্বে যিনি উদাসীন নন, সুরের মোচড়ের দাম যিনি জানেন, তিনি শেষণের গুণগ্রাহী না হ'য়ে থাকতে পারবেন না—আরো এইজন্যে যে শেষণ তাঁর বীণায় খানিকটা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রাণশক্তি পরিবেষণ করেন স্পষ্ট য়ুরোপীয় "কর্ড" জাতীয় ঝংকার তুলে। ম্লেচ্ছ সঙ্গীতের ছায়া মাড়ালেও আমাদের পবিত্র হিন্দুসঙ্গীতের জাত যাবে এমন কথা অনেক সমজদার মনে করেন সঙ্গীতেও শুচিবাইকে বরণীয় মনে ক'রে। এ-শুচিবাইয়ের স্বপক্ষে যে কোনো যুক্তিই নেই এমন কথা বলব না। তবু আমার মনে হয় যে খাঁটি শিল্পী তাঁর আন্তর সুরবোধের নিকষে ক'ষে দেখবার শক্তি ধরেন কোন্ ভঙ্গি বা চাল আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে আত্মসাৎ করা সম্ভব, কোন্‌টা নয়। এ সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলব। এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই থামি যে শেষণ এমন নিপুণভাবে য়ুরোপীয় ভঙ্গিকে নিজের চালে চালু ক'রে পরিবেষণ করেন যে শ্রোতার একবারও খটকা লাগে না—নির্ভেজাল সৃষ্টির আলো অন্ধকারের আমদানি করবে কেমন ক'রে? সত্যিকার রসিক অরসিক হবেন কিসের লোভে? দিল্লীতে এবার কংগ্রেসের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যে কি রকম হাঁপিয়ে উঠেছিল, তা জানেন এক অন্তর্যামী। কংগ্রেসে বক্তৃতাদি দু'চার দিন শুনেই, দেশোদ্ধারটা যে শক্ত কাজ, সে বিষয়ে সংশয় ঘুচে গেছিল। তাছাড়া, মনে হয়েছিল যে, সংসারে অতিমানুষ যদি কেউ থাকেন তবে, তাঁরা হচ্ছেন সেই কয়টি মহামতি যাঁরা কংগ্রেসের পালা শেষ করে আবার Subjects Committee (বিষয়নির্বাচনী সমিতি) পালা পুরোদমে চালাতে পারেন। সে যাই হোক, এ অতিমানুষের সমস্যা ছেড়ে দিলেও, এ কংগ্রেসে আমাদের অনেকেরই শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জনের ওপর বড় ভক্তি হয়েছিল।

দিল্লিতে দাশ মহাশয়কে সমস্ত দিন কংগ্রেসের সভার কষ্টভোগের পর কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেই মোটা চাল ও ডাল খেতে দেখে মনে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দ হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত দিনের

পরিশ্রমের পর আমাদের তাঁর জন্য একটু ভাল আহার্যের বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল, এই ভেবে কষ্টও হ'ত। কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ হ'ত যখন তাঁকে অম্লানবদনে এত কষ্ট স্বীকার করতে দেখতাম। মনে আছে সেদিন চোখের সামনের সেই দৃশ্য দেখে মনটা আমাদের বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। খাঁটি ত্যাগ—অর্থাৎ জোর করে ত্যাগ নয়, আপনা-থেকেই আসে এমন ত্যাগ—যে একটা কত বড় মহিমময় জিনিষ সেটা যেন সেদিন বেশি করেই উপলব্ধি করেছিলাম।

দিল্লিতে আমি এসেছিলাম কংগ্রেসের ডেলিগেট হ'য়ে—সুভাষের পাল্লায় প'ড়ে। সে লোভ দেখিয়েছিল দিল্লিতে ভালো ভালো গায়কের গান শোনাবে। কিন্তু দিল্লি পৌঁছে দেখি সে এমন বিষম ব্যস্ত যে তার ভরসা ছেড়ে নিজেই খোঁজাখুঁজি সুরু করলাম—কোথায় দিল্লিতে গায়ক গায়, বাদক বাজায়—সে কোন্ অচিহ্নিত লোকে। অনেক খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল—দিল্লিতে বড় গায়ক বাদকের বাস এ নিছক গুজব—কবিকল্পনা। একটি মস্ত বড় গায়ক সেখানে কায়েমি হয়ে আছেন—পিয়ারে খাঁ—কিন্তু বড় গায়ক নন। শেষে আমার এক গুজরাতী বন্ধু রুখে উঠে আমাকে নিয়ে গেলেন এমন এক মস্ত গাইয়ের কাছে যাঁর তহবিলে মস্ত কেবল তাঁর ঢেউখেলানো গুম্ফরাজি। নিরাশ হয়ে সুভাষকে শুধালাম দিল্লির তর্ক মরুভূমিতে গানের ওয়েসিস কই? কিন্তু কথা তখন কানে তুলবে কে? সুভাষ তখন দেশোদ্ধারে এতই ব্যস্ত যে তার নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ ছিল না। কাজেই দিল্লি পরিত্যাগ করতে কোনও কষ্টই হোল না—বিশেষতঃ শরৎবাবুর মত সজ্জনের সঙ্গে। তা ছাড়া, সে ভিড়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে মধু-বৃন্দাবন দেখব, এ কথা ভেবে মনটা এক বিমল খুসিতে ভ'রে উঠল।

দিল্লিতে একজন মাত্র ভাল গায়ক আছেন। নাম মজঃফর খাঁ। গলাটি মন্দ নয়, গানের ঢংটি বেশ। তবে মুগ্ধকরী ক্ষমতা কিছুই নেই।

বাইদের মধ্যে একজন আছেন মন্দ নন—নাম চন্দ্রাবলী। মালকোষ ইনি বেশ গান।

দিল্লিতে একমাত্র স্বস্তি ছিল—কংগ্রেস-মণ্ডপ থেকে কোনও মতে অব্যাহতি পাওয়ার মধ্যে। যখন সেখান থেকে পালিয়ে বন্ধুবর বি—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মোটরে করে শরৎদাকে (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে দিল্লি সহর চক্র দিতাম ও একত্রে নানারূপ "গাল-গল্প" করতাম, কেবল তখনই আমাদের ধড়ে প্রাণ আসত যেন।

বি—কী যে রসিক! নানাসময়ে নানা প্রসঙ্গে এমন ভঙ্গিতে গম্ভীরের মধ্যে কৌতুকের আমদানি করতেন তিনি যে সময় হু হু করে কেটে যেত। বিশেষ করে উপভোগ্য ছিল তাঁর মার্কিণ মহিলাদের সামনে হিন্দু-মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার ঢং। মনে প'ড়ে যেত পিতৃদেবের অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত "কলিযজ্ঞে":

বাঙালী মহিমা কীর্তি-কলাপ কাহিনী
যদি শুন মন দিয়া বাবা, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

* * * *

দিল্লি থেকে বৃন্দাবন গেলাম শরৎদার সঙ্গে। ছিলাম কয়েকদিন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শরৎদার ভাই বেদানন্দ স্বামীর আতিথ্যে। সেখানেও বি—তাঁর মোটর নিয়ে হাজির। সুবিধা হ'য়ে গেল বৈ কি যত্র তত্র ঘুরে বেড়ানোর। সোজা গেলাম গিরিগোবর্ধন দেখতে।

গিরি গোবর্ধন দেখে বিশ্বাসই হ'ল না যে, সেটা একটা গিরি। একটা পুকুরের মধ্যে খানকতক বড় বড় পাথর। তবে পাণ্ডারা যখন শপথ করে বলল যে, হাঁ, সেইটেই গিরি গোবর্ধন, তখন বিশ্বাস করতেই হ'ল।

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে শরৎবাবুর সঙ্গে তিন দিন তিন-রাত্রি অজস্র গল্পালাপের মধ্যে কাটানো গিয়েছিল। তার ওপর সে শান্তরসাস্পদ আশ্রমে প্রশান্ত ভাবে অতিথি-সৎকার গ্রহণ করাটা আমাদের কাছে যে কম উপাদেয় ঠেকে নি, সে কথা বোধ হয় সহজেই

অনুমেয়। সুতরাং বৃন্দাবনধাম লাগবে ভাল এর আর আশ্চর্য কী—বিশেষতঃ কাটখোট্টা দিল্লি-কংগ্রেসের অত্যাচারের পরে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম শ্রীমন্দিরে-মন্দিরে একাকার। কত যে শ্রীমন্দির, কত যে শ্রীবৈষ্ণবী করতাল নিয়ে গান করেন, আর কত যে শ্রীকচ্ছপ, তার আর কী বল্‌ব! বৃন্দাবনে কিছুই তো শ্রীহীন নয়। কেবল দুঃখ এই যে, শ্রীযমুনায় স্নান করার বিপুল ইচ্ছা শ্রীকচ্ছপের লীলা-খেলার দরুণ সংবরণ করতে হ'ল।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে স্বামী বেদানন্দই একমাত্র কর্মী বললেই চলে। ইনি শরৎবাবুর ভ্রাতা এবং একজন সত্যিকার কর্মী। এক রকম একাই সেখানকার জনসেবার কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কাজেই তাঁর "দাদৃভক্তি"র দরুণ অতিথি-সৎকারের জেরটা আমাদের ওপরও এসে পড়েছিল। আমাদের মানে আমার ও আমাদের এক তরুণ বন্ধুর উপর। তরুণ বন্ধুটি ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী ও বাঙালী-সুলভ আড্ডারসের একান্ত রসিক।

মথুরায়ও একদিন যাওয়া গেল। সেখানে শ্রীমন্দির বিশেষ দর্শন করা ঘটে ওঠেনি—যে শ্রীহনুমানের অত্যাচার। আমার সঙ্গে ছিলেন কথাসাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র ও বিখ্যাত বিপ্লবী শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী—চোখে মোটা চশমা। বেশ চলেছি হাসতে হাসতে এমন সময়ে এলো কান্নার পালা—অকস্মাৎ মথুরার বিশ্রাম-ঘাটে এক বীর হনুমান ছোঁ মেরে বিপিনবাবুর চশমা হাতিয়েই বৃক্ষারূঢ়। তখন সুপক্ক কদলীর লোভ দেখিয়ে তবে চমশা উদ্ধার। শ্রীহনুমান নাকি নানা যাত্রীর সঙ্গেই এই ভাবে প্রীতির কণ্ঠীবদল ক'রে থাকেন।

মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে বৃন্দাবনই আমার বেশি ভালো লেগেছিল, যদিও কেন যে ভালো লেগেছিল, বলা কঠিন। কোনো কিছু ভালো লাগাটা নির্ভর করে অনেকগুলি জিনিষের উপর: যথা আমাদের তখনকার মানসিক অবস্থার উপর, সঙ্গের বা নিঃসঙ্গত্বের উপর, অনেক সময়ে সে স্থানটির সঙ্গে জড়িত নানান

ছোটখাট স্মৃতির উপর, যাদের বলতে হয় একান্ত ব্যক্তিগত। একথা বলছি এইজন্যে যে আমার সঙ্গী বা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই বৃন্দাবন ভালো লাগেনি। তাঁরা আমার বৃন্দাবন ভালো লাগার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন বৃন্দাবনে কী আছে যা ভালো লাগবার ম'ত? মনে পড়ে যেত এক ঘরোয়া বাংলা প্রবচন: "যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ী কিবা ডোম!"

মথুরায় শেঠজীর একটি বাগান আছে। যমুনার ঠিক উপরেই। বড় মনোরম স্থান। সেখানে একদা স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় একটি বাঁধানো ঘাটে বসেছিলাম। শরীর মন এক অপূর্ব মাধুর্যে রসিয়ে উঠেছে এমন সময়ে "ব্যাণ্ড!" আওয়াজ ক্রমেই বিবর্ধমান। সর্বনাশ! এমন যমুনার তীর! এমন সান্দ্র চন্দ্রালোকিত ঘাট! এমন বাগান! এমন পৌরাণিক প্রাণ-উদাস করা আবহ—এখানে সানাই নয়, বাঁশি নয়, বীণা নয়,কীর্তন নয়, বিহগ-কাকলি নয়, বিরহ-সঙ্গীত নয়—ব্যাণ্ড! শুনলাম কে এক রাজা এসেছেন। এক মুহূর্তে ভাষ্য মিলল: রাজাতেই এমন রুচি সম্ভব।

দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন—কোথাও কিন্তু ভালো গান বাজনা শোনা গেল না। আগ্রায় গেলাম; ভাব্‌লাম সেখানে অন্ততঃ কিছু ভালো গান শোনা যাবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় দিল্লি-আগ্রা, আর কোথায় সেখানকার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা! আগ্রায় একজন বেশ ভাল গাইয়ে ছিলেন ফৈয়স খাঁ; কিন্তু তিনি বরোদার গাইকবাড়ের সভাগায়ক হওয়ার দরুন আগ্রায় তাঁর দর্শন পাওয়া মিলল না। পরে বরোদায় তাঁর গান শুনবার সুযোগ হয়েছিল। সে-কথা যথাস্থানে লেখা যাবে। আগ্রায় আর একজন গায়িকা আছেন, তাঁর নাম লড্ডন জান। নামটি ঠিক কবিত্বময় না হলেও তিনি শুনলাম সুগায়িকা। কাজেই গান শোনবার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। আগ্রায় আমার আতিথ্যদাতা বন্ধুটি গান শোনাবেন ভরসাও দিলেন। কিন্তু: যাগাযোগ না হ'লে মানুষের একমাত্র

৯১১৯৩

লাঞ্ছনা কপাল চাপড়ে গাওয়া: "কপালং কপালং কপালং মূলম্।"

অথ, মনোদুঃখে গোয়ালিয়র প্রয়াণ। গোয়ালিয়র এক সময়ে সঙ্গীতের রাজধানী ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। কলকাতার কাছে মেটেবুরুজে লক্ষ্মৌয়ের বিখ্যাত রাজ্যহীন রাজা নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র সভায় ১২১ জন গাইয়ে-বাজিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে তাজ খাঁ, আলিবক্স খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত গাইয়েরা গোয়ালিয়রেরই গায়ক ছিলেন। ধ্রুপদে আলিবক্স খাঁর শিষ্য ছিলেন, বিখ্যাত ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও খেয়ালে তাঁর একমাত্র বাঙালী শিষ্য হচ্ছেন বেয়ালার প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এঁর কাছেই আমি গোয়ালিয়রের অপূর্ব্ব সঙ্গীতের চালের পরিচয় পাই। তাঁর কাছে ধ্রুপদে এত সুন্দর গোয়ালিয়রের চালের গমক ও মিড় এবং খেয়ালে এত সুন্দর মিড় ও হলক্ তান শুনেছি যে, গোয়ালিয়রের দিকে একবার তীর্থ-যাত্রা করার সাধ আমার বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্তু গোয়ালিয়রে একটিও বড় গাইয়ের দেখা পেলাম না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সেখানকার সঙ্গীত-রসিক দু'-একজন সুধী আমাদের প্রশান্তভাবে জ্ঞাপন করলেন যে, এটা আমাদের অনর্থক বিলম্ব ক'রে জন্মানোর ফল; কারণ, যাঁরা বড় বড় গাইয়ে ছিলেন, তাঁরা বহুদিন হ'ল গতাসু হয়েছেন। দানিবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য: গোয়ালিয়রে হাদ্দু খাঁ, আলিবক্স খাঁ, রহমৎ খাঁ প্রমুখ বিখ্যাত গায়করা শুধু যে ম'রে ভূত হয়ে গেছেন তাই নয়—তাঁদের কুলে বাতি দিতেও আর কেউ নেই। গোয়ালিয়রের অন্তিম দেউটিযুগল ছিলেন শঙ্কর পণ্ডিত ও বালা গুরু। এঁরা দু'জনেই কয়েক বৎসর আগে টিম্-টিম্-লীলা সংবরণ ক'রে গোয়ালিয়রকে অন্ধকারের জিম্মায় রেখে গেছেন। গোয়ালিয়রে এখন কেবল একজন গায়ক বংশে বাতি দিতে অবশিষ্ট আছেন: শঙ্কর পণ্ডিতের পুত্র—শিবরাত্রির সল্‌তে—কৃষ্ণ রাও।

তবে তাঁর গান আমার শোনা হয়নি, কাজেই তাঁর গায়কী নৈপুণ্যের সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলতে পারলাম না।

গোয়ালিয়রে গুণীদের মুকুটমণি নিশ্চয়ই হাফেজ আলি খাঁ। ইনি রামপুরের বিখ্যাত বীণকার উজীর খাঁর শিষ্য—অর্থাৎ আলাউদ্দীন খাঁর গুরুভাই। হাফেজ আলি খাঁর কাছে পরে আমি কিছুদিন গানও শিখেছিলাম। বড় দরদী ও ভদ্র ইনি স্বভাবে।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এঁর অসামান্য প্রতিভা। কী সুন্দর এঁর মিড়ের হাত। কী অপরূপ ঝংকারের ঢং। ইনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যান ও থাকেন বিখ্যাত গায়ক ৺লালচাঁদ বড়ালের বাড়িতে। সেখানেই আমি তাঁর কাছে ঠুংরির তালিম নিতাম—খেয়ালও কিছু শিখেছিলাম।

গোয়ালিয়রে এক মারাঠি বাদকের তাউস বাজানো শুনেছিলাম। তাউসকে বলা যায় এস্রাজের উন্নত—Royal—সংস্করণ। বেশ লেগেছিল: তবে হাফেজ আলি খাঁও সেদিন বাজিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর স্বরোদের পাশে তাউস নিভে গেল বৈকি।

গোয়ালিয়রে একজন মাত্র উৎকৃষ্ট গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাঁর নাম মঞ্জু বাই। বয়স ৬০ হবে। এখন বাতে পঙ্গু, কিন্তু গান করেন চমৎকার, তবে কাশীতে বৃদ্ধা হুশ্‌নার গান আরও ভাল লেগেছিল। হুশ্‌না মিড়ের কাজ বড় সুন্দর করে—যদিও মঞ্জু বাইয়ের গলায় তানের কাজ হুশ্‌নার চেয়েও ভালো। শুনলাম একসময়ে এঁর কণ্ঠকে কিন্নরীকণ্ঠ বলা চলত কিন্তু "বার্ধক্যদোষো সুকণ্ঠনাশী" অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই দুঃখ ক'রে বললেন যে ১০।১৫ বছর আগে এলেও তিনি এমন গান শোনাতে পারতেন যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোয়ালিয়রে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গীত বিদ্যালয়।* কয়েক বৎসর আগে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একা চেষ্টা

---

* স্মর্তব্য: সে-সময়ে ১৯২৩-৪ সালে পণ্ডিতজির নাম বাংলাদেশে বড়

করে এই স্কুলটির পত্তন করেন। এখন তিনি মাঝে মাঝে এ স্কুল পরিদর্শন করতে আসেন। স্কুলের অধ্যাপকগণ আমাকে ছাত্রদের গান শোনালেন। পাঁচ বৎসরের পাঠ। তারপর স্কুল থেকে সঙ্গীত-উপাধি দেওয়া হয়। বম্বেতে পণ্ডিতজি আমাকে বলেছিলেন, "আমার স্কুলের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের পাঁচ বৎসরে সঙ্গীতবিশারদ করে ছেড়ে দেওয়া নয়। সেটা আজীবনের সাধনার জিনিষ। সঙ্গীত-স্কুলের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের মনে উচ্চ সঙ্গীতের রস ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র, যাতে পরে তারা রুচির নির্দেশে আরও শিখতে পারে।" ঠিক কথা। এ-স্কুলের অনেকগুলি ছোট ছেলের মুখে নানা রাগের বিস্তার শুনে আশ্চর্য হ'তে হ'ল। তান লয় তালে রীতিম'ত সমৃদ্ধ। পাঁচ বৎসরের শেষে না কি প্রত্যেক ছাত্রই শতাধিক ধ্রুপদ ও তিনচারশো বিশুদ্ধ খেয়াল গাইতে পারে। তা ছাড়া তারা গান শোনবামাত্র স্বরলিপি করে নিতে পারে। পণ্ডিতজির অক্লান্ত সাধনা সার্থক হয়েছে বলতে হবে। প্রথম-বার্ষিকী যে দুটি ছাত্র আমার কাছে গাইল, তাদের বয়স হবে ৭।৮ বৎসর। দ্বিতীয়-বার্ষিকী ছাত্র সেদিন ছিল না। তৃতীয়-বার্ষিকী ছাত্র দুটির বয়স হবে ১০।১১ বৎসর। চতুর্থ-বার্ষিকীর বয়স ১৩-১৪ ও পঞ্চম-বার্ষিকীর ১৬।১৭ বৎসর। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বার্ষিকী ছেলেদের গান প্রায় অনবদ্য বলা চলে। কেবল শিক্ষকদের দোষ দেখলাম এই যে, তাঁরা ছাত্রদের বড় বেশি চড়া গলায় গাওয়ান। এতে বালকণ্ঠের মাধুর্যহানি হয়। তাছাড়া অনবরত চড়া গলায় গাওয়ার বিপদও সমূহ—অনেক সময় বালককণ্ঠে বয়সা ধরবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ জৌলুষ নিভে যায়। একথা আমি তাঁদের ব'লে এসেছিলাম ও visitor's book এ লিখেও এসেছিলাম।

কেউ জানত না। আমি প্রথম নানা প্রবন্ধে তাঁর নাম প্রচার করি—পরে আবদুল করিমেরও—সেজন্যে আমাকে বহু নিন্দা সহ্য করতে হয়েছিল বাঙালী ওস্তাদদের অনুগ্রহে।

গোয়ালিয়রের এ-স্কুলটিতে শুনলাম দু-তিনশো ছেলে গান শেখে। তা ছাড়া আরও দু তিনটি স্কুল আছে। গোয়ালিয়রের মতন ছোট শহরে বালকদের জন্য এতগুলি স্কুল আর আমাদের বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতায় ছেলেদের জন্য একটিও উল্লেখযোগ্য স্কুল নেই, এ-কথা ভাবলে মনে দুঃখ না হয়েই পারে না। কারণ, এটা কি আক্ষেপের কথা নয় যে, উচ্চ সঙ্গীতের অধ্যাপনা-উৎসাহে আমাদের সংস্কৃতি-গর্বিত বাংলা দেশ আজ এত পেছিয়ে প'ড়ে? অবশ্য গোয়ালিয়রের স্কুলগুলি মহারাজা সিন্ধিয়ার বদান্যতার গুণেই চলে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কি এমন দু'চার জন ধনীও নেই, যাঁদের চাঁদায় কলকাতায় অন্তত: দু তিনটা স্কুলও ভালো চলতে পারে? আসল কথা টাকা নয়, আসল কথা সঙ্গীতে আন্তরিক অনুরাগের অভাব। ভাবতে দুঃখ হয় বৈ কি যে বাঙালীর রাগসঙ্গীতে অনুরাগ মারাঠাদের চেয়ে অনেক কম। (এ-ও ১৯২৩-২৪ সালের কাহিনী।)

গোয়ালিয়র থেকে ঝাঁসি যাওয়া গেল। ঝাঁসিতে বীরনারী লক্ষ্মীবাইয়ের দুর্গপ্রাকার দেখলে মন ভরে ওঠে—আরো ভাবতে যে "ঝাঁসি কভি নহি দুঙ্গি" এমন কথা সে-যুগেও একজন থেকে বেরিয়েছিল।

ঝাঁসিতে এক গানের আসর হয়েছিল। সেখানে একজন শ্রমজীবীর ১৭।১৮ বৎসরের একটি ছেলে মুখে খাম্বাজ বেহাগ প্রভৃতি রাগ-রাগিনী এত মধুর গাইল যে, মনে দুঃখ হয়েছিল যে, গানে এমন স্বাভাবিক ক্ষমতা কত সময়েই না শুধু শিক্ষা ও সুযোগ অভাবে ফুটে উঠতে পারে না! য়ুরোপে ললিতকলায় এ-রকম অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব অনেক সময় পুরস্কৃত হ'তে দেখা যায়, যাতে ক'রে তার বিকাশ সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে এবিষয়ে লোকমত এখনো গ'ড়ে ওঠে নি।

সেদিন ঝাঁসির গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা একটি ভিখারিণীকে ডাকিয়ে এনে আমাকে তার গান শুনিয়েছিলেন। সে "পরত নাহি চৈন" ব'লে একটি পিলুবারোয়াঁ ফলিয়ে এমন মিষ্টি গাইল নানা রকমারি তান

দিয়ে যে আমরা শুধু মুগ্ধ না—অবাক হ'য়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে দুঃখ হ'ল বৈ কি যে এ-হেন আশ্চর্য গীতিপ্রতিভা শুধু শিক্ষা ও সাধনার সুযোগ অভাবেই সঙ্গীতরাজ্যের একটি তারকা হ'য়ে ফুটে উঠতে পারল না। ললিতকলায় এমন কত প্রতিভাই না আমাদের দেশে উৎসাহ অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়! তবে জগতে ট্রাজিডি এত বেশি যে, শিল্পকলার দিক্ দিয়ে এ-শক্তি-অপচয়ের জন্য আন্তরিক দুঃখ বোধ করাও বোধ হয় অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে একটু কঠিন হ'য়ে ওঠে। কেন না, এ সহানুভূতি প্রকাশ করবার আগেই আমাদের ক্ষুব্ধ মন বাধা দিয়ে বলে ওঠে যে, মানুষের অনাহার, দারিদ্র্য, রোগ-শোক প্রভৃতি শত শত গভীরতর দুঃখেরই ত আগে একটা স্থায়ী সমাধান করা যাক্—তার পর না হয় এ সব শিল্পকলায় মন দেওয়া যাবে। মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ সবচেয়ে বড় দুঃখ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই; সুতরাং, এ দুঃখ মোচনের চেষ্টাকেও ছোট ক'রে দেখা চলে না সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে উদয় হয় যে, মানুষের দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচবার আগে শিল্পচর্চাকে কি তা'হলে মুলতুবি রাখাই পন্থা? একটু ভেবে দেখতে গেলেই এ সম্বন্ধে নানারকম উল্টো-পাল্টা যুক্তিতে মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে কারণ মানুষের ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে, দুঃখ-কষ্ট মানুষ সৃষ্টির আদিমকাল থেকে ভোগ ক'রে এসেছে (এবং এখনও বোধ হয় অন্ততঃ বহুদিন ধ'রে করবে।) তাই আগে মানুষের অন্ন-বস্ত্রাদির ব্যাপক অভাবের সমাধান হোক, তার পরে শিল্পকলার ভাবনা ভাবা যাবে—এ-ধরনের বাণীকে জ্ঞানের বাণী ব'লে মেনে নিতে বাধে। কারণ যতই নানা যুক্তির সমাধান পেশ করি, প্রতি যুক্তির প্রতিবাদী যুক্তি আমাদের মনকে টানে অথই জলে। তখন বোধহয় সংশয়ের চাপেই মিইয়ে গিয়ে মন একটু বিনীত সুরেই হাল ছেড়ে দিয়ে বলে: "যখন মানুষের আধিব্যাধি দুঃখদৈন্যের নিরাকরণ কোন্ মহাত্মা কী ভাবে করবেন কেউই জানে না বা জোর করে বলতে পারে না তখন

যতদিন না বিশ্বমানব এ-সম্পর্কে একটা সমাধানে পৌঁছয় ততদিন তাকে শিল্পরস থেকে বঞ্চিত রাখলে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হবে। কারণ মানুষ বহু যুগের সাধনার্জিত প্রতিভার বলেই তাজমহল এলোরা অজন্তার কীর্তিসৌধ গ'ড়ে তুলতে পারে। যে-সৌধ বহু লালনের অপেক্ষা রাখে—তাকে ধূলিসাৎ করতে হ'লে শুধু অনাদরই যথেষ্ট। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী"—সত্য, কিন্তু ঐ সঙ্গে এও সমান সত্য যে সভ্যতার অবক্ষয়ে সব আগে ঝ'রে যায় তার পরম ফলফুল—শিল্প-কলা কাব্য গান। তাই রণতাণ্ডব, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, মহামারীর ঘোরতম কুফল মানুষের আধিভৌতিক দুঃখকষ্ট নয়—এসবের অভিশাপ শেল হ'য়ে বাজে সব আগে মানুষের যুগসঞ্চিত বহুসাধনালব্ধ ধন শিল্পকলার অভিমানী বুকে। আধিব্যাধি ভূমিকম্পের অন্তে মানুষ ফের অন্নসংস্থান করে, প্রিয়বিয়োগের পরেও নব সম্পর্কের সান্ত্বনায় ব্যথার উপশম খোঁজে, কিন্তু বর্বরতার উৎসাদনে শিল্পকলার যে-সুষমাপদ্মটি ঝ'রে যায় সে আর ফোটে না তার হারানো রূপ নিয়ে। দ্বিজেন্দ্র-লালের একটি গানে আছে:

"জগত যা নিয়ে যায় একবার—ফিরায়ে দেয় না আর তায়"। একথা সবচেয়ে বেশি খাটে অন্নলোকের সংস্থানের বেলায় নয়—শিল্পকলার বিকশনের ক্ষেত্রে।

* * *

বাঙ্গালোরে শেষণের অপূর্ব বীণা ছাড়া অন্য কোনো সত্যিকার মনোহর সঙ্গীত শোনা হয় নি। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত যথেষ্ট শোনা গিয়েছিল; কেবল তার মধ্যে মনোহারিত্ব ছিল না, এই যা দুঃখ! তবু দক্ষিণী গান-বাজনার খুব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শুনেছিলাম অনেকটা কর্তব্য-বোধেই বলব, কারণ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যার মনে একবার অনুরণন তুলেছে, কর্ণাটী সঙ্গীত তার কেবল কানের ভিতর প্রবেশ করতে পারে মাত্র, "মরমে পশিতে" পারে না। দক্ষিণীরা তাদের সঙ্গীত রীতিবদ্ধ, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব'লে গর্ব

ক'রে থাকে; কিন্তু তারা গানে এমন অদ্ভুত ভাবে স্বরকে নাচায়, যাতে আমাদের মনটা কেমন যেন একটু উদ্‌ভ্রান্ত না হয়েই পারে না। তবে দক্ষিণী সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার ধারণা এ-রকম সাধারণ ভাবে না ব'লে, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলাই ভালো। তাই আপাততঃ দক্ষিণী গায়ক-বাদকদের কি কি গুণপনা আমার চোখে পড়েছিল সে সম্বন্ধেই দু-চারটি কথা বল্‌ব।

বাঙ্গালোরে ভাগবতার উপাধিযুক্ত একটি গায়কের গান শুনেছিলাম। শুনলাম যে, ইনি এ-অঞ্চলে প্রথিতযশা না হলেও, উদীয়মান গায়ক ব'লে গণ্য হয়ে থাকেন। তবে তিনি উদীয়মান কি অস্তমান সে কথা ছেড়ে দিলে তাঁর গানের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তাতে কম্পমান না হয়ে থাকতে পারে, এমন শ্রোতা এক দক্ষিণেই মেলা সম্ভব। কারণ, তাঁর জীবনের জপমন্ত্র ছিল বিদ্যুদ্বেগে গান ক'রে নিজেকে ও অন্য পাঁচ জনকে দুতুশে না হোক সচকিত ক'রে তোলা। তবে তাঁর সে-গানের আসরের মধ্যে আমার ভালো লেগেছিল এইটুকু মাত্র যে, সেটা ছিল বিশুদ্ধ গানের আসর। সকলেই সেখানে এসেছিল গান শুনতে। অর্থাৎ সেখানে যে-কেউ টিকিট কিনলেই সে-গান উপভোগ করতে পারত। আমাদের দেশে জনসাধারণ উচ্চসঙ্গীত শোনবার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ পায় না—এ অনুযোগ আমি বহুবারই করেছি আমার নানা ভাষণে তথা প্রবন্ধে। তাই এ-প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ না ক'রে আপাততঃ এইটুকুমাত্র ব'লেই থামি যে, আমাদের উচ্চসঙ্গীত যাতে জনসাধারণ শুনতে পায়, সে-বন্দোবস্ত করতেই হবে। এ-পর্যন্ত কেবল রাজা-উজীর-জমিদাররাই ওস্তাদ-বাইজীদের পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে তাঁদের ভরণপোষণ করতেন নিজেদের প্রিয়পাত্র দু-চারজনকে শোনাতে। এখন আর সে রকমটি চল্‌বে না। কারণ, সঙ্গীতের ভর অনুরাগীর আনন্দের 'পরে, শুধু রসিকের রস জুগিয়েই যে সার্থক, সাধকের সাধনায়ই তার পুষ্টি—বড় মানুষের একচেটে হ'লে তার মুক্তি নেই।

দক্ষিণে এই জিনিষটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল যে, সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েরা টিকিট ক'রে গান-বাজনার আসর ক'রে থাকেন। কারণ আজকের দিনে শুধু এই উপায়েই গান-বাজনার সম্বন্ধে রুচি বা লোকমত গ'ড়ে উঠতে পারে। রাজা-রাজড়ার সভায় গান বাজনা হলে, যথার্থ সঙ্গীতানুরাগীর সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কাজেই উচ্চসঙ্গীতের আবেদন যেখানে পৌঁছান উচিত, সেখানে পৌঁছয় না।*

ভালো গান মাঝে মাঝে শুনতে পায় বলেই কি না জানি না, তবে মান্দ্রাজীরা গীতবাদ্য যে অত্যন্ত ভালোবাসে এ সকলেরই চোখে পড়ে। রাস্তায় ঘাটে উৎসবাদি উপলক্ষে তারা ছোট বড় দল ক'রে বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে গাইতে গাইতে নগর পরিক্রমণ করে থাকে। সহজ সরল সঙ্গীত সচরাচর লোকপ্রিয় হয় ব'লে, এ রকম দৃষ্টান্তকে কোনও জাতির যথার্থ সঙ্গীতানুরাগের প্রমাণ স্বরূপে না হোক, খানিকটা নিদর্শন হিসেবেও গণ্য করা চলে না কি? একথা বলছি এইজন্যে যে নগরকীর্তনে সচরাচর সঙ্গীতের জয়ধ্বনির চেয়ে শ্রদ্ধাই বেশি ঘটে থাকে। তবু সঙ্গীতের টানেই যে লোকে দলে দলে এ-জাতীয় শোভাযাত্রায় যোগ দেয় একথাও মানতেই হবে। শুধু ঢাক বাজিয়ে বা শিঙে ফুঁকে বেশি লোক জড়ো করা সম্ভব নয়। উচ্চবিকশিত সঙ্গীতের আদর কলাকুশলী তথা শিল্পানুরাগীদের কাছেই। কিন্তু যা বলছিলাম।

* পাদটীকায় বলতে চাই যে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে লেখা এ-মতটির মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও সবটাই সত্য নয়। উদাহরণ আজকের রেডিও—ভালো গানের কী হালই করেছেন রেডিওর বণিক সম্প্রদায়! বোতাম টিপে ভালো গান শোনা আর কষ্ট ক'রে আসরে ব'সে ভালো গান শোনার মধ্যে তফাৎ কত, বলার কি দরকার আছে? অবশ্য রেডিও গানের প্রচারে সাহায্য করছে মানি, কিন্তু ভালো গান যে সস্তা ক'রে ও দিনরাত গান বাজিয়ে মানুষের কাছে সঙ্গীতের মর্যাদাহানি করেছে একথাও মানতেই হবে।

ভাগবতার মহাশয়ের গানের মধ্যে ছিল বিদ্যুদ্বেগ গতি। আর ছিল সেই অদ্ভুত দক্ষিণী স্বরকম্পন। আর ছিল অসাধারণ তালে দক্ষতা। ছিল না কেবল সুন্দর মিড়ের প্রাদুর্ভাব। ছিল না মনোজ্ঞ স্বাভাবিক তানালাপ। সর্বোপরি, ছিল না গানে প্রাণের কোনও বালাই। তবে যেহেতু এক শেষণের বীণায় ছাড়া এ সব গুণগুলির উপদ্রব দক্ষিণী সঙ্গীতে একেবারেই দেখা যায় না, সেহেতু এজন্যে ভাগবতার মহাশয়কে দোষী করা আমার অভিপ্রায় নয়। কারণ কোনও দেশের সঙ্গীতের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রধানতঃ তার ঐতিহ্যের উপর। দক্ষিণী বা কর্ণাটী সঙ্গীতের আদর্শ হচ্ছে তালে দক্ষতা, রাগের বিশুদ্ধতা ও গতানুগতিকতার আনুগত্য। কাজেই তাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দরদ, মিড়, গমক, প্রশান্ত আলাপ—এসব আশা করাও হয়ত পুরোপুরি সঙ্গতও নয়। যেখানকার যা।

কর্ণাটী সঙ্গীত অত্যন্ত বিধিবদ্ধ এই জাঁকে দক্ষিণীরা প্রায়ই হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকে হেনস্থা ক'রে থাকেন। তাঁদের এ-জাতীয় অবজ্ঞাকে পাল্‌টে অবজ্ঞা করা চলে, যেহেতু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মাধুর্যের মর্মকোষে দক্ষিণীরা আজ পর্যন্ত ছাড়পত্র পান নি। পাবেন কি করে? বাউল গানে আছে ঃ

কমলবনে কে পশিল সোনার জহুরী!
নিকষে ঘষয়ে কমল—আ মরি মরি!

হিন্দুস্থানী গানের প্রশান্তি মিড় সূক্ষ্ম গমকাদি অলঙ্কারের রূপশ্রীর সমজদার হ'তে হ'লে চিত্তের ও শ্রুতির বিকাশ হওয়া চাই। সোনার জহুরী হাজার নিপুণ "ঘষিয়ে" হলেও যে পদ্মের রসের নাগাল পায় না একথা আমাকে নানা ভাবেই বলতেন বিখ্যাত আবদুল করিম খাঁ যিনি কর্ণাটী সঙ্গীতও জানতেন ও ওদের রাগও নির্ভুল গাইতে পারতেন। তাই তাঁর মতের মূল্য দিতেই হবে। তিনি বলতেন প্রায়ই যে দক্ষিণীরা ওস্তাদ হিসেবে ধনুর্ধর কিন্তু সুকুমার সুরকার নয়।

দক্ষিণী গায়কের ঢং সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে আমার আরো কিছু বক্তব্য আছে।

কর্ণাটী গায়কেরা একটা জিনিষের বড়ই ভক্ত। তারা এক এক সময়ে এত দ্রুত "সার্গম" আলাপে মত্ত হয়ে ওঠে যে, বাস্তবিকই শুধু তার বিদ্যুদ্বেগ গতির জন্যই শ্রোতৃবৃন্দের রোমহর্ষণ হতে থাকে। মাঝে মাঝে যখন এ "সার্গম" আলাপ প্রায় মেল ট্রেনের বেগে পৌছয়, তখন দক্ষিণী শ্রোতৃবৃন্দের করতালিতে ঘর মুখর হয়ে ওঠে, ও উপলব্ধি করা যায় যে, হাওয়ার মধ্যে উৎসাহের তাপ কতখানি।

তবে একটি কথা: সঙ্গীতের নিছক দ্রুতগতি অনেক সময়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেললেও, এ-মোহ প্রায়ই সঙ্গীতের গভীর রসানুভূতির পথ আগলে দাঁড়ায়। কেন—বলি। জলদ গেয়ে বা বাজিয়ে মানুষকে যে চমকে দেওয়া যায় না তা নয়—বিশেষতঃ যদি অনভিজ্ঞকে নিয়ে কারবার হয়। তবে এ-চমকে দেওয়ার মূল্য খুব বেশি নয়। কারণ সঙ্গীতে এ-শ্রেণীর আনন্দ সুরের গভীর রসে রসিয়ে ওঠার আনন্দ নয়, তার দুরূহতার দরুণ বিস্ময়ের আনন্দ মাত্র। দুঃসাধ্য কিছু দেখলে বা শুনলে আমাদের মনে একটা স্বাভাবিক বিস্ময় আসেই আসে। তার ওপর প্রবুদ্ধ সমালোচনার প্রাদুর্ভাব না থাকলে এরূপ মল্লযুদ্ধের প্রশংসা শুনতে শুনতে মনটা অনেকটা বিহ্বল মতন হয়ে পড়ে ও মনে করে বসে যে এরূপ মল্লযুদ্ধ বুঝি খুবই বড় আর্ট। যেখানে প্রবুদ্ধ সমালোচনার দুর্ভিক্ষ সেখানে ছোট জিনিষকে বড় করে দেখানো খুবই সহজ। দক্ষিণীদের মধ্যে এই অসম্ভব জলদ গাওয়ার উৎসাহ দেখে, এ সত্যটি যেন আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছিলাম। দক্ষিণীরা বিদ্যুৎগতি সর্গমের উত্তেজনাকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ বলে মনে করে থাকে। অথচ তাদের "সার্গম" আলাপের গতি সময়ে সময়ে এতই দুর্দান্ত হয়ে ওঠে যে তখন সুরের হয় গঙ্গাযাত্রা।

বাস্তবিক কর্ণাটী সঙ্গীতে তালের উপদ্রব (অর্থাৎ জলদ গাওয়া)

এত বেশি যে, সেটা বর্ণনা ক'রে বোঝান সম্ভব নয়। এবং এ দ্রুত গাওয়ায় দক্ষিণীরা উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে—"সার্গম" সাধনের বেলায়। একে কিন্তু বাস্তবিকই একটা অষ্টম বিস্ময় বললেও চলে। মানুষে যে কত দ্রুত সা রে গা মা পা ধা নি সা উল্‌টে পাল্‌টে বলতে পারে, সেটাও যে একটা শোনবার জিনিষ, তা যিনিই দক্ষিণী "সার্গম" আলাপ শুনেছেন, তিনিই জানেন। আমাদের হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব দক্ষিণী ওস্তাদদের অনেক নীচে। আমরা বোধ হয় এ-বিষয়ে দক্ষিণীদের সমকক্ষ হ'তে পারব না। কথাটা কি রকম জানেন? তিন সেকেণ্ডের মধ্যে যদি কাউকে অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়দর্শন, উনবিংশতি সংহিতা ও চতুর্ব্বেদের নাম করে যেতে বলা হয়, তাহলে তাকে কিরূপ বিদ্যুদ্বেগে এ সব নাম জপ করতে হয়, একবার ভেবে দেখুন। তবে যদি কেউ বলেন যে এটা অসম্ভব, তাহলে আমি তাঁকে একবার মাত্র মহীশূরের গায়ক বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহোদয়ের গান শুনে সকল সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে আসতে বলব।

বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহাশয়ের গান আমি শুনেছিলাম মহীশূরে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ওখানে। এখানে কথা উঠতে পারে যে, বিড়ার কৃষ্ণপ্পার মতন বেখাপ্পা নামধারী লোক বড় গায়ক হতে পারেন কি না। কারণ এ সঙ্গে তর্ক উঠতে পারে যে, এও যদি সম্ভব হয়, তবে জগদম্বাও সুন্দরী হ'তে বা হিড়িম্বচন্দ্রও কবি ব'লে গণ্য হ'তে পারেন কি না। এ গুরুতর গবেষণার ভার দার্শনিকদের হাতে ছেড়ে দিলে বলা যেতে পারে যে, "তথাপি" কৃষ্ণপ্পা মহোদয় মহীশূরে একজন বড় গায়ক বলে গণ্য। যাঁর সন্দেহ হয়, তিনি যেন একবার মাত্র তাঁর সার্গম আলাপ শুনে আসেন।

কর্ণাটী সঙ্গীত অনেকটা মুসলমান প্রভাব থেকে মুক্ত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মুসলমানের দানে সমৃদ্ধ। ফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢঙের মধ্যে এমন একটা সমৃদ্ধ রস মেলে, যেটা কর্ণাটী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একেবারেই মেলে না। যাঁরা সঙ্গীতে পুরাতনপন্থী—এ সত্যটি তাঁদের অনুধাবনীয়।

সঙ্গীতের—শুধু সঙ্গীতের কেন, সব ললিতকলারই প্রাণ হচ্ছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর। কোনও বিদেশী সভ্যতার অভিঘাত মানুষের একটি বড় অভিজ্ঞতা ব'লেই তার ফল ললিতকলার উপরে না ফ'লেই পারে না। যেমন ইতিহাসে দেখি, ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল ; গ্রীক স্থাপত্য রোমান স্থাপত্যকে গ'ড়ে তুলেছিল ; ইতালীর Renaissance-এর শিল্পকলা সমগ্র য়ুরোপের শিল্পকলার উপর তার ছায়া ফেলেছিল ; ফরাসী বিপ্লবের সাম্যনীতি তখনকার প্রায় সমস্ত জগতের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—আরো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এক সভ্যতার আর এক সভ্যতার উপর ছাপ পড়া শুধু যে অস্বাভাবিক নয় তাই নয়—বাঞ্ছনীয়ই বলব। আসল কথাটা এই যে, বিদেশীর দান থেকে সত্য লাভ করতে হ'লে, যাকে বরণ করছি তাকে প্রত্যেকের নিজের নিজের সভ্যতার ও বিকাশধারার উপযোগী ক'রে নিতে হবে, স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, আত্মসাৎ ক'রে। মুসলমানেরা আমাদের মধ্যে ছিল। সুতরাং আমাদের সঙ্গীতে তাদের দানের মধ্যে নূতনত্ব থাকলেও সে নূতনত্ব কৃত্রিম নয়। সে একটা স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্তির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ। এ কথার প্রমাণ মেলে—তানসেনের সৃষ্ট দরবারী কানাড়া, আড়ানা, মিঞামল্লার প্রভৃতি নূতন রাগ সংমিশ্রণে—আমীর খসরু, সদারং প্রমুখ স্রষ্টাদের খেয়ালে—শোরী হমদম কদর পিয়া প্রমুখ গুণীদের টপ্পা ঠুংরী সৃজনে —আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় কিন্তু তার দরকার নেই।

অনেক কর্ণাটী সঙ্গীতাভিমানীকেই তাঁদের রাগের বা "মেলকর্ত্তা"র বিশুদ্ধতা নিয়ে জাঁক করতে দেখা যায়। সংসারে সব কিছুরই গোঁড়া হওয়া যায়, যেমন দক্ষিণী রাগরাগিণীর ঠাটের বা "মেলকর্ত্তার" বিশুদ্ধতা কর্ণাটী সঙ্গীতরসিকদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন হয়েছে যে, মহীশূরের একজন বুদ্ধিমান সঙ্গীতজ্ঞও * সেদিন অম্লান

* Krishna Rao… …Psychology of Music.

বদনে রায় দিয়েছেন যে কোনও রাগে দুই মধ্যম (যেমন বেহাগ বা পুরবীতে) বা দুই গান্ধার (যেমন সিন্ধু বা জয়জয়ন্তীতে) বা দুই নিখাদ (যেমন দেশ বা খাম্বাজে) ব্যবহার করা নীতিবিগর্হিত, কর্ণাটী সঙ্গীতে এরূপ প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য ও সেইটেই আদর্শ হওয়া উচিত; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেহাগ, খাম্বাজ, পুরবী, সিন্ধু, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগিণীর সঙ্গে যাঁর সামান্য পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন, এ কথা কত অশ্রদ্ধেয়। দুই গান্ধার মধ্যম বা নিখাদ ব্যবহার ক'রে এ রাগিণীগুলির সৌন্দর্য যে কতখানি বেড়ে গেছে, সে কথা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে অগোচর থাকতেই পারে না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে :…"The proof of the pudding lies in the eating." এখন যদি কেউ বলেন যে, যেহেতু এ তরকারীটিতে আদার রস বা গোলমরিচ দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এটি খেতে যত চমৎকারই হোক না কেন, আসলে অশাস্ত্রীয় তরকারী তৈরি হয়েছে, তাহলে কথাটা কেমন শোনায়? এরূপ যুক্তিপ্রয়োগের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, যদি আমার কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে, তবে জন্ম জন্ম বেঁচে থাকুক আমার কাঠের বেড়াল।

বাঙ্গালোরে আয়প্পা বলে এক ভদ্রলোকের বেহালা শুনিয়েছিলাম ও মহীশূরে দেবেন্দ্রপ্পা বলে এক ভদ্রলোকের জলতরঙ্গ শোনা গিয়েছিল। মান্দ্রাজীদের "প্পা"ন্ত নামধারী গুণীদের বাজনার মধ্যে নৈপুণ্য যেন একটু বেশি রকমের। বিশেষতঃ বেহালায় এত দক্ষ বাদক বোধ হয় ভারতে আর নেই। তবে আমার দুঃখ হ'ত যে, এত শ্রমস্বীকার করে বেহালা না শিখে, এঁরা যদি কোনও উৎকৃষ্ট ভারতীয় যন্ত্র শিখতেন! কারণ বেহালায় আমরা যতই কেন না ভালো বাজাই, য়ুরোপীয় বাদকের সমকক্ষ হ'তে কখন পারব না। তারা বেহালা থেকে যে জলদ-গম্ভীর উদাত্ত স্বর তুলতে পারে, সে রকম স্বর আমি কোনও ভারতীয়ের বেহালায় কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। য়ুরোপে Kreisler, Hubermann, Mischa Elman, Veschey প্রভৃতির

মনোমুগ্ধকারী বাজনা যিনি শোনেন নি, তিনি বুঝবেন না আমি কেন ভারতীয়ের বেহালা সাধনার বিপক্ষে। এক যদি আমরা আশৈশব "য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে" বেহালা শিখি তাহ'লে হয়। কিন্তু তা'হলে আবার উল্‌টো বিপদ এই হ'য়ে পড়ে যে, আমরা সঙ্গীতে আমাদের বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলব, যেমন জাপানের ক্ষেত্রে হয়েছে। জাপানে public concert হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের উপরে। জাপানীরা বাজায় য়ুরোপীয় যন্ত্র ও আলোচনা করে য়ুরোপীয় সঙ্গীত।* য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসগ্রাহী হওয়ার আমি বিরোধী নই, কিন্তু আগে "আমাদের" সঙ্গীতের রসজ্ঞ হ'তে হবে। নৈলে আমার মনে হয় সবই বৃথা। কারণ বিদেশী সঙ্গীতে আমরা স্থায়ী সৃষ্টি করতে পারব, এ ভরসা খুবই কম। লাভের মধ্যে হবে এই যে, আমাদের বৈশিষ্ট্যটি আমরা হারিয়ে দেউলে হয়ে বসে থাকব।

মান্দ্রাজ শহরটি বেশ লেগেছিল। অথচ সমুদ্রই মান্দ্রাজের প্রধান শোভা। মান্দ্রাজের সমুদ্র সৌন্দর্যে পুরীর সমুদ্রের চেয়ে হীন নয়, এবং বোম্বায়ের সমুদ্রের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সমুদ্র যদি পুষ্করিণীর মতন শান্ত হয়, তবে তার একটা আলাদা শোভা থাকলেও, সমুদ্রের অশান্ত কল্লোলই বেশি মন টানে।

মান্দ্রাজে Theosophical Society-র রম্য হর্ম্য ও সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাগান একেবারে সমুদ্রের ধারে। এক দিন সেখানে চাঁদিনী রাতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া গিয়েছিল। নানা জাতীয় য়ুরোপীয় নরনারী সমুদ্রতটে bonfire করছিল ও কেক আদির চর্চায় পার্থিব ও অপার্থিব আনন্দের এক মনোজ্ঞ সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় নিরত ছিল। বলা বাহুল্য আমরা সে-দলে সোৎসাহেই ভিড়ে গেলাম। বিবিধ য়ুরোপীয় জাতির জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হ'ল। ভারতীয় সঙ্গীতও হ'ল। সব জড়িয়ে সেদিনকার রাতের স্মৃতিটি বড় মধুর হয়ে উঠেছিল। একদিকে প্রকৃতির

* Cousin সাহেবের জাপানের সম্বন্ধে গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীতের আর্টে বৈপরীত্য বা contrast এর বর্ণসম্পাতের মূল্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন। তাই বোধ হয় তিনি তাঁর খেয়ালে ঠুংরির তানও দেন, টপ্পার গিট্‌কারীও আমদানী করতে ছাড়েন না। এজন্য গোঁড়া খেয়ালীরা অবশ্য তাঁকে নিন্দা করতে ছাড়েন না (আমাদের দেশে এক ওস্তাদ কবে অন্য ওস্তাদকে সুখ্যাতি করেন ?) কিন্তু এরূপ স্বাধীনতার ফলে যে তাঁর সঙ্গীত কত সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে সে বর্ণনা ক'রে বোঝানো অসম্ভব। এক কথায় তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে জীবনের স্পন্দন আছে, তা গতানুগতিকতা-সর্বস্ব নয়। তাই ভবিষ্যৎ সঙ্গীতকারদের মধ্যে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা ও নতুন ঢঙের দৃষ্টান্ত যে একটা জীবনের স্রোত আনবে এমন ভরসা করা চলে বৈ কি।

* * * *

বাঙ্গালোর থেকে পুনায় আসা গেল। পুনায় আসার দুটো উদ্দেশ্য ছিল ; একটা বিখ্যাত আবদুল করিমের কন্যার গান শোনা ও আর একটা মহাত্মাজীর সঙ্গে পুনা হাঁসপাতালে দেখা করা। ১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পুনায় পৌঁছই। মহাত্মাজী তখনও শয্যাশায়ী। শুনলাম, তাঁর সঙ্গে হাঁসপাতালে লোকজনকে দেখা করতে দিচ্ছে। এ সুবিধা ছাড়া নয়।

পুনায় শুনলাম আবদুল করিম খাঁর কন্যা রীতিমত গানের চর্চা ক'রে থাকেন। ঘণ্টা দেড়েক তাঁর গান শোনা গেল।

করিম-কন্যার গান বাস্তবিকই শোনবার মতন ; কিন্তু তা সত্বেও গিয়ে যখন দেখলাম যে, তাঁর বয়স নিতান্ত কম (১৯।২০ হবে), তখন মনে হয়েছিল যে, দক্ষিণা দিয়ে এঁর গান শুনতে না এলেই হ'ত। কারণ, গানবাজনা সম্বন্ধে আশৈশব চর্চা ক'রে এটা এখন বেশ বোঝা গেছে যে, ছেলেমানুষের গানে চিত্তাকর্ষক উপাদান যথেষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু উচ্চতম সঙ্গীতের আসল রসটি তার মধ্যে পূর্ণভাবে মূর্ত হয়ে উঠতেই পারে না। কারণ, গানে দরদ জিনিসটি ফুটতে বয়সের অপেক্ষা রাখে। তবে তা সত্বেও করিম-কন্যার গান

যে শোনবার মতন মনে হ'ল, তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁর গানের চাল অবিকল তাঁর পিতার চালের অনুরূপ; দ্বিতীয়তঃ তাঁর গলায় সূক্ষ্ম তানের কাজ বাস্তবিকই আশ্চর্য। আশা হ'ল যে, যদি পরে তাঁর কখনও চোখ ফোটে যে, নিছক অনুকরণে শ্রোতাকে আশ্চর্য করা যেতে পারে কিন্তু সঙ্গীতে রসসৃষ্টি করা যায় না, তাহলে হয়ত তিনি একজন খাঁটি শিল্পী গায়িকা হয়ে পিতার নাম রাখতেও পারেন। *

২রা ফেব্রুয়ারী সকালে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার তীর্থংকরে তথা Among the Great-এ ফলিয়েই লিখেছি ব'লে তাঁর সঙ্গে আমার কথালাপের পুনরুক্তি করলাম না। বলি এর পরের অধ্যায়ের কথা—যখন পুনা থেকে বম্বে হয়ে যাই আমেদাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে আহূত হয়ে।

* * *

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে আমেদাবাদে একটি সঙ্গীত-সম্মেলন হয়েছিল। ভাতখণ্ডে মহোদয়কে এ সম্মেলনের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে এরূপ সম্মেলনে তাঁর নিমন্ত্রণ থাকা সত্বেও তিনি যেতে পারেন না, যেহেতু এটি হচ্ছে একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত-সম্মেলন, নিখিল ভারতীয় সম্মেলন নয়। বস্তুতঃ এ সম্মেলনটি বম্বের খ্যাতনামা বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের দ্বারাই আহূত হয়েছিল। ভাতখণ্ডে মহোদয় বললেন যে, এ সম্মেলনে কাজেকাজেই বিষ্ণুদিগম্বরের একাধিপত্য না মেনে নিলে হবে না, তাঁর স্বরলিপি-পদ্ধতির অনুমোদন না করলে চলবে না, মুখ্য বিষয়গুলিতে তাঁর মতে সায় না দিলে আলোচনাদিতে যোগদান করা যাবে না। তাছাড়া এ সম্মেলনে বড় বড় গায়ক বড় একটা কেউই আসবে না। বিভিন্ন

* বহু বৎসর পরে কলকাতায় তাঁর গান শুনে মনে আনন্দ হয়েছিল দেখে যে করিম-কন্যার গানের পরিণতি সুন্দরের দিকেই হয়েছে—তিনি বিশেষ করে ঠুংরিতে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এও কম কথা নয়।

প্রদেশস্থ গায়ক বাদক যারা আসবে তারা অধিকাংশ স্থলেই বিষ্ণু-দিগম্বর মহাশয়ের ছাত্র। কাজেই এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ধরতে গেলে তাঁরই পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রণালীর নমুনা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কথাগুলি শুনে তখন বড় দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে গিয়ে দেখলাম যে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ ভারতবর্ষের দুই একজন বড় গাইয়ে বাজিয়ে যে আসেন নি এমন নয়। আমি আজ তাঁদের মধ্যে শুধু একজনেরই গানের আলোচনা করব। তাঁর নাম বিখ্যাত সঙ্গীতরত্নাকর আল্লাবন্দে খাঁ।

তাঁর গান হচ্ছে ধ্রুপদ এবং এ-ধ্রুপদ আলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এতে গমকের প্রাচুর্য।

এরূপ হৃৎস্তম্ভনকারী গমক আমি কখনও শুনি নি। এর মধ্যে একটা গাম্ভীর্য আছে বটে কিন্তু বড় একঘেয়ে ও সুরের কোনও বালাই আছে ব'লে মনে হ'ল না। মিষ্টত্ব ও আর্ট হিসেবে বাংলাদেশের ধ্রুপদের বাইরে নাম আছে। তাতে এধরণের সুষমাহীন গমকের আতিশয্য নেই।

খাঁ সাহেবের অভ্রভেদী নাম সত্বেও তাঁর ধ্রুপদে বাংলাদেশের ধ্রুপদের মত আর্ট তত নেই, আছে নৈপুণ্য। তাছাড়া তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল না ও মুদ্রাদোষ এতই বেশি যে সময়ে সময়ে দুঃসহ হয়ে ওঠে। এ-সভার কোনও বাজিয়ের অতি হাস্যকর মুদ্রাদোষ দেখে যখন সে সময়ে সভার মধ্যে হাসির হররা পড়েছিল তখন আমার পাশের একটি ছোট ছেলে অত্যন্ত সরল বিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তাঁর উদ্দেশ্য কি লোককে হাসানো? আমাদের সঙ্গীতে বিসদৃশ ও হাস্যকর মুদ্রাদোষ-বাহুল্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, এ প্রশ্নটির মর্ম তিনি বুঝবেন।

খাঁ সাহেবের গান পরে আরো একদিন এক কোটিপতির বাড়িতে শোনবার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু আমি মুগ্ধ হতে পারিনি। এবং সঙ্গে

সঙ্গে এ-চালের গান লোপ পেতে বসেছে ভেবে দুঃখবোধ করতেও পারিনি। খুব কম লোকই বোধহয় এ-গানের নমুনা শুনে এর ক্রমাবলুপ্তিতে ভগ্নহৃদয় হবেন। সঙ্গীত যে মল্লযুদ্ধ নয়, তার লক্ষ্য যে মানুষের মনের মাধুরীকে সুরের রঙে ফুটিয়ে তোলা—এ-সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে। অবশ্য অনভিজ্ঞের কাছে মনোজ্ঞ তান বিস্তারও হয়ত অনেক সময় অ-সুন্দর মনে হতে পারে, তাই সকলেই যে বিনা সাধনায় রাতারাতি সুন্দরকে সুন্দর ব'লে চিনতে সক্ষম এমন কথা জোর করে বলা যায় না। ভাল শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পরিচয়ই তার সুন্দরকে চেনার একমাত্র পন্থা। তাই আমি বলতে চাই না যে উচ্চসঙ্গীত সকলেরই ভাল লাগতে বাধ্য। তবে একথা বোধহয় বলা যায় যে, মানুষ শিল্পে অলঙ্কারকে এমন বাড়িয়ে তুলতে পারে যাতে তার রূপের সুষমা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাবন্দে খাঁর মল্লযুদ্ধ দেখে আমি এ সত্যটি আরো ভালো ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁর গানে নাদপ্রধান গমকের এতই প্রাধান্য যে তা বেসুরো বলে মনে না হ'য়েই উপায় নেই। পরে একজন খুব বড় ওস্তাদের মুখে শুনেছিলাম যে খাঁ সাহেবের কান সুরে খাটো। কিন্তু এক ওস্তাদ সচরাচর আর ওস্তাদকে প্রশংসা করেন না ব'লে শেষোক্ত ওস্তাদদের এ নিন্দায় কান না দেওয়াই সঙ্গত।

মোটের উপর আমেদাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই ছিল, যদিও উপভোগ্য সঙ্গীত ছিল বড়ই কম। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে একটি তথ্য ছিল এই যে, আমাদের দেশে গায়কের মধ্যে ওস্তাদ যেমন কম, ওস্তাদদের মধ্যে শিল্পী তার চেয়েও কম। আজকের দিনে আমাদের দেশে চন্দন চৌবে, আব্দুল করিম, শেষণ, হাফেজ আলি খাঁ প্রমুখ মাত্র দু'চার জন সত্যকার স্রষ্টা বিদ্যমান। বাকি সব ওস্তাদদের মধ্যে আছে বেশির ভাগ মুদ্রাদোষের অতিচার, তানালাপের ব্যভিচার ও শান্ত সমাহিতির একান্ত অভাব। আমার এ-ধারণা যে ভুল নয় একথা পরে আমাকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও

বলেছিলেন। কথাটা শোকাবহ হ'লেও অপ্রতিবাদ্য। সমগ্র ভারত ঘুরে আমার এ-বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা আজ মুমূর্ষু। অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারে না এ-সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। তবে এ-সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে লিখব।

* * *

আমেদাবাদে আমি ছিলাম এক ধনী বণিকের অতিথি। সংসারে বড়মানুষদের জাতই আলাদা—সাধারণের এ-ধারণাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। তবে আমার গুজরাতী আশ্রয়দাতা এ-সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই বলব। তাঁর মধ্যে সত্যকার অমায়িকতা, ধনের আড়ম্বর জাহির করার অনিচ্ছা, অনুগত সকলের প্রতিই সদয় ব্যবহার—সর্বোপরি মনের সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা—আমাকে বাস্তবিকই গভীর তৃপ্তি দিয়েছিল। তাঁর আর একটি গুণ আমার মন টানত: তিনি সত্যই বহুজ্ঞ—নানাদেশেরই খবর রাখেন। তাঁর মনোরম অট্টালিকার মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল তিনটি জিনিষ: প্রথম, তাঁর সুরম্য বাগান, দ্বিতীয়, তাঁর সন্তরণ-হর্ম্য (swimming pool) ও তৃতীয়, তাঁর পুস্তকাগার।

তাঁর সাঁতার দেবার ঘরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ২।১ দিন অন্তর পরিষ্কার জলে পূর্ণ করা হ'ত। তাতে তিনি তাঁর ছোট ছোট পুত্র কন্যা নিয়ে যখন একত্রে নেমে সাঁতার দিতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে যোগদান করাটা ভারি উপভোগ্য ছিল। তাঁর প্রকাণ্ড বাগানটিও ছিল অতি মনোরম। তাঁর সুরুচির এখানে একটা মস্ত সার্থকতা মিলেছিল। অর্থব্যয় যদি সুরুচির দিকে দৃষ্টি রেখে করা যায়, তবে তার মধ্যে বোধ হয় সে-ব্যয়ের অনেকটা সার্থকতা মেলে।

যাহোক তাঁর সঙ্গে মহাত্মাজীর জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করা

গেল। সেখানে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মুখেই একটা আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। তবে গুজরাতী শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছে করে অত্যন্ত কুশ্রী বেশ পরিধান করতেন। সেটা আমার ভাল লাগত না। বেশভূষার মধ্যে সরলতার সঙ্গে সুশ্রী ও মার্জিত রুচির সমাহারই যে কাম্য এ-কথা অস্বীকার করবার আগ্রহে লাভ হয় কার? ব্যক্তির না জাতির? মহাত্মাজীর দারিদ্র্যবরণ তাঁকেই সাজে। সাধারণের পক্ষে দারিদ্র্য বা অপরিচ্ছন্নতা শোভনও নয়, শুভও নয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Renaissance in India-য়ই এসম্বন্ধে বলেছেন চরম কথা: "It is a great error to suppose that spirituality flourishes best in an impoverished soil."

* * *

আমেদাবাদ থেকে উধাও হলাম—সোজা কাথিওয়াড়-ভাওনগর। সেখানে ফের এক গুজরাতী বন্ধুর আতিথ্যে নগর দর্শনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা গেল। তবে সেখানে আমার সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল (১) গোবিন্দ রাও পাণ্ডের গান, (২) বৃদ্ধ রহিম খাঁর সেতার ও (৩) কাথিওয়াড়ের বিখ্যাত বাই চন্দ্রপ্রভার তানালাপ শ্রবণ।

গোবিন্দরাও পাণ্ডে একজন গুণী লোক। তবে সংসারে এক শ্রেণীর গুণী আছেন, যাঁরা ভাল গাইলেও কেমন যেন কোথাওই কলকে পান না। পাণ্ডেজী সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। বেশ গান করেন—জানেন শোনেন, তাললয় শুদ্ধ, কণ্ঠস্বরও অমিষ্ট নয়; অথচ এঁকে বিধাতা কোথায় যে মেরে রেখেছেন ঠাউরে পাওয়া যায় না। তবে ভেবেচিন্তে মনে হ'ল—হয়ত পাণ্ডেজীর সঙ্গীতে অসাফল্যের একটা প্রধান কারণ তাঁর ব্যক্তিরূপের অভাব। সঙ্গীতশিল্পে বোধ হয় ব্যক্তিরূপের প্রভাব অন্য অনেক শিল্পীর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কারণ, গানের মধ্যে দিয়ে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব একটু বেশি প্রত্যক্ষভাবেই আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে। অভিনয় শিল্পের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। ভালই অভিনয় হচ্ছে—অথচ ব্যক্তিত্বের দীপ্তি নেই ব'লে কিছুই

শ্রোতাকে স্পর্শ করতে পারছে না—এ রকম দৃষ্টান্ত অভিনয়-জগতে বিরল নয়। যাই হোক, পাণ্ডেজীর গান-বাজনায় অনুরাগ অদ্ভুত। ওস্তাদদের কত গাঁজা সেজে দিয়ে, কত পদসেবা করে—কত অসাধ্য সাধন ক'রে যে ইনি গান শিখেছেন, সে সব কাহিনী শুনলে মনটা আর্দ্র না হ'য়েই পারে না। এঁর গান কেউ শুনতে চাইলে ইনি যেন হাতে স্বর্গ পান। অথচ এঁর গান বড় একটা কেউই শুনতে চায় না। আমি নিজে শিক্ষার্থী বলে এঁর অনেক রাগের আলাপ শুনতে ভালবাসতাম। তাতে এঁর কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না। লোকটিকে আমার ভালো লেগেছিল, অথচ ইনি লোকপ্রিয় নন—যেহেতু ইনি ছিলেন খানিকটা মেজাজী মানুষ।

রহিম খাঁর মতন উৎকৃষ্ট সেতার আমি খুব কমই শুনেছি। ইনি ভাওনগরের রাজার সভাবাদক। বয়স আশির কাছাকাছি। খাঁটি শিল্পী। তবে বিষম গল্পগুজবী। গায়কেরা অনেক সময়ে ভাবেন যে, তাঁদের নীরস শিক্ষা-কাহিনী সাধারণের কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। রহিম খাঁ সময়ে সময়ে তাঁর নিজের "ঘরানা চাল"-এর, "তরকীব"-এর (শিক্ষাপদ্ধতির), ওস্তাদির ও আর কত শত গুণের ব্যাখ্যায় তথা আর সব ওস্তাদ, ঘরানা চাল ও তরকীবের নিন্দাবাদে এমন মুখর হ'য়ে উঠতেন যে শ্রোতা গান শুনতে গিয়ে মহা বিপন্ন হ'য়ে বিপদতারণ মধুসূদনকে ডাকত। তখন ভুলিয়ে ভালিয়ে সেতারের দিকে তাঁর মনের মোড় ফেরানো ছাড়া আর গতি থাকত না। তাঁকে এ কথাটা সহজে বোঝানো যেত না যে, যন্ত্রে আলাপ করতে জানলেই কথায় সদালাপী হওয়া যায় না।

খাঁ সাহেবের গায়ক-সুলভ কোনো গুণেরই ঘাট ছিল না: যথা, নিজে ছাড়া অপর সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর গুণী, রাগাদি ও ঠাট সম্বন্ধে তাঁর ছাড়া আর সকলের মতই ভ্রান্ত, বাজানোর ভঙ্গি সম্বন্ধে এক তাঁর ছাড়া বিশ্বে আর কারুরই কিছু জানা নেই—ইত্যাদি। তাঁর মেজাজটিও ছিল নবাবসম্ভব—কেবল তিনি যেন কোন এক

দুর্বোধ্য কারণে নবাবী-যোগভ্রষ্ট হয়ে বেটক্করে পথ ভুলে "ক্রোধনানাং গেহে" জন্মগ্রহণ ক'রে ফেলেছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক্, রহিম খাঁ বাজাতেন অতি চমৎকার—মানতেই হবে। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দেই তাঁর সেতার শুনতাম। তাঁর মিড়ের হাত, প্রকাশ-ভঙ্গি দরদ সবই ছিল অপূর্ব। আহা, যদি কেবল বিধাতা তাঁর মস্তিষ্ককে একটু সুস্থ ক'রে গড়তেন!

ভাওনগরের বিখ্যাত বাই চন্দ্রপ্রভার নাম আমি দুচারজন বন্ধুর কাছে আগেই শুনেছিলাম ও পড়েছিলাম (Fox Strangways মহোদয় তাঁর "Music of Hindusthan"-এ গায়িকাটির কণ্ঠস্বরের খুবই প্রশংসা করেছেন)। তাই ভাওনগরে গিয়ে প্রথমেই এঁর খোঁজ করি। নানা সমালোচক বললেন নানা কথা—তবে একটা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল না ঃ যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের আয়তন ও ধর্মচর্চার আগ্রহের বৃদ্ধি হওয়ার দরুন তিনি ভজনপূজন তথা গোযানে-ভ্রমণ ছাড়া আজকাল আর কিছুই করেন না।

যাই হোক্, তিনি গান আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশে কোনও স্ত্রীলোকের এত খাদে গলা নামতে আমি শুনি নি। এরূপ গলাকে য়ুরোপে বলে contralto ও পাশ্চাত্য জগতে এর আদরও খুব। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের এরূপ খাদে গলা বোধ হয় খুব বেশি লোকে পছন্দ করবে না। কিন্তু তাহ'লেও তাঁর গলার জমকালো গম্ভীর আওয়াজ ও প্রায় তিন সপ্তক range একটা শোনবার জিনিষ। তবে তাঁর গানের ঢং মোটেই কোমল ঢং নয়। যাকে বলে মর্দানা ঢং। তবে এ-কৃতিত্বে বাহাদুরির দিক্ দিয়ে তাঁর লাভ যথেষ্ট হ'লেও মিষ্টত্বের দিক দিয়ে যেন লোকসানই হয়েছে মনে হ'ল। কারণ, তিনি সোহিনী, মালকোষ প্রভৃতিতে যে পরিমাণ তানবিস্তার করলেন, সে পরিমাণ রসসৃষ্টি করতে পারলেন না। মনে আছে, এই মালকোষ আলাপেই আবদুল করিম খাঁ একদিন আমাদের চোখে জল এনেছিলেন। চন্দ্রপ্রভার মধ্যে খাঁ সাহেবের সে অনুপম শিল্পীর

দরদ নেই। তাই তাঁর তানালাপ প্রায় মামুলি প্রাণহীন ওস্তাদী ঢঙের মতন হয়ে পড়েছে। জোহরা বাই গ্রামোফোনে তিন মিনিটেও শুদ্ধকল্যাণ বা ভূপালী বা যোগিয়াতে যে সুধাবর্ষণ করেছেন, তার সিকি মিষ্টত্বও চন্দ্রপ্রভা সাক্ষাতে গেয়ে সৃজন করতে পারলেন না। আমাদের দেশে বড় বড় বাইজীরা শুধু সুরে কলকণ্ঠি নন, গানেও মধুবর্ষিণী। চন্দ্রপ্রভা কৃতিত্বে অসামান্য হ'লেও রসলোকে কিন্নরী নন।

ভাওনগরে হামীর খাঁ বলে আর একজন বড় ওস্তাদের গান শোনা গেল। এঁকে টেলিগ্রাফ ক'রে কাছের কোন এক রাজার সভা থেকে আনানো হয়েছিল। তবে হামীর খাঁর চেহারাটা ছিল অনেকটা "তালপত্রের সিপাহী-খাঁর" মতন। কারণ না কি তাঁর ধূম্রবিশেষের প্রতি অত্যধিক স্নেহাসক্তি। বিধাতা কেন যে বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের ওস্তাদদের এতটা রঙিন ক'রে গড়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু কারণ যাই হোক্, "রঙের" এমন উদার ভক্ত বোধ হয় জগতে আর কোথাওই মেলে না সঙ্গীতের রাজ্যে। অর্থাৎ কোনো নেশায়ই এঁদের অরুচি নেই, কোনো নেশাড়ুর সঙ্গেই গলাগলি করতে এঁদের বাধে না।

কিন্তু এ হ'ল তাঁদের একদিকের কৃতিত্ব। মানে, ঐ সঙ্গে অন্যদিকের কথাও বলতে হবে, নৈলে অবিচার হবে। তাই বলি হামীর খাঁ ওস্তাদ বৈ কি। বিশুদ্ধ রাগের বিশুদ্ধ বিস্তারে এঁর নৈপুণ্য প্রশংসনীয় মানতেই হবে। গানের মধ্যে যাঁরা প্রাণকে অবান্তর মনে করেন, শুধু রাগচর্চায়ই যাঁদের মন ময়ূরের মত নেচে ওঠে হামীর খাঁ তাঁদের কাছে আনন্দময় বরেণ্য বিগ্রহ।

ভাওনগর থেকে বরোদায় প্রয়াণ। সেখানকার সেরা ওস্তাদ বিখ্যাত ফৈয়স খাঁ। দুদিন তাঁর গান শোনা গেল। খেয়ালে তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য হলেও আবদুল করিমের খেয়াল শোনবার পরে তাঁর খেয়াল মেটে লাগল। কিন্তু তাঁর ঠুংরি শুনে মুগ্ধ হয়েছি। সুরে কী দরদ! কী সূক্ষ্ম কারুকলা! কী ছন্দবিশারদ! কিন্তু আশ্চর্য এই যে

এঁর গলা সুরেলা হলেও তেমন মিষ্ট নয়। শুনলাম একসময়ে তাঁর গলা অপূর্ব মিষ্ট ছিল—আজকাল মিষ্টত্ব ক'মে গেছে নানা কারণে। তবে সে-ইতিহাস ঐতিহাসিকের এলাকায় পড়ে, সঙ্গীত রসিকের নয়।

* * * *

বরোদায় তসদ্দুক হোসেন ব'লে আর এক ওস্তাদের গান শুনলাম। গলাটি তীক্ষ্ণ, দরদ নেই বললেই হয়। কাজেই আমার হোসেন খাঁর গান তেমন ভালো লাগেনি। মন বাহবা দিয়েছে কিন্তু হৃদয় গলে নি।

জমালুদ্দীন খাঁ কাতর কণ্ঠে বললেন যে তাঁর জ্বরে খিন্ন অবস্থা। কাজেই তাঁর বীণা শোনা হ'ল না।

বরোদায় এক ভারতীয় ব্যাণ্ড আছে। সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল ফ্রেডেলিস্ (Fredelis) সাহেব একদিন এ ব্যাণ্ড শোনাতে নিয়ে গেলেন। বরোদার এক প্রকাণ্ড বাগানে বাজনা হ'ল। অনেক রকম যন্ত্রীই এল; একতানবাদ্য শ্রুতিমধুরও লাগল। মনে হ'ল, এ দিক্ দিয়ে আমাদের যন্ত্র-সঙ্গীতের একটা নূতন বিকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে তার অধ্যক্ষ একজন বিদেশী হ'লে চলবে না। শুধু আমাদের দেশেরই কোনও উদারপন্থী, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রতিভাবান্ লোকের সৃষ্টিনৈপুণ্যেই এ দুরূহ চেষ্টা সফল হ'তে পারে। কারণ এ-কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না যে বিদেশীরা আমাদের শিল্প সম্বন্ধে হয় ত অনেক নূতন আলো দিতে পারে, শিল্প সম্বন্ধে নূতন তথ্যও জ্ঞাপন করতে পারে; কিন্তু পারে না সুরসৃষ্টি করতে আমাদের বিশিষ্ট ধারা বজায় রেখে। তাই আমাদের শিল্প সম্বন্ধে বিদেশী সমজদারের মতামত আমরা মন দিয়ে শুনতে পারি, তা থেকে লাভও করতে পারি বৈকি, পারি না কেবল—তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের শিল্প-জগতে সুরসুষমার রসসৃষ্টি করতে।

বরোদার শ্রেষ্ঠ বাইজির নাম ইদনজান। এঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট বটে, কিন্তু এঁর তান মিষ্ট নয় মোটেই। তাছাড়া ইনি তার সপ্তকের সা-কে

বিষম ভালোবাসেন। অনবরত চড়া পর্দায় স্থিতি হ'লে গানের সৌষ্ঠব নষ্ট হয়, গান হ'য়ে দাঁড়ায় একঘেয়ে।

* *

১৯২৪-এর ডিসেম্বর মাসে লখ্‌নৌয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। সব জড়িয়ে পাঁচ দিন এ-সঙ্গীত স্রোত উচ্ছল হ'য়ে সবাইকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। কী ভাবে সংক্ষেপে বলব আমার নানা মন্তব্য সমেত।

প্রথম দিন বরোদা ব্যাণ্ড "গৌড় সারঙ্গে" উদ্বোধন সঙ্গীত আরম্ভ করল। বরোদায় এ ব্যাণ্ডের উদ্যোক্তা সেখানকার সঙ্গীত-কলেজের অধ্যক্ষ Fredelis সাহেব। ইনি রুষ ইহুদী। লোকটি আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বুঝলেও, শুনে শুনে একটু গুণগ্রাহী হ'য়ে পড়েছে। ব্যাণ্ডটি মন্দ তৈরি করেনি। ব্যাণ্ডের বাদকগণ মাঝে মাঝে একা একা আলাপ ক'রে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে সব বাদকগণই বাজান। সময়ে সময়ে ভারি মধুর শোনায়। আমি বরোদায় গত বৎসর এ-ব্যাণ্ড শুনেছিলাম তখন এতটা ভালো লাগেনি। এবার ভালো লাগবার কারণ, এর মধ্যে সত্যিই একটা বিশেষত্ব ছিল। ব্যাণ্ডের মধ্যে এস্রাজ, সেতার, সারঙ্গী, নানা রকমের বাঁশি, জলতরঙ্গ সবই ছিল। তবলা তো ছিলই। সকলেই বেশ গুণী দেখা গেল। তবে সবচেয়ে ভাল বাজালেন জলতরঙ্গ-বাদক বৃদ্ধ আমীর খাঁ। তিনি অনেক সময়ে একাই জমিয়ে দিতেন।

তারপর বাজালেন রামপুরের ফিদা হোসেন। যন্ত্র স্বরোদ। এ-সুন্দর যন্ত্রটি মুসলমানরা সৃষ্টি করেছিল—হিন্দু রবাব থেকে। আওয়াজ সেতারের বা বীণার চেয়ে জোর যদিও বীণা বা সুরবাহারের মতন মিষ্ট নয়। তবে গৎ প্রভৃতি স্বরোদে যেমন বাজে এমন অন্য কোনও যন্ত্রে বাজে না। ফিদা হোসেন রামপুরের নবাবের সভাবাদক। গুণী লোক। প্রথম দিন কাফি ও পিলু বাজালেন। চমৎকার গৎ তাঁর। যেমন দরদ, তেমনি ভঙ্গী ও তেমনি দক্ষতা। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ—তাঁর

মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাবাভিব্যক্তি—expression। সঙ্গীতের অনেকখানি সৌন্দর্য নির্ভর করে শুদ্ধ মুদ্রার উপর। অর্থাৎ শিল্পী যে-ভাব সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলতে চান তাঁর মুখ ও অবয়বের প্রকাশ্যভঙ্গির কর্তব্য সেই ভাবটির সহায়ক হওয়া। এতে যে আলাপ-ব্যঞ্জনার কতখানি সৌষ্ঠব বাড়ে তা' যিনিই ফিদা হোসেনের বাজনা শুনেছেন তিনিই জানেন। ফিদা হোসেন বাজাতে বাজাতে মণ্ডলাকারে পরিক্রমণ করেন—ভারি সুদৃশ্য। যন্ত্রটিকে সুন্দর বঙ্কিমভাবে ধরেন যেন স্নেহপুত্তলী! আর শুধু অঙ্কস্থ করাই নয়—আদর করা। বাস্তবিক ফিদা হোসেন একজন সত্যিকার শিল্পী। স্বরোদে এমন সুন্দর মিষ্ট হাত ও ভাবব্যঞ্জনা বেশি শুনি নি।

ফিদা হোসেনের সঙ্গে সেদিন তবলা বাজিয়েছিলেন বিখ্যাত আবেদ হোসেন। এঁর মত আশ্চর্য তবলাবাদক ভারতে একান্ত বিরল। এঁর হাত যেমন পরিষ্কার, বোলের বৈচিত্র্যে যেমন অধিকার, সঙ্গীতের ক্ষমতাও তেমনি চমৎকার। এঁর বাজনা যেদিন প্রথম শুনেছিলাম সেদিন আমার বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। তবলাকে নিয়ে যে এভাবে ছিনিমিনি খেলা যায় কে জানত? গুণী বটে! বাদকের কত ছন্দের মূর্ছনা যে তিনি তবলার বোলে প্রতিধ্বনিত করতেন—মনে হ'ত যেন স্বরোদের সুরের ফুলঝুরি প্রতিফলিত হচ্ছে তবলার আয়নায়!

* * *

সেদিন—অর্থাৎ ৯ই জানুয়ারি—রাত নটায় মাইহার-এর বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর অপূর্ব ব্যাণ্ড বাজিয়ে ছিলেন। সতের আঠারো জন অনাথ বালককে শিখিয়ে পড়িয়ে আলাউদ্দীন খাঁ মাইহার রাজার সভায় এই ব্যাণ্ডটি গ'ড়ে তোলেন। আমাকে তিনি বললেন যে ৫।৭-টি অনাথা বালিকাকেও তিনি এই ব্যাণ্ডের জন্যে গ'ড়ে তুলেছেন, তবে এ-সম্মেলনের হাঙ্গামে তাদের সঙ্গে আনেন নি। তাদের মধ্যে নাকি পিয়ানোও বাজায় এমন মেয়ে আছে। লক্ষ্ণৌয়ের ব্যাণ্ডে পিয়ানো

বাজে নি ; তবে যা' বেজেছিল তাতেই আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। চার পাঁচ জন বালক সেতার বাজালো, তিনজন বাঁশি, একজন বেহালা, দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশু তবলা, একজন Violencello ও একটা ৭।৮ বৎসরের বালক জলতরঙ্গের ঢঙে নানা সুরের ছোটবড় লোহার নল বাজিয়েছিল Xylophone। এ-নলগুলি একটা কাঠের বাক্সের ওপর শুইয়ে রাখা হয়। এর আওয়াজ ও বাজনার পদ্ধতি জলতরঙ্গের চেয়ে সতেজ, পরিষ্কার ও সুশ্রাব্য। এ বালকটির বাজনার দক্ষতা অদ্ভুত। সমস্ত ব্যাণ্ডের ধরতে গেলে সে একরকম প্রাণ বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আলাউদ্দীন খাঁ নিজে বেহালা বাজিয়ে ব্যাণ্ডটির পরিচালনা করেছিলেন।

ব্যাণ্ডটির বাজনা যে সভায় কী মধুর সুরসম্পাতের ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছিল এবং সমজদার তথা অসমজদারকে যুগপৎ মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিল আধঘণ্টারো উপর—ভাষায় সে-বর্ণনা অসম্ভব। কারণ এ-ব্যাণ্ডে যা শোনা গেল তার ঢং ঠিক স্বদেশীও নয় বিলিতিও নয়, অথচ তাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। একটি নিটোল সৃষ্টি! ওস্তাদ বা বিজ্ঞতম সমজদার সম্প্রদায় হয়ত এরূপ সৃষ্টির মাধুর্য ও মহিমার মূল্যায়ন করতে পারবেন না ; কে না জানে—নূতনত্ব সহজে পুরাতনপন্থীদের কাছে আমল পায় না ? কিন্তু সুখের বিষয় যে, জীবনের ধর্ম শুধু এই গতানুগতিকতার খাঁজেই গড়িয়ে চলা নয়, সে সময়ে সময়ে সানন্দে অনন্যসাধারণ প্রতিভারও আজ্ঞাবহ হ'য়ে থাকে। অভিনবত্বের বিরুদ্ধে পুরাতনপন্থীরা সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে আসছে ; কিন্তু পরাভবও স্বীকার না ক'রে পারে না। এ-দুঃখময় সত্যটি মরুভূমির মাঝে সরোবরের মতনই চমকপ্রদ বৈ কি।

আলাউদ্দীন খাঁকে একজন মহাপ্রতিভাধর গুণী বলতেই হবে। বেহালায় তাঁর নৈপুণ্য অসামান্য। স্বরোদেও হাত তাঁর অতি তৈরি—বিশেষতঃ জলদ বাজনায়। তার উপর তিনি সেতার, সুরবাহার, তবলা, কর্ণেট, বাঁশি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত রকম বাজনাতেই নিপুণ। এ রকম

প্রতিভা য়ুরোপে জন্মগ্রহণ ক'রলে দেশ দেশান্তর থেকে লোক দেখতে আসতো ;—যেমন ভিক্টের হিউগোর পরিচ্ছেদের একটি প্রান্ত স্পর্শ করতে আসত তীর্থযাত্রীরা। তবে দুঃখ এই যে, আমাদের দেশের শিল্পকলায় প্রবুদ্ধ লোকমত গ'ড়ে না ওঠার দরুণ সঙ্গীতাদি ললিতকলায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার দাম দিতে লোকে জানেও না, শেখেও নি। তা' ছাড়া আর একটা কথা আছে।

সঙ্গীতবর্গাদি তুচ্ছ শিল্পকলা নিয়ে মাথা ঘামানোও আমরা পণ্ডশ্রম মনে করি। কাজেই আলাউদ্দীন কলকাতায় এলেন, কিন্তু কোনও উৎসাহ না পেয়ে বাংলার বাইরে মাইহার রাজসরকারে চাকরি নিতে বাধ্য হ'লেন। বাঙালী বাংলার বাইরে যাবে না এমন কথা আমি বলি না, বা আলাউদ্দীনকে বাঙালীর গৌরব হিসেবেও দেখতে চাই না, এমন কি ভারতের গৌরব হিসেবেও না—তাঁকে বলা চলে—শিল্প-জগতের গৌরব। আমি কলকাতার মতন সহরে তাঁর অনাদরের কথা উল্লেখ করছি শুধু সঙ্গীত-কলার প্রতি আমাদের শিক্ষিত, অপিচ অভিজাত সমাজের নিহিত অবজ্ঞার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। অথচ ভেবে দেখলে দেখা যায় যে যদি মানুষের হৃদয়ের সৌরকুমার্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হয়, যদি মানুষকেসভ্য ব'লে পরিচয় দিতে হয়, তাহলে সুন্দরকে ভাল না বাসলেই নয়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর National Value of Art-এ দেখিয়েছেন আমামাদের নীতিবোধ-বিকাশের উপর সুন্দরের প্রভাব কত বেশি। তিনি নানা দিক থেকে বিচার ক'রে দেখিয়েছেন যে যা অসুন্দর অশোভন তার প্রতি আমাদের প্রকৃতির একটা মূলগত ঘৃণা আছে—যার উল্টোপিঠে আছে সুন্দরের প্রতি আমাদের স্বভাবজ টান। এই দুয়ে মিলে গ'ড়ে উঠেছে নীতির বহু সূত্র। কথাটা যে অনস্বীকার্য সত্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে একটা কথা এ সম্পর্কে ভোলা চলে না ও সেটা এই যে, সুন্দরকে ভালবাসব ব'লে কোমর বেঁধে দাঁড়ালেই তখনি তখনি সুন্দরের প্রতি প্রীতি হৃদয়ে গজায় না—এ প্রেমের বিকাশ অন্য

সব বিকাশের মতই সাধনাসাপেক্ষ। বস্তুতঃ সব কিছুর মতন সৌন্দর্য্যের মর্মজ্ঞ হ'তে হ'লে চেতনার খানিকটা বিবর্তন—ইভল্যুশন—হওয়া চাইই চাই। মনে পড়ে মাইকেল এঞ্জেলোর সুযোগ্য পিতার পুত্রকে প্রহার করা: "কি! তুই শিল্পী হ'তে চাস। আমাদের মত কুলীন পরিবারে শিল্প? ধিক্!"

* * * *

আলাউদ্দীন খাঁর দাদা অফাতার উদ্দীন খাঁও একজন মস্ত গুণী। এক পরিবারে এ রকম দুজন প্রথম শ্রেণীর গুণী বড় দেখতে পাওয়া যায় না। আফতাব উদ্দীনের মতন বংশীবাদক বোধ হয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নেই। মান্দ্রাজী গুণী সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি অবশ্য দক্ষতায় অদ্ভুত। কিন্তু দক্ষতা বা কার্‌দানী দেখানো এক ও যথার্থ কলাকারু আর। কোথায় গুণপনা যে মহিমময় হ'য়ে ওঠে সে পরিচয় বড় সুন্দর পাওয়া যায় সঞ্জীব রাওয়ের সঙ্গে আফতাব উদ্দীনের বাঁশীবাদকের তুলনা করলে। এবং এই রকম ক্ষেত্রেই বেশি করে মনে হয় যে স্রষ্টা শিল্পী বিধাতার কাছে থেকেই সৃষ্টির সনন্দ নিয়ে আসেন—তাঁকে তৈরি করা যায় না। আফতাব উদ্দীন কারুর কাছে শেখেন নি। কিন্তু কি অপূর্ব তাঁর বাঁশি!

তার পরে সেদিন রামপুরের ধ্রুপদী নাজির খাঁ আড়ানা ও হিন্দোল গাইলেন। গানটি মন্দ নয়—কর্ত্তব্‌ও বেশ সুসম্পন্ন। তবে কল্পনার কোনও মহত্ত্বই ছিল না। শ্রীযুক্ত ভাতখণ্ডে এঁর সুখ্যাতি করেছিলেন—কিন্তু আমি অনেকটা নিরাশই হয়েছিলাম বলতে হবে। এখানে একটা কথা বলা দমকার মনে করছি। ভাতখণ্ডে প্রমুখ সত্যকার সমজদারের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে এঁরা সঙ্গীতে রাগ-তাল শুদ্ধ ও তানালাপ বাট প্রভৃতির আঙ্গিক সুসম্পূর্ণতা পেলেই খুশি—তার বেশি কিছু চান না—যেন সেটা উপরি—পেলে ভালো কিন্তু না পেলে

মন খারাপ করার দরকার নেই। “গানের সঙ্গে নাইকো প্রাণ যার তাহার সেই গান গানই নয়”—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন একথা, তিনি শিল্পে হৃদয়ের দানের মর্যাদা দিতে শিখেছিলেন ব’লে। ওস্তাদ পন্থীরা সচরাচর এ-মর্যাদা দিতে নারাজ একথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতনই অকাট্য। একথার ভাষ্য হ’ল এই যে নাজির খাঁর গান শুনতে নানা সভায়ই ওস্তাদিপন্থীরা ভিড় করে উদ্‌গ্রীব হয়ে আসবেন কিন্তু মাদৃশ সঙ্গীতরসিকরা তাঁর ছায়াও মাড়াবেন না—যদিও চন্দ্রশেখর ব’লে একটি বালকের গান শুনতে আমি কাশী থেকে এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। এ বালকটিকে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে অনেক ক’রে গাইয়েছিলাম। তবে সে কথা যথাস্থানে।

যা’ বল্‌ছিলাম—এই নিছক classicism জিনিষটার ভক্ত হ’তে বোধ হয় আমরা একেবারেই পারি না ও পারবও না। তাই আল্লাবন্দে খাঁর গান আমার ভাল লাগেনি, অথচ ভাতখণ্ডে প্রমুখ সমাজদারেরা তাঁর বিষম ভক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু আমাদের সঙ্গীতের নয়, যে-কোনও সঙ্গীতের প্রাণ বিরাজ করে—সঙ্গীতকারের সেটা অনুভব করার মধ্যে। এ কথা আমি অনেকবার বলেছি। তবে আরও অনেকবার বলার দরকার আছে ব’লেই আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাবন্দে, নাজির খাঁ প্রমুখ সাড়ে পনের আনা ওস্তাদ যে আজকের দিনে নিষ্প্রাণ গতানুগতিক তানালাপ “বাকায়দা” হ’লেই উচ্ছ্বসিত হ’য়ে ওঠেন, এইখানেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ। গানে তানালাপ চাই নিশ্চয়ই কিন্তু প্রাণহীন তানালাপ নয়—একঘেয়ে মূর্ছনায় অনবদ্য পুনরাবৃত্তি নয়—এককথায় যে-সুরসম্পাতে হৃদয় সাড়া দেয় না সে সুরালাপ নয়। গানে দরদ না থাকলে তা’ আমাদের আশ্চর্য বা স্তম্ভিত করতে পারে বটে কিন্তু মোহিত করতে পারে না। গানের নিহিত মহিমা যে তার ভাবের উপর নির্ভর করে এই শাদা কথাটি নিছক ওস্তাদিপন্থীরা প্রায়ই ভুলে যান। উদাহরণতঃ—অতি মর্মস্পর্শী মিষ্ট গানে এঁরা সাড়া দেন না;

অথচ সুরের ক্লান্তিকর মল্লযুদ্ধে এঁদের (অন্তরের আনন্দের কথা জানি না, কিন্তু) বাইরে খুবই বাহবা দিতে শুনেছি—সে বাহবার সদর্থ যাই হোক। বিশ্বাস করা শক্ত যে এ-ধরনের সমাপ্তিহীন একঘেয়ে তানে ওস্তাদিপন্থীরও মনে সত্যিই পুলক-শিহরণ জাগে। আমার মনে হয় এ বাহবার সদর্থ শুধু নিছক ওস্তাদিকে স্বীকার করা মাত্র। অথচ ফল হয়েছে এই যে গানের প্রাণটি কোথায় সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শেষটা সে বস্তুটির অস্তিত্বও এঁরা ভুলে বসে আছেন। কে না জানে—আমাদের হৃদয়ের অনেক সদ্‌গুণই অনুশীলন অভাবে অনেক সময়ে শুকিয়ে যায় ?

আমার এ-কথার আর একটা জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ মিলল যখন এঁর সবাই মিলে হৈ হৈ ক'রে রামপুরের মুস্তাক হোসেনকে মেডেল দিলেন। এঁর কর্তব্‌ অসাধারণ, গলার কাজ আশ্চর্য ও সুর চড়ে নামে বোধ হয় তিন সপ্তক। কিন্তু এঁর গান এতই কুশ্রী অঙ্গভঙ্গী-দোষদুষ্ট ও প্রাণহীন (অবশ্য লম্ফঝম্পাদি রূপ প্রাণের কথা বল্‌ছি না, সুরের মধ্যে দরদ-রূপ প্রাণের কথা বলছি) যে তাঁকে মেডেল দেওয়াটা আমার কাছে সমর্থনযোগ্য বলে' মনে হয়নি। অবশ্য দয়াপরবশ হ'য়ে দরিদ্র গায়ককে মেডেল দেওয়া হয় হোক, কিন্তু নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের তরফ থেকে মেডেল দেওয়ার একটা মস্ত দায়িত্ব আছে। মুড়ি মিছরির একদর হ'লে লোকসান হয় মুড়িরই কে না জানে ? আলাউদ্দীনকেও রৌপ্য পদক দেওয়া হ'য়েছিল, মুস্তাক হোসেনকেও তাই। অথচ এ দু'জনের মধ্যে কী আকাশ পাতাল প্রভেদ! একজন স্রষ্টা শিল্পী ও যন্ত্রে কবি আর একজন নিছক ওস্তাদ, ও কণ্ঠে পালোয়ান মাত্র। সেই সব দেখে শুনেই আমার মনে হয় লক্ষ্ণৌ-এর বিচারকগণের সঙ্গে আমাদের মতামতেই একটা মস্ত ব্যবধান থাকবেই।

সেদিন মুস্তাক হোসেন মালকোষ, বেহাগ ও তেলেনা গেয়েছিলেন। ঠাকুর নবাব আলি তাঁর মল্লযুদ্ধে বাহবা-মুখর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু

আমাদের কাছে তো অসহ্য মনে হচ্ছিল। এখানে আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার। যে গানের ভাব সুন্দর তার আনুষঙ্গিক ভঙ্গি তথা মুদ্রাও সুন্দর না হ'লে ভাব বজায় রাখা অসম্ভব। মুস্তাক হোসেনের সেদিনকার লম্ফঝম্প, চক্ষু বিস্ফারণ, বদন ব্যাদান, ভূমিলুণ্ঠন, ভূয়ঃ চীৎকার ও হস্তোৎক্ষেপকে কোনও ভারতীয় সঙ্গীতানভিজ্ঞ ভিষক্‌রাজের পক্ষে ধনুষ্টঙ্কারের নিদান স্বরূপ গণ্য করাও বোধ হয় অসম্ভব ছিল না। লক্ষ্ণৌয়ের একজন সঙ্গীতজ্ঞ কাশ্মীরী ভদ্রলোক তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে বলেছিলেন যে সঙ্গীত নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব রকমের মহৎ ব্যাপার, যেহেতু এতে নেই কি?— আতস বাজি আছে, ভুঁইপট্‌কা আছে—এমন কি ছুছুন্দর বাজিও বাদ পড়ে নি।

* * *

সেদিন বিকেলে ৪টের সময়ে পাতিয়ালার প্রসিদ্ধ মম্মন খাঁ স্বরসাগর বাজালেন। স্বরসাগর যন্ত্রটি সেতার ও সারঙ্গী মিশিয়ে তৈরি করা। মাঝে মাঝে আঙুলে ক'রে সেতারের ঢঙে বাজানো হয়, ঝঙ্কারও দেওয়া হয়। তবে বেশির ভাগ সময়ে ছড় দিয়ে সারঙ্গীটিই বাজানো হয়। ফলে অবশ্য যন্ত্রটি সারঙ্গীর চেয়ে বেশি উপভোগ্য হ'য়েছিল সন্দেহ নেই। তবে তার প্রধান কারণ—শিল্পী ছিলেত স্বয়ং মম্মন খাঁ। বৃদ্ধ হলেও তাঁর অঙ্গুলি চালনা এখনও অসামান্য। তিনি শ্রী ও ভীমপলশ্রীতে সে যে কী মধুবর্ষণ করলেন লিখে বোঝানো যায় না। এখানে মম্মন খাঁর ছড়ের কায়দা সম্বন্ধে দু'একটা কথা না ব'লেই পারছি না। তিনি ছড়ের এক টানেই ২ মাত্রা, ৩ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৭ মাত্রার ঝোঁক পর পর এমন পরিষ্কার দেখান যে অবাক হ'তে হয়। য়ুরোপে ছড়-চালানোকে অভিজ্ঞরা একটা মস্ত আর্ট ব'লে মনে করেন। তাই মনে হয়েছিল তাঁরা বোধ হয় এ অদ্ভুত ছড়-প্রয়োগ

দেখলে আমাদের চেয়ে বেশি আশ্চর্য হ'তেন। মম্মন খাঁ স্বরসাগরে সময়ে সময়ে "একহাতেই" নানা তারগুলি বাজিয়ে যেতেন—যে ভাবে সাধারণ লোকে "দু'হাতে" বাজায়। সে-কৃতিত্বও প্রশংসনীয় বৈকি। তবে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী এসবে নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন রাগের বিকাশে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে। ম্যাথিউ আর্নল্ড্ লিখেছেন যে, শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্মজ্ঞ হ'তে হ'লে একটি উপায় সকলেরই কাজে আসতে পারে: অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিদের সেরা কবিতার পদগুলি নমুনা হিসেবে বরণ ক'রে ক্রমাগত চাখতে হবে—তাহ'লেই কোন্ কবিতা সাঁচ্চা আর কোন্‌টি ঝুটো—সে-অনুশীলিত স্বাদের কষ্টিপাথরে ধরা পড়বেই পড়বে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাই। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কি তা বুঝতে হ'লে আলাউদ্দীন, আবদুল করিম, চৌবে, ফৈয়াস খাঁ, মন্মোহর লাল, ফিদা হোসেন, শেষণ, উজীর খাঁ, জয়পুরের গহর বাই, মম্মন খাঁ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকেই কষ্টিপাথর হিসাবে ধ'রে নিলে বোঝা সহজ হবে যে কোন্‌টা সত্য আর্ট আর কোন্‌টা লম্ফঝম্প। মম্মন খাঁর সারঙ্গী শুনতে শুনতে আমার মনে সে পুরাতন আক্ষেপ নূতন ক'রে উদয় হয়েছিল যে, হায়! এমন সুন্দর যন্ত্রও আজ কিনা ওস্তাদ ও সমজদার-দের দ্বারা অবজ্ঞাত! যে জাতি যন্ত্ররাজ্যে বীণা, স্বরোদ, সুরবাহার ও সারঙ্গীর সৃষ্টি করেছে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবশ্য সময়ে সময়ে আশা না হয়েই পারে না; কিন্তু যখন আবার দেখি সঙ্গীতের মিষ্টত্বে অভিজ্ঞদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বা সারঙ্গীর বিরুদ্ধে ওস্তাদের অবজ্ঞা, তখন মনে সন্দেহ হয় বুঝি বা আমরা সঙ্গীতের চরম দান যে মধুরতা এ সরল সত্যটির প্রতি উড়ো তর্ক ও পাণ্ডিত্যাভিমানের আঁধিতে অন্ধ হ'য়ে ব'সে আছি।

* * *

১০ই জানুয়ারী বৈকালে মম্মন খাঁর "সুরসাগর" বাজানোর পর মথুরার বিখ্যাত চন্দন চৌবে গান গেয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির

সভাপতি ঠাকুর নবাবালি আমাকে বলেছিলেন যে চন্দন চৌবের ধ্রুপদ তিনি আল্লাবন্দে খাঁরও চেয়েও উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করেন। বিখ্যাত সমালোচক ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মহোদয়ও আমাকে ঐ কথাই বলেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে চন্দন চৌবে আল্লাবন্দের মতন "আলাপী" নন্ বটে কিন্তু ধ্রুপদ গানে তাঁর চেয়ে বড়। আমি ইতিপূর্বে লিখেছি (Forward, 8th February) যে চন্দন চৌবে আল্লাবন্দে খাঁর চেয়ে বড় গায়ক এ কথা আমি নিজে একটা মস্ত কথা বলে মনে করি না। যেহেতু আল্লাবন্দে খাঁর গান যে শিল্পের দিক দিয়ে বড় নয়, শুধু ওস্তাদির দিক দিয়েই আশ্চর্য্য একথা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু সে যাক, বলি চৌবেজির গানের কথা।

প্রথম দিন চন্দন চৌবে একটি পুরবী ও একটি গৌরি গাইলেন। তবে সেদিন তাঁর গান তত জমে নি—যদিও তাঁর চমৎকার কণ্ঠস্বর ও মনোহর মিড় আমার খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু ১৪ই জানুয়ারি রাত্রে যখন চন্দন চৌবে একটি বেহাগ গাইলেন তখন আমরা সকলে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। কথাটা এই যে ধ্রুপদ সঙ্গীত খেয়ালের জনয়িতা হ'লেও সঙ্গীতরাজ্যে সৃষ্টি হিসেবে খেয়াল ধ্রুপদের চেয়ে বড় একথা বলা চলে। অবশ্য একথা মানতেই হবে যে ধ্রুপদের মধ্যে এমন গুটিকতক গুণ আছে যা, খেয়ালের মধ্যে মেলে না। কিন্তু তবু বলব—সব জড়িয়ে সঙ্গীতরাজ্যে খেয়ালের বিকাশ ধ্রুপদের চেয়ে মহত্তর। কেন মহত্তর সে সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ ক'রে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা যাবে—আজ কেবল মোটামুটি এইটুকু ব'লেই থামি যে, খেয়ালে যে তানালাপের স্বাধীনতা আছে, তালের বাঁধাধরা গঠনের দাবী হ'তে যে মুক্তি মেলে, কল্পনার রাশ ছেড়ে দেওয়ার যে সুযোগ পাওয়া যায় ধ্রুপদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

তবু এক আবদুল করিমের ছাড়া আর কোনও খেয়ালীর খেয়ালই

আমাকে আজ অবধি চন্দন চৌবের পদের চেয়ে বেশি আনন্দ দেয় নি। তবে এর প্রধান কারণ এই যে, চন্দন চৌবের ধ্রুপদ একরকম খেয়ালই হয়ে পড়েছে। ভাতখণ্ডেও আমাকে বলেছিলেন যে চন্দন চৌবের ঢঙে ধ্রুপদ গাইতে তিনি কাউকে শোনেন নি, তাঁর গানের ঢঙটি একেবারে তাঁর নিজস্ব ও অনন্যতন্ত্র। মন্তব্যটি চিন্তনীয়। পরে অনেকবার চন্দন চৌবের কাছে গান শুনে ও পরিশেষে মথুরায় তার শিষ্য হয়ে আমি পূর্বোক্ত সত্যটি আবিষ্কার করি যে চন্দন চৌবে ধ্রুপদ ও খেয়াল মিশিয়ে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঢঙের সৃষ্টি করছেন, যেমন করেছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর খেয়াল ও টপ্পা মিশিয়ে। চন্দন চৌবের ধ্রুপদ এত মিষ্টও এইজন্য যে তাঁর গান হচ্ছে বস্তুতঃ খেয়াল—কেবল সে খেয়ালকে তিনি ধ্রুপদের মুখোশ পরিয়েছেন মাত্র। এর একটা প্রধান প্রমাণ এই যে তাঁর ধ্রুপদ পাখোয়াজের সঙ্গেও যেমন শোনায়, তবলার সঙ্গেও তেমনি শোনায়, যেটা খাঁটি ধ্রুপদের ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেন না খাঁটি ধ্রুপদের তাল বাঁধাধরা কাঠামোর মধ্যে থাকতে বাধ্য ও তার সৌন্দর্যের অনেকটা নির্ভর করে পাখোয়াজের জলদ-গম্ভীর আওয়াজের ওপর। চন্দন চৌবের ধ্রুপদ তা নয়। তিনি হাতে তাল দিয়েও গান না, তাঁর গানের পঠন-পদ্ধতির মধ্যে ধ্রুপদ-সুলভ সমান্তরালে ঝোঁকও নেই। গমক আছে বটে কিন্তু মিড়ই তাঁর প্রধান সম্পদ—অপূর্ব মিড়! বস্তুতঃ তার মনোহারী সঙ্গীতের প্রাণই হচ্ছে—তাঁর ভাব ও মিড়ের সম্পদ। তার ওপর তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর বৃদ্ধ বয়স সত্বেও (চৌবেজীর বয়স ৬০ হবে) অতি মধুর। আজকালকার ওস্তাদদের মধ্যে এরূপ মধুর কণ্ঠ অত্যন্ত বিরল। তাঁর গানে ত্রুটি যে নেই তা নয়। প্রধান ত্রুটি এই যে, তাঁর গলা বেশি চড়ে না—অথচ তিনি নিরন্তর অত্যন্ত বেশিদূর চড়াতে যান। এতে তাঁকে এত কষ্ট করতে হয় যে দেখতেও কষ্ট। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর Purpose of Art বলে একটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে ঠিকই লিখেছেন যে গুণী শ্রোতার মনে কষ্ট বা সহানুভূতির

উদ্রেক করলে সেটা তার উপভোগের পক্ষে বাধাই হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া চৌবেজীর গলা—বোধ হয় এই অত্যধিক উঁচু পর্দায় গাওয়ার দরুণই—একটু ভাঙা-ভাঙা। কিন্তু এ দুটি ত্রুটি সত্বেও চৌবেজী যে একজন মস্ত শিল্পী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ তিনি যা গান তা' অনুভব করেন—কাজেই সে অনুভূতি জাগাতেও পারেন। "He best can paint them who shall feel them most," কথাটি সব শিল্প সম্বন্ধেই একটি চরম কথা। আমাদের অধিকাংশ ওস্তাদদের দোষ হয় এই যে তাঁরা যা গান সেটা অনুভব করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। এতে ফল হয় এই যে তাঁদের গান প্রায়ই সুরের দুরূহ বিন্যাসসাধনায় পর্যবসিত হয় যে-বিন্যাস রচনায় হৃদয়ের তাপের চেয়ে বুদ্ধির আঁচও বেশি মেলে। অবশ্য বুদ্ধির দান একেবারেই না থাকলেও উচ্চসঙ্গীত গড়ে ওঠে না মানি—সেকথা আমি বলেছি ইতিপূর্বে (Modern Review, May, 1924)—কিন্তু বুদ্ধির আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াবেগের আবেদনও চাই—কেন না এ-আবেদন বিনা গান হ'য়ে ওঠে সায়েন্স—আর্ট থাকে না আর। প্রতি আর্টের চরম বিকাশেই এই দুটি আবেদনের একটি সহজ সমন্বয় হ'য়ে থাকে। বুদ্ধিকে উস্কে দেওয়া ও হৃদয়কে আর্দ্র করা। উজীর খাঁ, চন্দন চৌবে, গহর বাই, ফৈয়াস খাঁ, আবদুল করিম, জানকী বাই, শেষণ, আলাউদ্দীন, ফিদা হোসেন, সম্মোহনলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর গান। বাজনা শুনলে একথা উপলব্ধি করা সহজ হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ চন্দন চৌবের গানের মধ্যে এই emotional আবেদন অনন্যসাধারণভাবে পরিস্ফুট। কী আশ্চর্য্য তাঁর খাঁটি সুরের স্থায়িত্ব, কী সুন্দর তাঁর দুরূহতম গমক, কী মনোহর তাঁর সুমিষ্ট খোলা স্বর, কী প্রাণস্পর্শী তাঁর মিড় ও সর্বোপরি কী ভাবব্যঞ্জক তাঁর গানের সময়ে মুখের ভাব!

চন্দন চৌবের ভাব ভঙ্গী এতই সুন্দর যে সে সম্বন্ধে দু' একটা কথা না লিখেই থাকতে পাচ্ছি না। তাঁর ভাব ভঙ্গীকে মুদ্রাদোষ না বলে

মুদ্রাগুণ বল্লেই ঠিক হয়। আমি অনেকবার বলেছি যে গায়কের শুদ্ধ মুদ্রা (correct expression) অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক (Caruso) বলেছেন যে গাইতে হবে শুধু গলা দিয়ে নয়—প্রতি অঙ্গ দিয়ে। এখানে প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে তবে আমি আমাদের ওস্তাদদের দোষ দেই কেন—যখন উক্ত বাণীটির প্রশস্ততা সম্বন্ধে তারা এত কায়মনোবাক্যে সচেতন ? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে তারা সর্বাঙ্গ দিয়ে গায় বটে, কিন্তু তারা "যেভাবে" সর্বাঙ্গ দিয়ে গায় "সেভাবে" গাওয়াটা বোধ হয় স্বর্গীয় Caruso মহোদয়ের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি যদি আজ হঠাৎ কবর হতে উঠে এসে দেখতেন ভারতীয় ওস্তাদরা কী ভাবে তাঁর বিধানকে মেনে নিয়েছে গুরুবাক্য ব'লে তাহলে খুব সম্ভব সেই বিখ্যাত ভিখারীর মতনই কপাল চাপড়ে বলতেন : "উল্‌টা বুঝিলি রাম!" (ভিখারী চলতে না পেরে রামের কাছে প্রার্থনা করেছিলে একটি ঘোড়া। রাম তার প্রার্থনায় আর্দ্র হ'য়ে এক ধোপাকে পাঠান—ধোপার গাধার হঠাৎ অসুখ হওয়ায় ধোপা তাকে চাপিয়ে দেয় ভিখারির কাঁধে— "ব'য়ে নিয়ে চল্—চলতেই হবে।")

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে চন্দন চৌবে তাঁকে 'উল্টো বোঝেননি'। তাই তাঁর মুখের বা অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিটি তাঁর গানের প্রতিকূল না হ'য়ে সহায়কই হ'ত। একথা চন্দন চৌবের অনুপম সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগীই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন।

* * *

সেদিন (১০ই জানুয়ারী) রাত্রি ন'টার সময় গান আরম্ভ করলেন —পণ্ডিত ভাতখণ্ডের তরুণ শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর। রতনজনকর গুজরাতী যুবক, বয়স ২২।২৩ বৎসর হবে। এঁর গান অতি সুন্দর। ইনি খেয়াল শিখেছিলেন বম্বেতে ভাতখণ্ডের কাছে ও তান কর্তব্ শিখেছিলেন বরোদায় ফৈয়াস খাঁর কাছে। এঁর খেয়ালের ঢঙ অতি

উৎকৃষ্ট ও এঁর রাগরাগিণী ভাতখণ্ডের কাছে শেখা ব'লে অতি বিশুদ্ধ, একথা বলাই বেশি। এঁর গান শুনে আমার ভাতখণ্ডের সঙ্গীত-শিক্ষাপদ্ধতির উপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল! ভাতখণ্ডে বম্বেতে আমাকে বলেছিলেন যে, রতনজনকরকে তিনি ৪০০।৫০০ খেয়াল শিখিয়েছিলেন। তারপর বরোদায় গাইকবারকে ব'লে সেখানে বিখ্যাত ফৈয়াস খাঁর কাছে তানালাপ শিখতে পাঠান।

রতনজনকরের রাগের বিকাশ দেখাবার পদ্ধতি সত্যই উচ্চাঙ্গের। তার উপর তিনি শিক্ষিত হওয়ার দরুণ তাঁর গানে ওস্তাদসুলভ মুদ্রাদোষ বা লম্ফঝম্প ছিল না। গানের প্রাণটি কোথায় তিনি জানতেন। আমি একাধিকবার বলেছি যে সঙ্গীতে গুণীর ব্যক্তিত্বের নানান সৌকুমার্য না ফুটে উঠেই পারে না, একথাটা ওস্তাদিপন্থীরা যেন অনেক সময়েই ঠিক উপলব্ধি করেন না। কারণ তাঁরা ভাবেন যে ভালো গাইতে হ'লে বুঝি শুধু কায়দাদুরস্ত হ'লেই হয়; শুধু রাগরাগিণীর অনবদ্য জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট; শুধু তান লয় নিখুঁত হ'লেই হ'য়ে গেল। কিন্তু অন্যান্য ললিত কলার ম'ত সঙ্গীতেও যে আমাদের নানান দিকে সৌন্দর্যানুভূতি ফুটে না উঠেই পারে না, এ সত্যটির প্রতি তাঁরা বড় বেশি উদাসীন। অনেকের মুখে প্রায়ই আক্ষেপ শোনা যায় যে, যে-ওস্তাদটি চলে গেল তেমনটি আর কখনও জন্মাবে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের সঙ্গীতের নব প্রগতি আরম্ভ হ'য়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গীত সৌন্দর্যের বিকাশে অতীত সঙ্গীতের চেয়েও মহিমময় হ'য়ে উঠবে। আমার এ বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই যে প্রতি যুগেরই একটি ধর্ম আছে যার গতি কেউই রোধ করতে পারে না। এ-যুগের ধর্ম হবে শিক্ষিত সুকুমারমতি নরনারীর মধ্যে সঙ্গীতানুরাগ ব্যাপ্ত হওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদি-সঙ্গীতের বিকাশে তাঁদের সহযোগিতা তথা সাধনার ফলে আমাদের রাগসঙ্গীতের মধ্যে নব প্রাণ সঞ্চার, নবপ্রতিভার নির্দেশে। একথা বলছি ওস্তাদদের ওস্তাদিকে ছোট করতে নয়। কারা খাঁটি

ওস্তাদ তথা ওস্তাদির কাছে আমাদের ঋণ যে অশেষ একথা প্রতি সঙ্গীতরসিকই মানবেন সকৃতজ্ঞে। তাঁরা এযাবৎ আমাদের সঙ্গীতের চর্চা ক'রে এসেছেন ব'লেই আমাদের সঙ্গীতের বাগানে আগাছা জন্মালেও আজো ফুলের দেখা মেলে এখানে ওখানে। অন্যভাষায়, আজকের, দিনে বেশির ভাগ ওস্তাদই অ-শিল্পী হ'লেও কতিপয় ওস্তাদ এখনো জীবিত যাঁরা গানের ফসল ফলাতে পারেন তাঁদের সহজে প্রতিভার আলো হাওয়ায়। কিন্তু তা সত্বেও বলব—সুকুমারমতি শিক্ষিত নরনারীর সাধনায় তথা প্রেরণায় আমাদের ওস্তাদি সঙ্গীত যে আরো প্রাণবন্ত, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'য়ে উঠবে একথা আরো বেশি ক'রে মনে হয় রতনজনকর প্রমুখ শিক্ষিত যুবকের গান শুনলে। অন্তত সেদিন ওস্তাদদের পরে রতনজনকরের গানে বহু শ্রোতাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলাবলি করেছিলেন—এ-প্রতিভাধরের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। রতনজনকরের একমাত্র ত্রুটি—তাঁর কণ্ঠস্বর একটু চেরা, গোল ও উদাত্ত নয় এবং তাঁর স্বর অমিষ্ট না হ'লেও আহা-মরি নয়। তিনি যদি কেবল এ-মিষ্টত্ব বাড়াবার দিতে একটু দৃষ্টি রাখেন তা' হ'লে তাঁর মতন সুগায়ক আমাদের দেশে মেলা ভার হবে।

সেদিন শেষ বাজালেন বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ। ইতিপূর্বে তিনি বাজিয়েছিলেন স্বরোদ। সেদিন বাজালেন বেহালা—চমৎকার! কিন্তু তাঁর স্বরোদই সবচেয়ে উপভোগ্য। কী তাঁর রাগরাগিণীর উপর কর্তৃত্ব! কী তাঁর অবলীলাক্রমে বাজানর ভঙ্গি! যখন দুরূহতম সুর নিয়ে তিনি আলাপ করতেন, তখনও মনে হ'ত যেন সে তাঁর কাছে ছেলেখেলা। বিলম্বিত লয়ে, চিকারির কাজে, দ্রুত লয়ে, আড়ি কুয়াড়ির চালে—সব তাতেই তাঁর নৈপুণ্য নিজেকে এমন স্বচ্ছন্দে জানান দিত যে মন প্রাণে আনন্দ উঠত হিল্লোলিত হ'য়ে। তাঁর একমাত্র ত্রুটি এই যে তিনি দ্রুত লয়েই বেশি বাজাতেন—বোধ হয় তাঁর জলদ লয়ের বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখানোর জন্য; কিন্তু যে মুহূর্তে শিল্পীর উদ্দেশ্য হয় আত্মপ্রকাশ নয়, শ্রোতাকে চমকে-দেওয়া সে মুহূর্তে তিনি

কমবেশি ভ্রষ্ট না হয়েই পারেন না। এইখানে হয়ত ফিদা হোসেন তাঁর চেয়ে উপরে উঠেছিলেন, যদিও সব জড়িয়ে বাদক হিসেবে আলাউদ্দীন অনেক বড়।

তাঁর সঙ্গে স্বরোদে সঙ্গত করেছিলেন বিখ্যাত আবেদ হোসেন। তিনি আমাকে পরদিন বলেছিলেন যে আবেদ ক্রমাগতই তাঁর লয়কে জলদের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। বললেন: "আমারও ত রক্তমাংসের শরীর, তাই শেষটায় আমিও রুখে উঠলাম: আচ্ছা, দেখা যাক্ কত জলদ্ তুমি করতে পারো।" ফলে সেদিন হ'ল এই যে আলাউদ্দীন ক্রমশঃ এমন বিদ্যুদ্বেগে জলদ লয়ে পৌঁছুলেন যে আবেদ সেই লয়ে শুদ্ধ ঠেকা দিতেই গলদ্‌ঘর্ম-কলেবর হয়ে উঠলেন। আর একটু জলদ করলেই যেন তাঁকে ইস্তফা দিতে হ'ত মনে হ'ল। এমন সময় ঠাকুর নবাবালি আলাউদ্দীনকে সামলাতে তাঁকে জনান্তিকে বললেন যে গান বাজনায় এ-ধরণের দ্বৈরথে রসের হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। তখন আলাউদ্দীন নিরস্ত হলেন। কথাটা সত্য। তবলার সঙ্গে গুণীর এইরূপ রেষারেষিতে শেষটা প্রত্যেকের লক্ষ্য হয়—অপরকে নাজেহাল করা, নিজের প্রাণের রং সুরের তুলিতে ফুটিয়ে তোলা নয়। এ-ক্রোধণ প্রবৃত্তি রসলোকে প্রশস্ত নয় একথা বলাই বেশি। গান বাজনায় অসহযোগিতার স্থান নেই; গায়ক ও বাদক পরস্পরের সহযোগিতা না করলে গানের হয় রাতারাতি কৈবল্যলাভ। দ্বিতীয় দিন যখন আলাউদ্দীনের বেহালার সঙ্গে কাশীর বিখ্যাত বীরু মিশ্র সঙ্গত করছিলেন তখন এই সত্যটি যেন contrast-এ আরো বেশি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেদিন এ-প্রখ্যাত শিল্পিযুগলের প্রীতিপ্রসন্ন সঙ্গতে যে-নিখুঁৎ রসটি ফুটে উঠেছিল তাকে বলা যায় একটি নিটোল সুষমার সুসমঞ্জস রসাবেশ। বাজাতে বাজাতে তাঁদের পরস্পরের দিকে চেয়ে সেই স্নিগ্ধ তৃপ্ত হাসি—সে ভুলবার নয়।

সেদিন আর একজন মস্ত বড় গুণী সেতার বাজিয়েছিলেন। ইনি

বিখ্যাত ৺এম্‌দাদ খাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ। এম্‌দাদ খাঁ গ্রামোফোনে একটি জৌনপুরী তোড়ি বাজিয়েছেন। গ্রামোফোনে এ জৌনপুরী তোড়িটির চেয়ে ভাল যন্ত্রসঙ্গীত আমি শুনি নি। এনায়েৎ খাঁর বাজনা শুনে মনে হ'ল শিল্পী-পিতার যোগ্য পুত্র বটে। লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে যত সেতারী এসেছিলেন তার মধ্যে এনায়েৎ খাঁই সবচেয়ে ভালো বাজিয়েছিলেন। এনায়েৎ খাঁ স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। এনায়েৎ খাঁর বাজনার মধ্যে যে জিনিষটি ছিল সেই জিনিষটিই হচ্ছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আসল বস্তু, অর্থাৎ সুন্দরের আন্তর ধ্যান। এক ভাওনগরের বৃদ্ধ রহিম খাঁ ছাড়া—(যার কথা আমি ইতিপূর্বে লিখেছি)—আমি এনায়েৎ খাঁর মতন হৃদয়স্পর্শী সেতার কখনও শুনেছি ব'লে মনে হয় না। আলাউদ্দীনের সেতার আমি অনেকদিন আগে একবার মাত্র শুনেছিলাম, তবে সে কথা স্মরণ নেই ব'লে আমি এ দুজনের মধ্যে তুলনা করতে পারি না।) যেমন তাঁর প্রকাশভঙ্গী, তেমনি তাঁর দরদ, তেমনি তাঁর মর্মস্পর্শী মিড় ও তেমনি তাঁর গভীর অনুভূতি। এনায়েৎ খাঁ লক্ষ্ণৌয়ে প্রধানতঃ ঠুংরিই বাজিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঠুংরি বাজনা যে খেয়ালের চেয়ে বিশেষ হীন ছিল না একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। এনায়েৎ খাঁ বড় রাগের আলাপ করেন নি—প্রথমদিন একবার মাত্র একটি ইমনকল্যাণ আলাপ ছাড়া—কিন্তু কাফি, পিলু, খাম্বাজ প্রভৃতি যে সব ঠুংরির রাগের আলাপ করেছিলেন তাতে আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন ও তাতে মনে হচ্ছিল ঠুংরিই তাঁর প্রাণের জিনিষ। এনায়েৎ খাঁর ঠুংরি গৎ ও মিড় প্রভৃতির মধুর স্পর্শে আমারও প্রথম দিনই এই কথাই মনে হয়েছিল। এনায়েৎ খাঁর একমাত্র দোষ—বাজাবার সময় মুখ নিচু করে থাকতেন ও মুখে তাঁর কোনো ভাব ফুটত না।

* * *

পরদিন (১১ই জানুয়ারি) রবিবার সকাল বেলা একটি বালক দু'টি গান গেয়েছিল। এই বালকটির গান সম্বন্ধে আমি দু'চারটি

কথা বল্‌তে চাই, যদিও আমি জানি যে আমি এ সম্পর্কে যা বল্‌ব তার সঙ্গে অধিকাংশ ওস্তাদেরই মতে মিলবে না।

এ-বালকটির বয়স ১০-১২ বৎসর। নাম চন্দ্রশেখর, কোনও বিশিষ্ট পদস্থ আচারী ব্রাহ্মণ বংশীয়। এর মাতুল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ যোশী একে প্রায় শতাধিক শুদ্ধ রাগ শিখিয়েছেন। তিনি এলাহাবাদে থাকেন ও নিজে গান না করলেও গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তার ওপর তিনি রীতিমত শিক্ষিত, সুশিক্ষিত, ভদ্রবংশীয় বিশেষজ্ঞ মাতুলের কাছে চন্দ্রশেখর প্রায় আদর্শ শিক্ষা পাচ্ছে বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

চন্দ্রশেখরের প্রতিভা সত্যিই অনন্যসাধারণ। বৎসর দুই আগে ও মাত্র তিন মাসে বাহাত্তরটি ধ্রুপদ শিখেছিল—বললেন সত্যানন্দ। বিখ্যাত জর্মন সুরকার (composer) মোৎসার্ট (Mozart) শিশুকালেই আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুইজর্লণ্ডে তথা হাঙ্গেরিতে দুটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আমি অদ্ভুত পিয়ানো বাজাতে শুনেছিলাম। এরূপ শিশুকে বলে prodigy। আমাদের দেশেও শিশুদের মধ্যে সময়ে সময়ে অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভার দর্শন মেলে। ভাগলপুরের উকীল ৺উপেন্দ্রনাথ বাকৃচী মহোদয়ের এক পৌত্রীকে ৬ বৎসর বয়সে ধামারে ধ্রুপদ গাইতে শুনেছিলাম। মাষ্টার মদনের অবিসংবাদিত প্রতিভা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আমেদাবাদে এক ব্যবসায়ীর চার বৎসর বয়স্ক পুত্রের মুখে দুরূহ রাগের আলাপ শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম। এই লক্ষ্ণৌ সম্মেলনেই আর একটি বালক prodigy এসেছিল, যার কথা যথাস্থানে লিখব। কিন্তু আমি আমাদের দেশের কোনও শিশু প্রতিভার গান শুনে' তত মুগ্ধ হইনি যত মুগ্ধ হয়েছিলাম বালক চন্দ্রশেখরের গান শুনে। আমি একবার কাশী থেকে প্রয়াগে গিয়েছিলাম শুধু এর গান শুনতে।

চন্দ্রশেখরের গান শুনলে একটা কথা মনে না হয়েই পারে না: যে, উচ্চসঙ্গীতে সুকণ্ঠের যথেষ্ট মূল্য আমরা সচরাচর দিই না। যদি

দিতাম তাহ'লে চন্দ্রশেখরকে লক্ষ্ণৌয়ের আসরে গান করতে দেওয়া হ'ত আরো বেশিক্ষণ ও বেশি বার। হয়েছে কি আমাদের ওস্তাদি-পন্থীরা গানে সুকণ্ঠের আবেদনে সাড়া দেন না তার কারণ গানে তাঁরা সব আগে চান সুরতানরে কুস্তিকস্‌রৎ। সুকণ্ঠ যদি মেলে তবে সে উপরি—অর্থাৎ না হ'লেও চলে যদি সুর তালকে নিয়ে যথেষ্ট ছিনি-মিনি খেলা হয়—এইই তাঁদের মনের কথা। কিন্তু হ'লে হবে কি? —সেদিন ওস্তাদদের নীরস অকলকণ্ঠ তানের চরকিবাজির পর চন্দ্র-শেখর একটি তুলসীদাসী ভজন ("ভজ মন রামচরণ সুখদায়ী") গেয়ে এমন মধুবর্ষণ করল যে তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণপদক পুরস্কার পেল। ওস্তাদিপন্থীদের মুখ চুন।

* * *

অতঃপর পণ্ডিত মন্মোহনলাল সুরবাহারে ভীমপলশ্রী বাজালেন। এঁর কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। হিন্দুদের মধ্যে এবার যে কয়জন সঙ্গীতে নাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মন্মোহনলালের স্থান অতি উচ্চে। ইনি ঢোলপুরের রাজার সভাবাদক। সেতার সুরবাহার দুই-ই বাজান। সেতারে এনায়েৎ খাঁর কাছে ইনি দাঁড়াতেই পারেন না, কিন্তু সুরবাহারে এঁর আলাপের হাত অপূর্ব। এরকম মিষ্ট ও মনোজ্ঞ সুরবাহার আমি কখনও শুনি নি। কী এঁর মিড়! কী এঁর দরদ! কী এঁর রেশের ক্ষমতা! কী এঁর বাজানোর ভঙ্গী! শরদের চেয়ে সুরবাহার আলাপের পক্ষে উপযোগী। এক বীণা ছাড়া যে আলাপে সুরবাহারের সঙ্গে কোনও যন্ত্রেরই তুলনা হ'তে পারে না, একথা যেন মন্মোহনলালের বাজনা শুনে আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম। এঁর জৌনপুরী, কানাড়া, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি সব শ্রেষ্ঠ রাগের আলাপেই এঁর শিল্পীমনের গরীয়ান্‌ সমাহিত ভাবটি ফুটে উঠত। তবে একটা কথা শুনে দুঃখ হ'ল। শুনলাম ইনি নাকি ঢোলপুরের রাজার ওখানে ২০৲ মাত্র মাহিনা পান। আর য়ুরোপে?

য়ুরোপে অনুরূপ দরের গায়ক বা বাদক সত্যই envy of kings. তাই আমি Patronage of Music প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে উচ্চ-সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষকতার ভার আভিজাত্যের হাত থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের হাতে না এলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। য়ুরোপে যে উচ্চ শিল্পী আজ পূজিত সেটা আভিজাত্যের কৃপাবলে নয়, সেটা প্রবুদ্ধ মধ্যবিত্তের গুণগ্রাহিতার ফলে। আমরা প্রায়ই গৌরব করি আমাদের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে; বলি—য়ুরোপ বস্তু-তান্ত্রিক। কিন্তু যে-দেশে মন্মোহনলালের মতন অপরূপ শিল্পীর আদর নেই সে-দেশ কোন মুখে য়ুরোপকে বস্তুতান্ত্রিক ব'লে আত্মপ্রসন্ন হ'তে চায়?

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার বিখ্যাত ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় গেয়েছিলেন। বাংলার নাম এক ইনিই রেখেছিলেন। এঁর মৃত্যুতে বাংলা আজ মুকুটহীন হ'য়েছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। এঁর পাণ্ডিত্য ও বিনয় দেখে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমাকে বলেছিলেন "I love him." প্রথমদিন গোঁসাইজিকে তিনি বলেছিলেন যে তিনি গোঁসাইজির শিষ্য হ'য়ে তাঁর কাছ থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ শিখে নেবেন—স্বরলিপি ক'রে প্রকাশ করার জন্য। গোঁসাইজির আকস্মিক মৃত্যুতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের আক্ষেপের বোধ করি অবধি থাকবে না। কারণ তিনি গুণী বলে গোঁসাইজির গুণ বুঝেছিলেন। গোঁসাইজির বিশুদ্ধ নায়কী ও মুদরী কানাড়া গানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, ঠাকুর নবাবালি প্রমুখ বোদ্ধারা স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন শিক্ষিত ওস্তাদ ছিলেন বটে। গোঁসাইজিকে ভাতখণ্ডে অতি উচ্চ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। গোঁসাইজির সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখার এ স্থান নয়। তাই আজ আমি এইটুকু মাত্র ব'লেই ক্ষান্ত হব যে গোঁসাইজির

মৃত্যুতে শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হ'ল সে ক্ষতি শীঘ্র পূর্ণ হবার নয়।

* * *

সেদিন শেষ গাইলেন বিখ্যাত সঙ্গীতরত্নাকর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আল্লাবন্দে খাঁ ও তাঁর পুত্র নাসির উদ্দীন খাঁ। আল্লাবন্দে খাঁর গান আমি আমেদাবাদে শুনেছিলাম ও ইতিপূর্ব্বে তাঁর গানের আমি নিন্দাই করেছি। এত বড় ওস্তাদের নিন্দা করতে সঙ্কোচ হয় ব'লে একটু বলব কেন তাঁর গানের প্রশংসা করতে পারি নি।

গোড়ায়ই বলে রাখা ভাল আল্লাবন্দে খাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি যে সচেতন নই তা' নয়। তাঁর বিশুদ্ধ সুর, মনোজ্ঞ মিড় ও অসাধারণ কণ্ঠসাধনা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর গান শুধু এক দোষে সঙ্গীত হিসেবে ছোট হয়ে গেছে: তার মধ্যে আর্টের অভাব ও লম্ফঝম্পের প্রাদুর্ভাব বড়ই বেশি। অর্থাৎ তিনি গান করেন শুধু নিজের কৃতিত্ব দেখাতে, আত্মপ্রকাশ করতে নয়। এইটেই ললিত-কলায় কলাকারুর বা আর্টের বোধহয় সবচেয়ে বড় পরিপন্থী। আল্লাবন্দে খাঁর গান শুনতে শুনতে আমার বারবার মনে এই আক্ষেপ হ'য়েছে যে শুধু একটা মিথ্যা আদর্শের ফেরে পড়ে মানুষের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কতই না সোজা! আমাদের সঙ্গীতে আল্লাবন্দে খাঁর ধ্রুপদের উচ্চসঙ্গীত বলে' গণ্য হ'বার বা প্রথম পদক পাবার মূল—এই মিথ্যা আদর্শের প্রচার ও প্রবুদ্ধ লোকমত গড়ে' না ওঠা। যেদিন আমাদের দেশে শিক্ষিত ও প্রবুদ্ধ লোকমত গ'ড়ে উঠ্‌বে সেদিন থেকে এরূপ সুরের পালোয়ানকে ছেড়ে আমরা ফৈয়াস খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, চন্দন চৌবে প্রভৃতি সুরের শিল্পীকেই অভিনন্দন করতে শিখব। তা' ছাড়া এ-সম্পর্কে নামের একটা মোহমন্ত্র আছে যাতে বিদ্রোহী মনের উদ্যত ফণাও অনেক সময় শান্ত হ'য়ে পড়ে। যেমন গাইছেন কে?—না সঙ্গীতরত্নাকর আল্লাবন্দে খাঁ। গাইছেন কি?—না খাণ্ডারবাণী

ধ্রুপদ। ও বাবা! তবে ত অবস্থা সঙ্গিন বলতে হবে! এরূপ মনের ত্রস্ত অবস্থা যে সঙ্গীতের আদর্শ-নির্ণয়ের অনুকূল নয় একথা বোধ হয় বলাই বেশি।

আল্লাবন্দে খাঁ আলাপী। অর্থাৎ ইনি গান বড় একটা করেন না, করেন—গানের আলাপ। ৺গোঁসাইজির আলাপ শুনেছি, আবদুল করিমের আলাপচারীও শুনেছি, আবার আল্লাবন্দে খাঁর আলাপও শুনলাম। গোঁসাইজি ও করিম সাহেবের আলাপের মধ্যে রস কষ আছে, কিন্তু খাঁ সাহেবের আলাপে আছে কেবল শিরঃ সঞ্চালনের তিরস্কার, লম্ফ ঝম্পের অতিচার, মুদ্রাদোষের ভীতিসঞ্চার ও গমকের ধমক। হয়ত তাঁর মধ্যে আরও কিছু গুণ আছে ব'লে আমি এরূপ ভাবে তাঁর সঙ্গীতের পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করছি। কিন্তু আমি সত্যের খাতিরে কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, এ গানের মধ্যে গুণ যাই থাকুক, আদর্শের চ্যুতি এত বেশি ছিল যে এরূপ সঙ্গীত সে সঙ্গীতরূপে গণ্য হ'তে পারে না যার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে ব'লে গেছে—"গানাৎ পরতরং নহি।"

তাই এর মধ্যে যদি নিঃসংশয় গুণও কিছু থাকে তবে সে গুণ যে এত ত্রুটির আগাছায় বাড়তে পারেনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্যই আমি ইতিপূর্বে আল্লাবন্দে খাঁর গান সম্বন্ধে বলেছিলাম যে এঁর চালের গান ভারত হ'তে আজ প্রায় লুপ্ত হ'তে বসলেও তা'তে আক্ষেপের বিশেষ কিছু নেই।

* * *

সেদিন (অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী) আল্লাবন্দে খাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্র সঙ্গীতরত্ন নাসির উদ্দীন খাঁ গেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন বেহাগ ও হিন্দোল আলাপে তিনি সর্বদা তাঁর পূজ্যপাদ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন ব'লে তাঁর গান আমাদের মনের উপর বিশেষ কোনও ছাপ

অঙ্কিত করতে পারে নি। কেবল এইটুকু মাত্র বোঝা গিয়েছিল যে তাঁর কণ্ঠস্বর মনোহর ও বিশুদ্ধ সুরের উপর কর্তৃত্ব অসামান্য।

নাসির উদ্দীন কিন্তু আমাদের তার পরদিন সকালে হিন্দোল, আশাবরী ও ভৈরবী গেয়ে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। গুণী বটে! কী তাঁর বিশুদ্ধ সুরের অচঞ্চল স্থায়িত্ব! কী চমৎকার এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় সঞ্চরণ করার ক্ষমতা! সর্বোপরি, কী অপূর্ব মিড়! এক চন্দন চৌবে ছাড়া এমন চমৎকার মিড় আমি শুনি নি। তা'ছাড়া আশাবরীতে পর পর কোমল ও অতিকোমল সুরে তিনি যেরূপ নিষ্পলক ভাবে স্থায়ী হচ্ছিলেন সেটা বাস্তবিকই আমাদের মনে পুলক সঞ্চার করছিল। তবে আমার বরাবরই ধারণা ছিল যে, যে রাগে কোনও কোমল পর্দার ব্যবহার হয় সেই রাগে তার অতি কোমল পর্দার ব্যবহার করা দস্তুর নয়। নাসির উদ্দীন কিন্তু পর পর এরূপ দুই পর্দাই ব্যবহার করেন, যথা আশাবরীতে তিনি পর পর কোমল রে-র পরেই অতিকোমল রে গাইলেন, কোমল ধা-র পরে অতিকোমল ধা। এতে রাগ রাগভ্রষ্ট হয় কিনা ওস্তাদ ধুরন্ধররাই বলতে পারেন, আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি সঙ্গীতরসিকের তরফ থেকে যে কোমল অতিকোমলের এ-ধরনের চুলচেরা বিচারকে এভাবে জাহির করার মধ্যে থাকে শুধু বুদ্ধির বিশ্লেষণের আনন্দ—নিজেকে হারিয়ে ফেলার বা সুরের আবেশে বিহ্বল হওয়ার তৃপ্তি নয়। আর খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সাধনা সাপেক্ষ ব'লে নাসির উদ্দীন খাঁর সেদিনকার নিক্তির-ওজন-করা বিশুদ্ধ সুরের স্থায়িত্ব এক বিশেষজ্ঞের কাছেই তৃপ্তিদায়ক হ'য়েছিল। অবিশেষজ্ঞের কাছে সে গানের আবেদন বড়ই হীনপ্রভ ছিল। যাই হোক যে গুণী বিশুদ্ধ সুরকে এমন আয়ত্ত করতে পারেন তাঁর কৃতিত্বের সুখ্যাতি মন খুলেই করা দরকার।

তবে নাসির উদ্দীন খাঁকে আমি শিল্পী হিসাবে ফৈয়াস খাঁ ও চন্দন চৌবের সমান বলে মনে করিতে পারি না। তার প্রধান কারণ তাঁর pedantry বা অহমিকা প্রায়শঃই অসহ্য ছিল। আমি বারবার

বলেছি উচ্চতম শ্রেণীর গানের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে তার উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ, আত্ম-জাহির নয়। নাসির উদ্দীন খাঁ বেশির ভাগ সময়েই চেষ্টা করতেন তাঁর সুরের দখল দেখাতে। অর্থাৎ তিনি যেন সর্বদাই ইঙ্গিত করতেন—সুরকে দেখো না, আমাকে দেখ। তা'ছাড়া তাঁর গমক ছিল দুঃসহ। তাঁর হৃৎস্তম্ভনকারী, রক্তজমাটকর গমকের প্রাচুর্য সময়ে সময়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলত। যার মিড় এত হৃদয়স্পর্শী সে প্রাণস্পর্শী মিড় ব্যবহার না ক'রে ধনুষ্টঙ্কারী গমকের এত ভক্ত কেন এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদয় হ'তে পারে। একথার উত্তর খুব কঠিন নয় অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি তাঁর পিতৃপদাঙ্কানুসারী মাত্র।

কথা উঠতে পারে তবে কি এই একাগ্রচিত্ত সাধনার দাম কিছুই নেই যার ফলে আমাদের এই সব অমানুষিক গমক, হৃৎস্তম্ভনকারী সুরের পালোয়ানির বিকাশ সম্ভব হয়েছে? উত্তর এই যে গানবাজনার মধ্যে যতটুকু সত্যকার সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ পাওয়া যায় তার দামও ততটুকু মাত্র থাকে। যদি সত্য অনুভূতির কোন বালাই-ই না থাকে তাহ'লেও এরূপ কীর্তির খানিকটা দাম অবশ্য আছে। কেবল সেটা বিশুদ্ধ intellectual ব্যাপার হয়ে পড়ে, ললিতকলা থাকে না এইমাত্র। খানিকটা ক্ষমতা থাকলে তাই নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করলে মানুষ যে জীবনের নানাদিকে দুরূহ কীর্তিকলাপ দেখিয়ে অপরকে স্তম্ভিত ক'রে দিতে পারে, এটা প্রায়ই দেখা যায়। আমি একটি বালককে দেখেছিলাম সে হাত পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যথেচ্ছভাবে এমন অদ্ভুত রকমে দু'মড়ে ফেলতে পারত যে সে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। যেন তার কোথাও অস্থি স্নায়ুর নামগন্ধও নেই। কিন্তু সেটা যেমন উচ্চ শিল্পকলা ব'লে গণ্য হ'তে পারে না,—কেবলমাত্র দুরূহ স্বর সাধনা দ্বারাও তেমনি উচ্চদরের শিল্পী হওয়া যায় না। কারণ সঙ্গীতে সহজ প্রতিভা থাকলে এবং নিরন্তর অভ্যাস করলে এরূপ দুরূহ স্বরবিন্যাসে অনেক গায়কেই কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কিন্তু শুধু অভ্যাসে শিল্পী

হওয়া যায় না। ধরুন "সা ধা রে ধা মা নি ধা গা" খুব দ্রুত গাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু বহুদিন ধ'রে চেষ্টা করলে অসাধ্য নয়। কিন্তু দুঃসাধ্য ব'লেই প্রমাণ হয় না যে এরূপ স্বরবিন্যাসকে আয়ত্ত করতে পারলেই উচ্চদরের শিল্পী হওয়া অবধারিত। অথচ চন্দন চৌবে বা আবদুল করিমের অপূর্ব দরদের সঙ্গে কেদারার "সা মা মা পা"-র মিড় শিল্পে অনুপম হয়ে ওঠে, কারণ এই শ্রেণীর গুণী এই সাদা পর্দার বিন্যাসের মধ্যেই হৃদয়ে যে-গভীর অনুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম তার তুলনা মেলা ভার। আসল কথা কে কতটা অনুভব করে। চিত্রকর ছবি আঁকেন —রঙ দিয়ে। শিল্পী ছবি আঁকেন—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে।

আসল ও নকল গানের ভিতরকার এই প্রভেদটা সেদিন যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—ফৈয়াস খাঁ। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে যত গায়ক এসেছিলেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া উচিত দুজনকে—ফৈয়াস খাঁ ও চন্দন চৌবে। এঁদের মধ্যে কে বড় বলা একটু কঠিন। তবে সব জড়িয়ে ফৈয়াস খাঁকেই বোধহয় শিল্পী হিসেবে শ্রেষ্ঠতর বলতে হয়। কারণ ফৈয়াস খাঁর গলায় মিষ্টত্ব একটু কম হ'লেও দরদ চমৎকার ও সূক্ষ্মকাজের কারুকার্য প্রায় অফুরন্ত। এঁর সম্বন্ধে আমি "ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায়" লিখেছিলাম যে খেয়ালে ইনি আবদুল করিমের অনেক নীচে হ'লেও ঠুংরিতে তাঁর চেয়ে অনেক বড়। ঠুংরিকে যাঁরা নগণ্য মনে করেন তাঁরা হয় ত একথাটা অনেকটা "damning with faint praise" রকম মনে করতে পারেন। কিন্তু ঠুংরিকে আমি উচ্চতম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অন্যতম বলে মনে করি—কাজেই একথায় ফৈয়াস খাঁকে হীন প্রতিপন্ন করতে চাই নি। সত্যই ফৈয়াস খাঁ গান গেয়ে থাকেন—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। তাঁর ঠুংরি গান আমি বরোদায় শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু সেদিন সকালে লক্ষ্ণৌয়ে তিনি যা গাইলেন তাকে ইংরাজীতে বলে surpassing oneself। শিল্পী এক গভীর প্রেরণার আলোতেই এরূপ সৌন্দর্যের দৃশ্য তৃষিত হৃদয়ের সামনে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন।

আর এ প্রেরণাও ধরা দেয়—এক সহজ শিল্পীর কাছে। চেষ্টা ক'রে এ জিনিষ হয় না। কারণ বিধাতৃদত্ত প্রতিভার উৎস যদি অন্তরে বিরাজ না করে তবে শত চেষ্টায়ও কেউ আবদুল করিম বা ফৈয়াসের মত সে অপরূপ নির্ঝরের সন্ধান পায় না। Genius is the capacity for taking infinite pains কথাটির মতন ভুল কথা জগতে কমই উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাবন্দে খাঁর প্রাণে শত চেষ্টায়ও ফৈয়াস খাঁর প্রেরণা আসবে না। যেমন রামদাস পরামাণিক শত চেষ্টায়ও রবীন্দ্রনাথের মতন কবিতা লিখতে পারবেন না। ফৈয়াস সেদিন দু'তিনটি ভৈরবী ঠুংরিতে আমাদের যে দৃশ্য দেখালেন ও যে বাণী শোনালেন সেটা এক প্রতিভারই করায়ত্ত।

ঠুংরি যে কত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত হ'তে পারে, সেদিন ফৈয়াস খাঁ তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি ঠুংরি ঠিক জানিত চালে গাননি। তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট ঢঙ্ আছে। তিনি ঠুংরিতে ধ্রুপদের গমক, খেয়ালের হলক তান, টপ্পার দানা ও ঢেউ খেলানো মিড়ের যে সমন্বয় ক'রে থাকেন তার পুলক জাগানোর ক্ষমতা যে কি অপূর্ব মনোহর, তা' না শুনলে ঠিক বোঝানো সম্ভব নয়। ফৈয়াস খাঁর ঠুংরি শুনে আমার ঠুংরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হ'য়েছিল।

* * *

৺কাশীধাম। হিন্দুর পুণ্যতম তীর্থ। মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন রেলের সাঁকোর উপর থেকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে কাশীর সেই চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন দৃশ্য উপভোগের কথা। সেদিন সে গাড়ীতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়ও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ট্রেণটি গঙ্গার ব্রিজের উপর এসে যেন কাশীর নয়নাভিরাম দৃশ্যে

আকৃষ্ট হ'য়ে গতিবেগ মন্দ ক'রে সতৃষ্ণ মন্থর গুঞ্জন আরম্ভ ক'রে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা ছেড়ে তাঁর সুন্দর রহস্য-নিমীলিত চোখে কাশীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে চিত্রার্পিতপ্রায় সানুরাগ দৃষ্টি—প্রতিবারই কাশীর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখতে মনে পড়ে।

কাশীর শ্রেষ্ঠ বীণকার বোধ হয় মিঠাইলাল। তাঁর বাজানর ঢংটি সত্যই অত্যন্ত মিষ্ট এবং মিঠাইলাল যে গুণী সে বিষয়ে সন্দেহও নেই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও যাঁদের তাঁর শিষ্য ৺রজনী রায় মহাশয়ের মনোহর বীণা শোনার সৌভাগ্য হ'য়েছে তাঁরা সম্ভবতঃ স্বীকার করবেন যে শিষ্য এ ক্ষেত্রে গুরুর চেয়ে শিল্পী হিসাবে বড় ছিলেন। তাঁদের দু'জনের বাজনা একত্র শুনলে মনে হ'ত যে ৺রজনীবাবু তাঁর শিক্ষা ও সৌকুমার্যের আলোতে গুরুর শিক্ষিত রাগরাগিণীতে এক নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃজন করতে পারতেন। আমাদের দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে রজনীবাবুর মতন সঙ্গীত-প্রাণ শিল্পীর সে-দিন এত অল্প বয়সে মৃত্যু হ'ল! অল্পজীবিত্বের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি বোধ হয় এই সব ক্ষেত্রেই বেশি ক'রে আমাদের অভিভূত ক'রে থাকে। কারণ, বেঁচে থাকলে রজনীবাবু যে পরে আমাদের বীণাসঙ্গীতে তাঁর মনোজ্ঞ সুকুমার হৃদয়টিকে অভিনবভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, একথা তাঁর বাজনা যিনিই শুনেছেন তিনিই স্বীকার করবেন।

তাঁর মধ্যে শুধু যে সুশিক্ষা, ভদ্রতা ও সঙ্গীতানুরাগ ছিল তাই নয়—তার সঙ্গে ছিল অনন্যতন্ত্র সৃষ্টিপ্রতিভা ও শিক্ষার অধ্যবসায়! আমাকে তিনি একদিন তাঁর বাড়ীতেই বীণা বাজাতে বাজাতে ব'লেছিলেন যে তাঁর দ্বারা সংসারের কোন কাজই হয় না। বীণা বাজাতে বসলে তিনি সব কাজ ভুলে যান। তাই গৃহে তাঁর অকর্মণ্য ব'লে বদ্‌নাম। সত্যই তাঁর সঙ্গীতানুরাগ ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি ৮।১০ বৎসর সেতার ও সুরবাহার সেধে তা'তে নিপুণ হ'য়ে তবে বীণা আরম্ভ ক'রেছিলেন। বেঁচে থাকলে তিনি

বাঙালীর মধ্যে একজন সেরা বীণাবাদক হতেন একথা জোর করেই বলা যায়। আরো দুঃখ এই যে তাঁর স্থান অধিকার করতে পারে এমন যন্ত্রী বাংলাদেশে মেলা ভার—বিশেষ করে বীণায়। কারণ স্বর মহিমায় বীণা অদ্বিতীয় হ'লেও তার সৃষ্টি এতই সুকুমার ও সূক্ষ্ম যে খুব কম সমাজদারই তার গুণজ্ঞ হ'তে পারেন। কাশীতে আমি অতিথি হয়েছিলাম বিখ্যাত দানবীর শ্রীশিউপ্রসাদ গুপ্তের গঙ্গাতীরবর্তী ইন্দ্রালয়ে। তিনি একদিন আসর ক'রে শোনালেন কাশীর এক খ্যাতনামা ওস্তাদের গান—রামদাস কথক। মানুষটি যেমন দাম্ভিক তেমনি অশিষ্ট। তাঁর দুঘণ্টা ধ'রে আর্তনাদের মধ্যে কেবল একটি রাগ শ্রুতিসুখকর হয়েছিল—নীলাম্বরী মল্লার। কাশীর ম্যুনিসিপালিটির চেয়ারম্যান মহাপণ্ডিত শ্রীভগবানদাস (শ্রীপ্রকাশের পিতৃদেব) সেদিন গান শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু খানিক বাদে শিরঃপীড়ার অজুহাতে স্থানত্যাগ করলেন। মন্দ লোকে সেদিন সন্দেহ করেছিল যে রামদাস প্রভুর সুরের মল্লযুদ্ধ তথা সিংহনাদী হার্মোনিয়মই পণ্ডিতজির শিঃরপীড়ার কারণ।

আমার এ-মন্তব্যটিকে অনেকে ভুল বুঝতে পারেন ব'লে আমি আজ একটু খুলেই বলব বহুদিন ধ'রে হার্মোনিয়মের সঙ্গতে গান করার ফলে হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে আমার যা যা মনে হয়েছে নানা সময়ে। তার গোড়াকার কথাটা এই যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম ও রীতিনীতিও বদ্‌লে যায়ই যায় ব'লে এ-যুগে গায়ের জোরে হার্মোনিয়মকে বরখাস্ত করলেই অধর্ম হবে। একথা অকুতোভয়েই বলছি আরো এইজন্যে যে হার্মোনিয়মের বিরুদ্ধে অনেক সঙ্গীত-কোবিদের মতামতই ধোপে টেঁকে না। কেন—বলি।

প্রথমেই ব'লে রাখি হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে যে-সব যুক্তি আমি আজ পেশ করতে যাচ্ছি আমার নিজের কাছে সে সব যুক্তি অকাট্য মনে হ'লেও হার্মোনিয়ম-বিমুখ ওস্তাদিপন্থীরা সেসব যুক্তিকে খণ্ডন করতে চাইবেনই চাইবেন পাল্‌টা যুক্তি দিয়ে—যার ফলে বিজ্ঞ

ইদানীন্তনেরা হয়ত বলবেন স্তর্ রজার ডি. কভার্লির বিখ্যাত নজিরে যে "Much can be said on both sides." তাই আমি বেশি ক'রে জোর দিতে চাই শুধু আমার নয় আরো অনেক সঙ্গীতজ্ঞের অভিজ্ঞতার পরে, কেন না শুক্‌নো যুক্তি হ'ল শাঁকের করাত, দুধারেই কাটে।

আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতাটি এই যে, এযুগে আমাদের শ্রুতি ভালো হার্মোনিয়মের সুমিষ্ট সুরে এমনই অপ্রাতিবাহ্য রস পায় যে হার্মোনিয়মকে গায়ের জোরে বাতিল করলে সে দুঃখ পাবেই পাবে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাটি এই যে নিজে বাজিয়ে গাওয়ার পক্ষে হার্মোনিয়মের মতন সঙ্গতকার আর নেই। একথায় যাঁরা আপত্তি করবেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—হার্মোনিয়ম ছাড়া আর কোন্ যন্ত্র নিজে বাজিয়ে গান করা যায়? এস্রাজ? কঠিন। সারঙ্গী? আরো কঠিন। এক রইল অদ্বৈত তান্‌পুরা। কিন্তু তানপুরা গানের সঙ্গত নয়—শুধু সা ও পা বাজে একঘেয়ে সুরে। তানপুরা কণ্ঠসাধনার বিশেষ উপযোগী কিন্তু গানের সঙ্গত হিসেবে আজকের দিনে অচল—বিশেষ হার্মোনিয়মের অভ্যাগমের পরে। এর একটি প্রধান কারণ: গায়ক কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রের সঙ্গত চান এতে তাঁর কণ্ঠ খানিকটা সাহায্য পায় ব'লেই। যাঁরা শুদ্ধ শ্রুতির অজুহাতে হার্মোনিয়মকে রাতারাতি বরখাস্ত করতে চান তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয়—শতকরা কয়জন গায়ক আল্লাবন্দে খাঁ, আব্দুল করিম, ফৈয়স খাঁ বা নাসির উদ্দীনের মত নিখুঁৎ শ্রুতির প্রয়োগে কলাকুশলী? সাধারণতঃ গানে আমরা বারটি পর্দাই ব্যবহার ক'রে থাকি—স্বরলিপিতে এমনকি ওস্তাদিপন্থী ভাতখণ্ডেও বারটি পর্দাই চালু করেছেন: সা রে গা মা পা ধা নি, কোমল রে গা ধা নি ও কড়ি মধ্যম। ব্যস্। ঠুংরি গজল ধ্রুপদের অতি কোমল পর্দা খুব কমই ব্যবহার হয়। আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রেও বলে (সঙ্গীত রত্নাকর-এর টীকাকার "সঙ্গীত সময়সার" গ্রন্থ থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন):

তে তু দ্বাবিংশতি র্নাদা ন কণ্ঠেন পরিস্ফুটাঃ ।
শক্যা দর্শয়িতুং তস্মাদ্বীণায়াং তন্নিদর্শনম্ ।

অর্থাৎ সপ্তকের অন্তর্গত বাইশটি সূক্ষ্ম শ্রুতি কণ্ঠে গেয়ে দেখানো অসম্ভব, একমাত্র বীণায় দেখানো যেতে পারে ।

এ-কথা যে সত্য তা সঙ্গীত পণ্ডিতরা যদি নাও স্বীকার করেন, সঙ্গীতরসিক ও সাধকেরা স্বীকার করবেনই করবেন—আরো এইজন্য যে সাড়ে পনর আনা গায়ক-গায়িকা ধ্রুপদ ঠুংরি টপ্পায়ও (অর্থাৎ কিনা মার্গসঙ্গীতেও) বারটি সুরেই চলা-ফেরা ক'রে থাকেন। এক-আধটি উচ্চতম শ্রেণীর ওস্তাদের কণ্ঠে আশ্চর্য শ্রুতির বাহার ফুটলেও সে-বিপর্যয় কণ্ঠসাধনা সাড়ে পনের আনা সুগায়কের পক্ষেও অসম্ভব। তা ছাড়া একটা কথা ভুললে চলবে না যে, বারটি পর্দায় যদি আমাদের কণ্ঠ তথা কান পূর্ণ তৃপ্তি পায় তাহ'লে সে কেন বাইশটি শ্রুতির সাধনায় প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে রাজি হবে? আমাকে এ ক্ষেত্রে ভুল বোঝা সম্ভব তাই ফের বলি যে সূক্ষ্ম শ্রুতির মনোহারিত্ব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সে-মনোহারিত্বের সমজদার হওয়াও যেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার তাকে কণ্ঠে স্বরিত করাও সাধারণ সুগায়কের পক্ষে তেমনি অসম্ভব। অপিচ, যদি বারোটি পর্দায় গান গেয়ে বা বাজিয়ে আমরা গভীর আনন্দ পাই তাহ'লে বাইশটি শ্রুতির সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ব্যবধানের মর্মজ্ঞ হতে ছুটব কিসের তাগিদে? যাঁরা বলেন—"সূক্ষ্মতম রস আহরণ করার তাগিদে", তাঁদের বলব—"বারোটা সুরে যে-রস আহরণ করছি তাতে যদি মন তৃপ্ত হয় তবে tweedledum and tweedledee-র চুল-চেরা বিভাগ নিয়ে মেতে উঠবই বা কেন?" ইংরাজিতে বলে: the proof of the pudding lies in the eating thereof; তা ছাড়া কাঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধরতে পারে তবে আসল বিড়ালের জায়গায় তাকে বাহাল করলে খরচও কমে, কাজও হাসিল হয়।

এ প্রগল্‌ভ পরিহাস নয়, নানা ওস্তাদ মহলে সূক্ষ্ম শ্রুতির ভাগ

নিয়ে গলাবাজির ঝামেলায় যিনিই ভুগেছেন তিনিই মানবেন যে এ-জাতীয় বিতণ্ডায় যে-সব যুক্তি সচরাচর পেশ করা হয় তাদের ষোলো আনাই না হোক সাড়ে পনের আনা কানা তো বটেই। অর্থাৎ উচ্চ-সঙ্গীতের আনন্দ বাইশটি শ্রুতির উপর নির্ভর করে না, করে হৃদয়বেগ, সুকণ্ঠ, সুরসৃষ্টিপ্রতিভা, তান নৈপুণ্য, ছন্দজ্ঞান ইত্যাদি রকমারি সাঙ্গীতিক গুণের উপর। এ কথা যদি সত্য না হ'ত তাহলে হাল আমলে এমন কি আব্দুল করিম, ফৈয়স খাঁ, চন্দন চোবে, ভীষ্মদেব, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিখ্যাত গুণী গায়কও তাঁদের গানের সঙ্গত করতেন না নিজে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে বা কোনো-না-কোনো হার্মোনিয়ম বাদককে দিয়ে। সঙ্গীতজ্ঞরা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে গ্রামোফোনে এঁদের প্রত্যেকের গানেই হার্মোনিয়ম সঙ্গত হওয়ার দরুন সাঙ্গীতিক সুরের জৌলুষ কমে নি, বরং বেড়েছে। এরি নাম—the proof of the puddingকে খোঁজা তালুর এজাহারে।

একথা যদি মঞ্জুর হয় তাহ'লে হার্মোনিয়মের বিপক্ষে শ্রুতিধরদের বিরাগকে না-মঞ্জুর না ক'রে উপায় কি ?

কিন্তু হার্মোনিয়ম সঙ্গত করতে হ'লে দুটি কথা ভুললে চলবে না। এক ঃ হার্মোনিয়মটি কর্কশ হ'লে চলবে না। দুই ঃ সব কিছুর মত হার্মোনিয়মও বাজাতে জানতে হবে, শিখতে হবে। রামদাস কথকের সঙ্গতকার যেভাবে সিংহনাদী বাজনা বাজিয়েছিলেন তাতে কণ্ঠের সুর ঢাকা প'ড়ে যায়—যেমন যায় বেশি জোরে তবলা বাজালে। হার্মোনিয়ম মিষ্ট হবে, বাদক মোলায়েম স্বনে বাজাবেন আর সম্ভব হ'লে গায়ক নিজেই নিজের গানের সঙ্গত করবেন। কারণ তাহ'লেই সব চেয়ে ভালো সঙ্গত হবে, বিশেষ সেই সব গানে যাতে তানালাপ বেশি আছে ব'লে বা সম্পূর্ণ নতুন সুরের মেলডির সৃষ্টি করা হয় ব'লে আস্থায়ী অন্তরায়ও মূল সুরের বদল হয় ক্ষণে ক্ষণে। এরূপ ক্ষেত্রে গায়ক নিজে সহজেই নিজের গানের সুর (tune) হার্মোনিয়মে তুলতে পারেন, কিন্তু অন্য কোনো বাদকের পক্ষে সঙ্গত করা প্রায়

অসম্ভবের কাছাকাছি—বিশেষ যদি বেহালায় বা সারঙ্গীতে এসব তানের হুবহু প্রতিচ্ছবি ফলাতে হয়। একত্রে যথাযথ পদ্ধতিতে অনেকদিন ধ'রে অভ্যাস করলে তোলা যায় অবশ্য—যেমন বাইজিদের সঙ্গে সঙ্গতে তোলেন অভ্যস্ত সারঙ্গিয়া। কিন্তু কোনো গায়কের পক্ষে আজকের দিনে মাইনে দিয়ে সারঙ্গিয়া রাখা যে সম্ভব নয় একথা বলাই বেশি। তাছাড়া যে-গায়ককে নানা জায়গায় গাইতে হয় তিনি কেমন ক'রে নিপুণ সারঙ্গিয়া জোগাড় করবেন শুনি? কাজেই এসব ক্ষেত্রে সঙ্গতে শুধু তাই হয় যা আজকের রেডিওতে শোনা যায় ওস্তাদি গানের সঙ্গতে—অর্থাৎ তানালাপে কণ্ঠের সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গতের পদে পদে অমিল। এ বিষয়ে রেডিও কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত কিন্তু তাঁরা হন না কারণ তাঁদেরও ঊর্ধ্বে যাঁরা আসীন তাঁরা হার্মোনিয়মের বিরোধী। হ'লেনই বা তাঁরা সঙ্গীতে অজ্ঞ, তাঁরাই তো সব তাতেই হর্তাকর্তা বিধাতা—তাই সঙ্গীতের ক খ না জেনেও তাঁরা সঙ্গীত পরিচালনার নির্দেশ দিলে রেডিওর কর্তৃপক্ষ শিরোধার্য করেন সভয়ে। কিন্তু যে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নির্দেশ দেবার অধিকারী সে সব বিষয়ে অবিশেষজ্ঞদের বিধান দেওয়া হাস্যকর নয় কি? যদি কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে সে দেশের কোনো রাজপুরুষ বিধান দেন যে, শুধু অমুক অমুক পদ্ধতিতেই বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা করতে হবে, তাহ'লে সে বিধানকে সবাই হাস্যকর মনে করেন না কি? তেমনি আমাদের দেশে যদি কোনো মাননীয় রাজপুরুষ বিধান দেন যে সঙ্গীত বা চিত্রকলায় গুণী ও চিত্রীকে শুধু অমুক অমুক সুর, যন্ত্র, তুলি ও রং ব্যবহার করতে হবে তা'হলে তাকে অপৌরুষেয় বিধান ব'লে মেনে নেবেন কি গুণী চিত্রীরা? সঙ্গীত সম্বন্ধে বিধান দেবার এক্তিয়ার আছে শুধু সঙ্গীতসাধক তথা বিশেষজ্ঞদের—সঙ্গীতানভিজ্ঞ রাজপুরুষদের নয়। আর সঙ্গীত সাধকদের মধ্যে ভুক্তভোগী মাত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানেন যে সাধারণতঃ হার্মোনিয়ম বিনা গান

জমানো ভারি কঠিন। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে হার্মোনিয়ম নিজে বাজিয়ে গাইলে গান ঢের সহজেই শ্রুতিমধুর হ'য়ে ওঠে ব'লেই গায়ক সমাজে হার্মোনিয়মের আদর হয়েছে এবং যতদিন না হার্মো-নিয়মের বদ্‌লি এমন কোনো সঙ্গীত-যন্ত্র আবিষ্কার করা যাবে যা নিজে বাজিয়ে গাওয়া যায়, ততদিন হার্মোনিয়মের প্রতিপত্তি কমবে না—আরো এই জন্যে যে শিক্ষার্থীকে শেখানোর পক্ষেও হার্মোনিয়ম অত্যন্ত উপযোগী।

একদল উন্নাসিক ক্রিটিক আছেন যাঁরা সঘনে ব'লে থাকেন যে, হার্মোনিয়ম বিদেশী যন্ত্র, কাজেই এর ব্যবহারে আমাদের সনাতন সঙ্গীতের জাত যাবে। তাঁদের এ-হসনীয় কুযুক্তির উত্তরে শুধু একটি প্রশ্ন করি—তাঁরা রেল জাহাজ মোটর বর্জন করে সনাতন গোযানে ভ্রমণ করারই পক্ষপাতী কি না ও সভা সমিতিতে মেয়েদের ব্লাউজ শেমিজ ছাড়িয়ে শুধু সনাতন শাড়ী পরিহিতা হ'য়ে স্বচ্ছপ্রচ্ছদা হবার পক্ষপাতী কিনা। আমাদের আজকের জীবনে প্রতি পদেই বৈদেশিক ছোঁয়াচ লাগছে, তাতে আপত্তি নেই—যত আপত্তি কেবল বেচারি মধুর হার্মোনিয়মের বেলা?

হার্মোনিয়ম ছাড়া গান যে সহজে জমানো যায় না আজকের দিনে প্রায় প্রতি গায়ক-গায়িকাই হাড়ে হাড়ে জানেন। আমি এক সময়ে সত্যিই চেষ্টা করেছিলাম হার্মোনিয়ম সঙ্গত ত্যাগ করতে; ১৯২৭ সালে দ্বিতীয়বার বিলেত যাই শুধু এস্রাজ নিয়ে। কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা হ'ত—গান জমৃত না সহজে। তাই তৃতীয়বার যখন বিশ্বভ্রমণে গান গেয়ে দেশে দেশে উড়ন্ত হই তখন থিওরির খাতিরে সনাতন-পন্থী হবার মূঢ়তা ছেড়ে হার্মোনিয়ম সঙ্গতে সর্বত্র সাঙ্গীতিক-দের সাড়া পেয়েছিলাম। তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই গান শুনে বিহ্বল হয়েছিলেন ও পত্রিকাদিতেও লিখেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের অপরূপ মুগ্ধকরী শক্তির কথা। হার্মোনিয়ম বিরাগীদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা কি সত্যিই বলেন হার্মোনিয়ম না নিয়ে শুধু তানপুরায়ই গান

গেয়ে আসা আমার উচিত ছিল ? না বলবেন—এই ভাবে না জমিয়ে গাইলে তবেই বিদেশে আমাদের ভজন কীর্তনের মর্যাদা রাখা হ'ত ? আমরা আজকের দিনে রেডিওতে বা অন্যত্র নানা সভায় যে-সব গায়কের গান শুনি তাদের একজনও নাসির উদ্দীন বা আবদুল করিমের মতন শ্রুতিসিদ্ধ শ্রুতিধর নন। তাঁরা সবাই চলতি বারোটি সুরেরি পসারী। তাঁদের গান সর্বত্রই শুনে লোকে আনন্দ পাচ্ছে —শুধু রেডিও এমনই এক আশ্চর্য শুদ্ধ সনাতনী প্রতিষ্ঠান যে তাতে হার্মোনিয়ম ম্লেচ্ছ ও অশুদ্ধ শ্রুতি ব'লে বর্জিত হ'ল ?

আর একটি কথাও এ সম্পর্কে মনে হয়। হার্মোনিয়মের কয়েকটি অসুবিধা থাকলেও (যথা এতে মিড় তোলা যায় না) বিশুদ্ধ হার্মোনিয়ম বাজিয়ে যে সঙ্গীত-রসিককে গভীর আনন্দ পরিবেষণ করা যায় এ একটি অনস্বীকার্য সত্য। যাঁরা গয়ার সোনি, লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুর নবাবালি, ইন্দোরের দেবীদাস, কলকাতার ভীষ্মদেব জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ শিল্পীর হার্মোনিয়ম শুনেছেন তাঁরাই এ কথার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গণপৎরাও, শ্যামলাল, ক্ষেত্রী প্রমুখ বিখ্যাত গুণীরা এক সময়ে আমাদের চিত্ত হরণ করতেন। আজও সুন্দর হার্মোনিয়ম বাজাতে পারেন এমন শিল্পীর দেখা মেলে বাংলায় ও বাংলার বাইরে। এঁদের এ-বাজনাও রেডিওতে পরিবেষণ করা অবশ্য কর্তব্য—ভারতীয় নানা কন্সার্টে গিটার, পিয়ানো, ক্লারিওনেট, বেহালা প্রভৃতি বৈদেশিক যন্ত্র বাজানো হয় তাতে আপত্তি নেই, কেবল হার্মোনিয়মেই ভাগবত অশুদ্ধ? হয়েছে কি, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা আজকের দিনে প্রায়ই জনসাধারণের সুখ দুঃখ অভাব অসুবিধার খবর রাখেন না। এর নাম আর যাই হোক, ডিমক্রাসি নয়।

শেষে বলি পুনরায় আমার বক্তব্যের মর্ম সংক্ষেপে :

১। আজকের দিনে রেডিওতে হার্মোনিয়মের পুনঃ প্রবর্তন হওয়া উচিত। যাঁরা হার্মোনিয়ম বিনা গাইতে চান তারা শুধু

তানপুরা নিয়েই গান না—কে আপত্তি করছে? কিন্তু যাঁরা হার্মোনিয়ম সঙ্গতে গাইতে অভ্যস্ত তাঁদের বরখাস্ত করলে অনেক জনপ্রিয় সঙ্গীত-রসিকই তাঁদের গান শুনতে পায় না—যেমন আজ পাচ্ছে না।

২। প্রতি রেডিও স্টুডিওতে খুব ভালো folding bellow-র মৃদুস্বনী হার্মোনিয়ম থাকা উচিত যাতে গায়কেরা প্রবল সুরে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গানের আত্মশ্রাদ্ধ না করতে পারেন। মৃদুসুরে হার্মোনিয়ম বাজানোর রীতি সহজেই চালু করা যায়—যেমন গ্রামোফোনে গান গাইবার সময়ে করা হয়।

৩। হার্মোনিয়মের বাজনা আলাদা একক বাদ্য হিসেবেও রেডিওতে পরিবেষিত হওয়া উচিত কারণ ভালো বাজাতে জানলে একক হার্মোনিয়ম বাজনা অতি উপভোগ্য হ'তে পারে ও হ'য়ে থাকে—এ হ'ল একটি অপ্রতিবাদ্য সত্য, কাজেই গায়ের জোরে অস্বীকার করলেও সে নামঞ্জুর হয় না।

রেডিওর প্রসঙ্গ তুললাম কেন না বহু সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গেই আমার আলোচনা হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গে আমি মূলতঃ একমত যে, যেহেতু হার্মোনিয়মের মতন রেডিও-সঙ্গীতও has come to stay সেহেতু এ-দুয়ের মিতালি হওয়া সব দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়। কেবল দুঃখ এই যে রেডিওর কর্তৃপক্ষ একবার যখন ধরেছেন হার্মোনিয়ম বর্জনীয় তখন তাঁদের সে-মতকে নাকচ করতে গেলে গায়কদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবার সম্ভাবনা। সমর্সেট মম তাঁর strictly personal ব'লে একটি স্মৃতিচারণে লিখেছেন একটি লাখ কথার এক কথা :

"As we all know, one of the disadvantages of the democratic form of government is that when a man is comfortably ensconced in a billet for which he is unfit, it is the devils' own job to get him out of it." তাই মনে হয় ইদানীন্তন শুচিবেয়ে রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছে ম্লেচ্ছ হার্মোনিয়মের স্বপক্ষে এ জাতীয় বাস্তব যুক্তি পেশ করা খানিকটা অরণ্যে রোদনেরই

শামিল হবে। তবু লিখলাম কারণ একাধিক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে অনুরোধ করেছেন এ সম্পর্কে কিছু লিখতে। হয়ত একদিন কোনো শুভ লগ্নে ব্রাহ্ম মুহূর্তে রেডিওর পলিসি বদল হবে কোনো দুরবগাহ কারণে। সেদিন সে অনাগত কালের হর্তাকর্তা-বিধাতারা হয়ত হরিজন হার্মোনিয়মকে শ্রীগৌরাঙ্গ বা গান্ধিজির মতনই সানন্দে কোল দেবেন—কে বলতে পারে?

কালোহ্যয়ং নিরবধি বিচিত্রা চ পৃথ্বী।

* * *

ঠিক কোন্ সালে মনে পড়ছে না—তবে ১৯২৪ থেকে ২৬শের মধ্যে হবে যখন রবীন্দ্রনাথ কাশীতে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর মনোরম প্রাসাদে অতিথি হ'য়ে আমাকে তলব করেন কাশীর বিখ্যাত বাই হুশ্‌না জানের গান শুনতে। সোৎসাহে গিয়ে কবীন্দ্রের কৃপায় সেদিন প্রাতে হুশ্‌নার মনোহর তোড়ি আশাবরী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রভাতী রাগিনী শোনা গেল। সে-সকালটির স্মৃতি সেদিনের শ্রোতৃবৃন্দের মন হ'তে বোধহয় সহজে বিলুপ্ত হবে না। সেদিন বৃদ্ধা হুশ্‌না তার দুর্বল জরাজীর্ণ কণ্ঠেও যে-অপূর্ব সুরের জাল বুনেছিল, ঠুংরির নানা ছোট ছোট বোল ও ভাও-য়ের মধ্যে দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল সুরব্যঞ্জনা ফলিয়ে তুলেছিল তার তুলনা মেলা ভার। সত্যিই গান গাইবার সময়ে তাঁর মুখের ভাব এমন সুন্দর হয়ে উঠেছিল যে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর বার্ধক্যের কথা।

বিদ্যাধরী বাই কাশীর আর একটি শ্রেষ্ঠ গায়িকা। এঁর গান আমি প্রথমবার শুনেছিলেম—কাশীতে, ও দ্বিতীয়বার লক্ষ্ণৌয়ের এক হৃতরাজ্য, বোল-চাল-মুখর নবাব সাহেবের আরামনিলয়ে। বিদ্যাধরী "দুর্গা" রাগ বড় সুন্দর গাইতে পারেন। এক আবদুল করিমের মুখে ছাড়া আমি 'দুর্গা' রাগ এত সুন্দর ভাবে কাউকে গাইতে শুনিনি। বিদ্যাধরী সত্যিই একজন উচ্চ শ্রেণীর গায়িকা। তাঁর সুরের সূক্ষ্ম

কাজ, মিড়, তাল, মূর্ছনা, কণ্ঠস্বরে মিষ্টত্ব সবই মনোহর। কেবল তাঁর স্বরটি একটু ভেঙে গিয়েছে—বোধহয়। বেশি গাওয়ার দরুণ যদি তাঁর কণ্ঠস্বরের এই দোষটুকু মাত্র না থাকতো তা হ'লে বোধহয় আজ তিনি অচ্ছন বাই বা জানকী বাইয়ের সমকক্ষ গায়িকা ব'লে গণ্য হ'তেন নিশ্চয়ই।

কাশীর রাজরাজেশ্বরী বাইয়েরও সুগায়িকা ব'লে প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে ক্ষণিক আনন্দ সময়ে সময়ে মিললেও সে গভীর তৃপ্তি মেলা সম্ভব নয়, যে তৃপ্তি হুশনাজান ও বিদ্যাধরীর গানে পাওয়া যায়। কারণ প্রথমতঃ এঁর গানের মধ্যে বিশুদ্ধ গতানুগতিকতাই পনর আনা, ও দ্বিতীয়তঃ এঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা খনখনে ভাবের আমেজ আছে যাকে ইংরাজীতে বলে metallic voice. কলিকাতার বিখ্যাত গায়িকা গহরজানের গলা এই ধরণের। এরূপ গলা কর্কশ না হলেও বেশিক্ষণ তৃপ্তি দিতে পারে না, অল্পক্ষণ পরেই কেমন যেন একঘেয়ে বোধ হয়। গহরজানের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন আমি কী বলতে চাইছি।

কাশীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী বোধহয় হরিনারায়ণ বাবু। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বোধ না ক'রেই পারা যায় না, তাঁর কণ্ঠস্বরও মিষ্ট। কিন্তু তাঁর মধ্যে গোঁড়া ধ্রুপদীর অসহিষ্ণুতা উদারপন্থী সঙ্গীত রসিককে বোধহয় আঘাত না ক'রেই পারে না। তাঁর ধারণা অনেকটা বিখ্যাত তাজখাঁ প্রমুখ ক্রোধন ধ্রুপদীদের মতন যাঁদের নিহিত মনোভাব এই যে ধ্রুপদ যে শুধু শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তাই নয়, ধ্রুপদের আসরে খেয়াল গুন্ গুন্ করে গাইলেও প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হয়। আমাদের মতন যাঁরা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির ভক্ত, তাঁরা হরিনারায়ণবাবুর সঙ্গে বোধহয় একমত হ'তে পারবেন না। ইনি লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মোদ্দা কথাটা এই যে, এরূপ সম্মেলন হ'লেই বা কি লোপ পেলেই বা কি, যদি তাতে সঙ্গীতের নিয়ম-কানুন অনড় অচলভাবে ধারাবদ্ধ

করা না হয়। হরিনারায়ণবাবুর মতাবলম্বী মানুষ সংসারের সর্বত্রই মেলে যাঁরা চান চিরাচরিত প্রথার জের টেনে চলতে। ইংরাজিতে এদের বলে conservative, কিনা রক্ষণশীল, অথবা purist কিনা শুচিবেয়ে বা সনাতনপন্থী। চলতি প্রথার পান থেকে চুন খসলেও এঁদের আতঙ্ক হয়। শুধু তাই নয়, এঁরা হ'লেন প্রকৃতিতে বৈয়াকরণিক—শাস্ত্রী। এঁরা তাই অম্লান বদনেই বলেন যে, রাগ-রাগিণীরা শ্রেণীভুক্তই যদি না হ'ল তবে বৎসর বৎসর সঙ্গীত-সম্মেলনে বেফয়দা গান গেয়ে হবে কি? রাগরাগিণী শ্রেণীভুক্ত হওয়াটা যে বাঞ্ছনীয় একথা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু সেটাকেই আসল বস্তু ব'লে মনে ক'রে বসলে মানুষের রসবোধের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনাই কি পনের আনা হ'য়ে ওঠে না? অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্যে আমরা চাই কি? না, হৃদয়ের বিকাশ, আনন্দ, তৃপ্তি, উল্লাস, স্ফূর্তি, শান্তি। কাজে কাজেই বৎসর বৎসর সঙ্গীত-সম্মেলনের ফলে যদি রাগরাগিণীর একটা পরমা গতি না-ও হয় তা'হলেও বিশেষ কিছু আসে যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট হেতু আছে। রাগরাগিণীকে সূত্রবদ্ধ করা বৈয়াকরণের কাজ, শিল্পীর নয়; তাঁর কাজ—সৃষ্টি। একথা বলতে আমাকে যেন কেউ ভুল না বোঝেন। শিল্পীর সৃষ্টিই মুখ্য বস্তু হলেও বৈয়াকরণের সূত্রগ্রন্থন পণ্ডশ্রম একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীর সৃষ্টির ধারা বংশানুক্রমে বজায় রাখতে হ'লে বৈয়াকরণেরও দরকার। প্রতি সমৃদ্ধ সভ্যতায় সব শ্রেণীর কর্মীরই স্থান আছে ও থাকা উচিত। তবে তাই ব'লে বলা চলে না যে বৈয়াকরণকে যদি সঙ্গীত সম্মেলনে উচ্চতম মঞ্চে আরূঢ় করা না হয়, তা হ'লে সে সব সঙ্গীত-উৎসবই মায়ামাত্র। বৎসর বৎসর সঙ্গীত সম্মেলন আহূত করার অন্য অনেক রকম উপকারিতা আছে। যথা,—

(১) তাতে ক'রে সঙ্গীত রসিকের সামনে সঙ্গীত রসের উপকরণের প্রদর্শনী বিছানো-রূপ একটা মস্ত কাজ করা হয়। (২) নানা স্থানের শিল্পী বৎসরে একবার ক'রে পরস্পরের সংশ্রবে আসতে

পারেন, যাতে অদূর ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট হ'তেই হবে। (৩) উদীয়মান গায়কদের উৎসাহ বাড়ে। (৪) গান শোনার নিয়মানুগত্য শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে গঠিত হ'তে থাকে। (৫) উচ্চ সঙ্গীত সম্বন্ধে ধীরে ধীরে একটা প্রবুদ্ধ লোকমত গ'ড়ে উঠতে থাকে, যার অভাবে সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে পারে না। এবং শেষতঃ (৬) আমাদের সঙ্গীত কলারূপ উচ্চ সম্পদের প্রতি উদাসীনের মনেও একটা শ্রদ্ধার ভাব আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। এ সব নানাবিধ উপকারিত্বের জন্য সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোগকর্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হরিনারায়ণবাবুর সম্প্রদায়ভুক্ত ক্রোধন, বৈয়াকরণ ওস্তাদবৃন্দ কি সদয় হয়ে এ কথাগুলির প্রতি একটু মনোযোগ দেবেন ?

* * *

জয়পুর। মনোরম শহর বৈ কি। রাজপ্রাসাদটিও চমৎকার।

সেখানে অতিথি হয়েছিলাম বিখ্যাত ৺সংসার সেন মহাশয়ের পৌত্রদের মনোজ্ঞ ভবনে। এঁরা বুঝি জয়পুরে "ডমিসাইল্‌ড" হ'য়ে জায়গিরদার ব'নে গেছেন দুই পুরুষ আগে। বিদেশে এমন শিক্ষিত সম্মানিত বর্ধিষ্ণু পরিবারের আশ্রয়ে এসে যে বিশেষ আরাম পেয়েছিলাম একথা না বললেও চলবে। কিন্তু এঁদের অতিথি হওয়ার ফলে আমার জয়পুরের ওস্তাদ ও বাইদের গান শোনার সুবিধা হয়েছিল এটা আরো বেশি লাভ—অর্থাৎ এমন গুণী যাঁরা অন্যত্র নিমন্ত্রিত হ'লে সহজে হাজিরি দিতেন না।

প্রথম শোনা গেল—কুতবালি খাঁ ব'লে একজন বীণকারের বীণা। এ বিংশ শতাব্দীতে বীণার রেয়াজ বোধ হয় উঠে গেছে বল্‌লেই হয়—অন্ততঃ উত্তর ভারতে বটেই। (সুখের বিষয় দাক্ষিণাত্যে ভদ্র মেয়েরা এখনও বীণার চর্চা করেন।) তাই অনেকদিন পরে সুদূর জয়পুরে বীণা উপভোগ করা যাবে এ কল্পনায় মনটা ভারি খুসি হ'ল। কিন্তু

হায়, যে-বীণা শুনলাম তাতে মনটা কল্পিত খুসির সে তীব্র নিখাদ হ'তে সটাং বাস্তবের কোমল ঋষভে নেমে এল। কুতবালি খাঁ দুঃখ ক'রে জানালেন যে, তিনি যে-"সরকারের" কাছে আছেন তাঁর জীবনের মূল সূত্রই হচ্ছে তাঁর তাঁবেদারগণকে লাট্টুর মতন ঘোরানো। "সরকার" প্রভুর এ-হেন বেখাপ্পা জীবনব্রতের কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে কুতবালি খাঁ ভগ্নকণ্ঠে উত্তর দিলেন "হায়, কারণ আর কি? তাঁর না আছে 'শওক্', না আছে 'দিল'। ব'লে নিজের দীনহীন বেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ও বললেন যে তাঁকে তাঁর হুজুর 'বেফায়দা' ফকীর বানিয়ে ছেড়েছেন। খ্রীষ্টদেবের দারিদ্র্যের আশীর্বাদ সম্বন্ধে এ-ক্লিষ্ট বৃদ্ধকে লেকচার দিয়ে ফল হবে না বুঝে তার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক বাধ্যবাধকতার দাবী দাওয়ার মর্য্যাদা রাখা ছাড়া আর উপায় দেখলাম না। কিন্তু মনে সত্যই দুঃখ হ'ল যে এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত অভিজাত-গণের কৃপার উপরেই আমাদের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর করতে পারে একথা এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন! ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে এক শিক্ষিত লোকমত, আগেকার যুগের মতন অলস ও বিলাসী রাজরাজড়ার কৃপাকটাক্ষ নয়। এ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে বিশদ ভাবে লিখেছি * তাই আজ এ সম্পর্কে শুধু এইটুকু মাত্র ব'লেই ক্ষান্ত হব, যে যাঁরা আগেকার যুগের রাজরাজড়াদের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতাকে বড় ক'রে দেখতেন তাঁরা জানেন না সে পৃষ্ঠপোষকতা প্রায়ই কি মূল্যে ক্রয় করা হ'ত। শিল্পীর আত্মসম্মানকে নষ্ট ক'রে তার কলাকারুকে বড় করা যায় না।

* Modern Review, November, 1924·········Patronage of Music প্রবন্ধে। ভাবতে মন খুশি হয়—পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আমি এই যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম আজ তা সফল হ'তে চলেছে—সঙ্গীতে জনসাধারণের সাড়াতেই আজ বহু সঙ্গীতকার তথা গুণীর ভরণপোষণ হচ্ছে।
(এ-পাদটীকাটি ১৯৬০ সালে জুড়ে দিলাম পাঠকের ভালো লাগবে ভেবে।)

তার পর দিন জয়পুরের শ্রেষ্ঠ গায়িকা গহর বাইয়ের গান শোনা গেল। গহর বাইয়ের বাড়িতেই গান হ'য়েছিল। সাধারণতঃ বাইজিদের বাড়ি অপরিষ্কার থাকে। যারা কোনও একটা শিল্পকলার মাধ্যমে সুন্দরের সাধনা করে তাদের জীবনযাত্রায়ও সে-সাধনার কিছু বিকাশ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না। পক্ষান্তরে যারা থাকে চমৎকার উদ্যানবাটিকায় তারা দেখা যায় অনেকসময়ে মনোলোকে সুন্দরের কোনো তৃষ্ণাই পোষণ করে না—না ভালোবাসে গান, না কবিতা, চিত্রকলা বা স্থাপত্য। মানুষের জীবনে সুসঙ্গতির দেখা মেলা এত ভার হ'য়ে থাকে কেন বহুদিন বাদে শ্রীঅরবিন্দের কাছে ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম: যে একটা মানুষের মধ্যে বাস করে নানা মানুষ। তাই তাদের একজন যা চায় তার সঙ্গে আর পাঁচজনের তৃষ্ণার সামঞ্জস্য করা হয় এক দায়!* সে যাই হোক আমার বলবার কথাটা এই যে বড় শিল্পী বড় গুণীর নিবাসে গিয়ে সেখানে কুশ্রী অপরিচ্ছন্নতা দেখলে আমরা অস্বস্তি বোধ না ক'রেই পারি না। এক বম্বের বিখ্যাত তারাবাইয়ের বাসভবনের পরিচ্ছন্নতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছিল মনে আছে। এবং জীবনে এই দ্বিতীয়বার বাইজির বাড়ি পরিষ্কার দেখলাম, শুধু পরিষ্কার নয়, বড় সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। তিনদিকে জয়পুরের শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়মালা, নিচে একটি ছোট বাগান। এরূপ পরিবেশে প্রভাতী রাগিণী শুনব ভাবতেই মন খুসিতে গান গেয়ে উঠল। তবে ভয় ছিল পাছে বিখ্যাত গহরবাই মুজরা না ক'রে রাজি না হন। কিন্তু গহরবাই বোধহয় শ্রোতার সঙ্গীতোৎসাহ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'লে উদার হ'তে অসম্মত হন না। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বাইজিদের মধ্যে এরকম উদারতা আমি আরো দেখেছি, যদিও নিম্নশ্রেণীর বাইজিদের গান শোনানোর জন্য দরদস্তুর করার দৃষ্টান্তও যথেষ্ট দেখা যায়।

যাই হোক গহরবাই একটি আশাবরী ধামার (ধ্রুপদ), একটি

---

* এ অংশটুকু ১৯৬০ সালে লেখা।

আশাবরী মধ্যমান (খেয়াল), একটি ভৈরবী টপ্পা ও একটি ভৈরবী ঠুংরি গাইলেন। তাঁকে দেখে প্রথমে আমি একটু নিরাশ হ'য়েছিলাম। কারণ, একে তাঁর বয়স কম (৩০।৩২ হবে) ও দ্বিতীয়তঃ তাঁর চেহারা সুশ্রী। তরুণী ও সুন্দরী বাইজিরা সহজেই খাঁখানান ও রাজাবাহাদুর প্রমুখ হোমরাও চোমরাওগণের প্রিয়পাত্রী হ'য়ে পড়েন ব'লে তাঁদের উচ্চ-সঙ্গীত শেখার না থাকে সময়, না হয় সুযোগ। একথা আমি কয়েকবার ঠেকে শেখার পরে যখন গানের খোঁজ করতাম তখন খোঁজ নিতাম বাইজি দেখতে কেমন। সুন্দরী শুনলেই আর সেদিকে ঘেঁষতাম না, কারণ ধ'রে নিতাম সুন্দরী বাই সুন্দর গাইতে পারবেন না কখনই। প্রয়াগের জানকী বাই, লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন বাই, গোয়ালিয়রের মঙ্গুবাই, আরো অনেক বাইয়ের গান শুনেছি যাঁদের রূপ ছিল না ব'লেই ভালো ক'রে গাইতে শিখতে হয়েছিল মনে হয়। যেমন রূপবতী মেয়ে প্রায়ই গুণবতী বধূ হয় না, এ-ও তেম্‌নি। অবশ্য এ-সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে বলাই বাহুল্য। তবে কথায় বলে না exceptions prove the rule ?

সুখের বিষয় গহরবাই সুর ধরতে না ধরতেই বোঝা গেল যে তিনি সাধারণ সূত্রের নমুনা নন—আশ্চর্য ব্যতিক্রমেরই দলে। কারণ তিনি শুধু যে ভালো গান তাই নয়, এরূপ সুললিত উচ্চশ্রেণীর গান শোনার সৌভাগ্য জীবনে খুব কমই হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে তিনি এলেন ও তিন চার ঘণ্টা গেয়েও এক পয়সা 'ইনাম' নিলেন না। বললেন যে কদরদানের (গুণগ্রাহী) কাছে গান গাইতে পাওয়াটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট ইনাম। (সেদিন সভায় অনেকগুলি সমজদার হিন্দুস্থানী ও বাঙালী শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।) এরূপ সত্য শিল্পীর মর্যাদালাভের আন্তরিক স্বীকারোক্তি আমাদের সকলেরই বড় ভাল লাগল।

যাই হোক্, গহরবাই সন্ধ্যা ৮টা থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্রি প্রায় বারটা অবধি গেয়ে গেলেন। কি সে গান! কি সে সুরলালিত্য!

কি সে মিড়ের তৃপ্তি ও কি সে নানাবিধ তানের জম্‌কালো আবেদন! গাইতে গাইতে তাঁর গানও যেন এক অপরূপ প্রেরণায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠল। কেদারা, কামোদ, বাগেশ্রী, বেহাগ প্রভৃতি খেয়াল তিনি যে অপূর্ব্ব ঢঙে গাইলেন, সেরূপ বিচিত্র ও উৎকৃষ্ট ঢং নারীকণ্ঠে কখনো শুনিনি। এরূপ উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত শুনে, মনটা অবর্ণনীয় আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ল। জীবনে তিন চার বার মাত্র নারীকণ্ঠের গান ভাল লেগেছিল। কিন্তু গহরবাইয়ের গানের তৃপ্তির তুলনায় সে-সব বাইয়ের গানের-আনন্দের স্মৃতি ম্লান হয়ে গিয়েছিল বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

সবশেষে তিনি গাইলেন কয়েকটি অপরূপ গজল। ই-দর বাইয়ের গজলেও আমি আনন্দ পেয়েছিলাম বৈ কি—যে কথা ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু গহর বাইয়ের গজল আরো মধুর তথা বিচিত্র। যাঁরা বলেন যে গজলের সৌন্দর্য স্থরের নয়—কথার, গহর বাইয়ের অপরূপ গজলের স্থরবৈচিত্র্য শুনলে তাঁদের ধারণা নিশ্চয়ই বদ্‌লে যেত। কারণ গহরবাই তাঁর নানা গজলে এমন সব সূক্ষ্ম স্থরকারুর প্রবর্তন করেন যে সেসব গজলের কথার মর্মজ্ঞ না হ'য়েও শুধু তাদের স্থরের সুষমায়ই মুগ্ধ হ'বেন তাঁরা নিশ্চয়ই।

গহরবাই যে সব জড়িয়ে অচ্ছন বাই বা জানকী বাইয়ের চেয়ে উচ্চদরের গায়িকা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর তানের বৈচিত্র্য, স্থরের সূক্ষ্মতা, গানের শ্রী, স্থরের ব্যঞ্জনা, আলাপের জমকালোত্ব সবই অতি উচ্চ অঙ্গের। তাঁর কণ্ঠস্বর অতি মধুর, কেবল তাঁর একটি মাত্র ক্রটি আছে। ক্রটিটি এই যে তাঁর কণ্ঠের পরিসর (range) কম। বস্তুতঃ তাঁর একমাত্র ক্রটিই এই যে তাঁর স্বর তারার রেখাবের বেশি চড়ে না বা চড়লেও falsetto হ'য়ে যায়। প্রতি গানে অন্ততঃ তারার গান্ধার মধ্যম অবধি বিস্তার করতে না পেলে গায়কের মনটাও সম্পূর্ণ খুসি হয় না, শ্রোতার মনও সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না। এ ছাড়া গহর বাইয়ের স্বরের অন্য কোনও ক্রটি আমি ত অন্ততঃ খুঁজে

পাই নি। তাঁর গলায় বিশুদ্ধ নিক্তির ওজনের সুর প্রাণস্পর্শী মিড়, মনোজ্ঞ তান, সুন্দর সার্গম—সবই মুগ্ধ করে। তাছাড়া তিনি সুন্দরী না হ'লেও শ্রীমন্তিনী হওয়ায় তাঁর গানের রসশ্রী উজ্জ্বলতর হ'য়ে ওঠে তাঁর ভাবভঙ্গিতে।

জয়পুরের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ কেরামৎ খাঁ। এঁর ধ্রুপদ বাস্তবিকই উচ্চশ্রেণীর। ইনি আমাকে জয়পুর কলেজে একদিন কামোদ, কেদারা, তিলককামোদ প্রভৃতি রাগ সানন্দে ও সাগ্রহেই শোনালেন।

জয়পুরের "গুণিজনখানার" (রাজসভাগায়কসঙ্ঘের) অধ্যক্ষ পিয়ারিলাল মহোদয়ের কৃপায় তাঁর বাড়িতে তিনি আমাকে শোনাবার জন্য ফিরদৌসি বাইকে নিমন্ত্রণ করেন। ফিরদৌসি বাইয়ের গানের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা একটু কঠিন। তাঁর বয়স অল্প ব'লে গলাও সতেজ, সুরের লাগডাঁটও ক্ষীণ নয়, মিড়ও বেশ সুষ্ঠু, স্বরও চাপা বা অমিষ্ট নয়, রাগজ্ঞানও মন্দ নয়, এবং তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে গেয়েছিলেন এ কথাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। অথচ তাঁর গান সেদিন তাঁর শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন যাকে বলে "জম্‌ল না"।

তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর তান ও মূর্ছনা মিষ্ট নয়। যাঁরা অনেক গায়ক গায়িকার গান শুনেছেন তাঁরাই জানেন যে এমন প্রায়ই হয় যে কোনও গায়ক বা গায়িকার হয়ত তান ভাল কিন্তু মিড় ভাল নয় কিম্বা মিড় ভাল, কিন্তু তান মিষ্ট নয়; অথবা হয় ত তান ও মিড় দুইই ভাল কিন্তু গলা যাকে বলে সুরেলা—তা নয়। ভাগলপুরে মুস্তরি বাই ব'লে একটি বাইজি আছেন; তাঁর গলাও বেশ ও মিড়ও বেশ সুন্দর, কিন্তু তান বড় হীনশ্রী ব'লে তাঁর গানের প্রথম দিকের অর্থাৎ মিড় ও সুর বিস্তারের—রসটি জলদ মূর্ছনার সময় বড় অকস্মাৎ নষ্ট হ'য়ে যায়। বিখ্যাত চন্দন চৌবে সুরের ও মিড়ের রাজা হ'লেও তানে তাঁর গলা খেলে না। কাজেই তাঁর ধ্রুপদখেয়ালই ভাল, কিন্তু বিশুদ্ধ খেয়াল তেমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন নয়।

দেবীসিং জয়পুরের এক প্রখ্যাত জায়গিরদার। তিনি আমাকে শোনাতে জয়পুরের ভূতপূর্ব শ্রেষ্ঠ গায়িকা দুর্গা বাইকে তলব করেছিলেন একদিন। দুর্গা বাইরের করুণ জীবনের ইতিহাস শুনে মন আর্দ্র হ'য়ে উঠেছিল আগেই। প্রেমের জন্যে তিনি সর্বস্বান্ত হন —সেই পুরাতন কাহিনী, অসৎ প্রণয়ীর হাতে একনিষ্ঠার লাঞ্ছনা অপমান দুর্গতি। প্রণয়ীটি তাঁর এখন জেলে কিন্তু তবু তাঁর জন্যেই দুর্গবাই বিরহম্লান—অন্য কোনো ধনী প্রণয়ীর দিকেই তাকান নি। এই জন্যেই হয়ত তাঁর করুণ রাগিণী গুলি আরো মর্মস্পর্শী সুরে বেজে উঠেছিল সেদিন সন্ধ্যায়।

দুর্গা বাই যখন এলেন তখন তাঁর দীনহীন বেশ দেখে সকলেরই বোধ হয় দুঃখ হ'য়েছিল। বাইজিরা সচরাচর যে মহার্ঘ্য বেশভূষা না ক'রে আসেন না, একথা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু দুর্গা বাইয়ের বেশভূষার মধ্যে ছিল মাত্র একটি রাঙা পায়জামা ও মলিন ওড়না। হাতে ছিল তাঁর কেবল দু গাছি কাঁচের চুড়ি। তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, চাহনি সবের মধ্যেই যেন এক মূর্তিমতী হতাশা বিরাজ করছিল।....শুন্‌লাম আজকাল তাঁর দিন গুজরান হয় না এরূপ অবস্থা হ'য়েছে। তাঁকে দেখলে মনে হয় যে বয়স ৫৫।৫৬র কম হবে না, কিন্তু শুনলাম যে তাঁর বয়স বস্তুতঃ বেশি নয় ৪২।৪৩শের কাছাকাছি হবে। "অথচ একদিন ছিল"—বললেন ওখানকার এক ওম্‌রাও—"যেদিন এই ধূলিধূসরিতার অঙ্গে ঝিকমিকিয়ে উঠত মহার্ঘ পেশোয়াজ, কণ্ঠে আনন্দ গৌরবের উচ্ছল তান—যা শুনে পশুপক্ষীও মন্ত্রমুগ্ধ হ'ত—মানুষ তো কোন্ ছার!

জয়পুরে ফুলজি ভট ব'লে এক গায়কের কাছে মীরাবাইয়ের একটি গান শিখেছিলাম দেশী তোড়ি রাগে। এ-রাগটি আর কোথাও শুনি নি—আরোহণে জৌনপুরীর ঢঙ, অবরোহণে ভৈরবীর। মীরাবাইয়ের এ-গানটিও আর কোথাও পাই নি বা শুনি নি। এ-গানটি পণ্ডিচেরিতেও গাইতাম। এর প্রথম চরণ: কৃপা তঈ

সদগুরু অপনেকী বের হরি নাম লিয়ো রে···ইত্যাদি। গানটির ভাব এই যে সব ভক্তকেই হরি কৃপা করলেন, কেবল মীরার বেলায়ই পড়লেন ঘুমিয়ে।

(এই ভাবের একটি গান বহুবৎসর পরে একদিন ইন্দিরা আবৃত্তি করেছিল মাদ্রাজে ১৯৫৬ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে :

যুগ যুগ লাখ রখে ভকতনকী ভকতবছল গিরধারী।
জব জব পীর পড়ী সন্তনপর আয়ে কৃষ্ণ মুরারি।
গজকে প্রাণ বচাওন আয়ে,
দুর্জনসে প্রহ্লাদ বচায়ে,
ধ্রুবনে রো রো পিতা বুলায়া শরণ লিয়ো বনবারী।

পুরোগানটি "দীপাঞ্জলি"-তে ছাপা হয়েছে। এ-গানটির উল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে মীরার নামে প্রচলিত গানটির চেয়ে এ-মীরা-গীত-ইন্দিরা-শ্রুত গানটির মধ্যে প্রভেদ আশমান জমিন। মনে হয় মীরার নামে প্রচলিত গানটি মীরার নয় আদৌ—অথচ ভাবটুকু মীরারই বটে। এ-গানটির নবরূপ পর্যালোচনা করলে একথা মনে না হয়েই পারে না।—বন্ধনীর মধ্যে এ-লেখাটুকু ১৯৬০ সালে লেখা।)

জয়পুরে রিয়াজউদ্দীনের গান শুনলাম। ইনি উদয়পুরের অদ্বিতীয় ধ্রুপদী ৺জাফরুদ্দীন খাঁর ভ্রাতা এনায়েৎ খাঁর পুত্র—তথা আল্লাবন্দে খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—কাজেই খানদানী, বটেই তো। কিন্তু বংশে বড় হ'লে হবে কি, প্রতিভায় ইনি কুলের কুলতিলক নন। তাই করেন কেবল চর্বিত-চর্বণ—তাতেও কণ্ঠস্বরের জৌলুষ নেই—শুধু টিম তা না না তোম না না না-র অশ্রান্ত একঘেয়ে শোভাযাত্রা। কাজেই কেউই শোনে না তাঁর এ-নিষ্প্রাণ অর্থহীন স্বরোদগার। তিনি বললেন খেদ করে এ-যুগে "কদরদান" আর নেই তাই তারা খানদানী ধ্রুপদীকে না মেনে শোনে ফৈয়সখাঁর সস্তা খেয়াল বা কুলজি ভটের বাজে ঠুংরি। সেই পুরাতন ইতিহাস—the old old story নূতনের অভ্যাগমে

পুরাতনের মর্যাদাহানির দুঃখাবহ অভিজ্ঞতা। দুঃখ পেলাম বেচারির শোকে, তাই বলতে পারলাম না তাঁকে : কুলজি ভট ও ফৈয়স খাঁর অপরাধ নেই খাঁ সাহেব, ওদের উপর রাগ কোরো না। ওদের কাছে মানুষ কিছু নূতনত্ব পায় বলেই খুশি হয়। তুমি যদি কিছু নূতনত্বের আমদানি করতে তাহলে তুমিও কদরদানের দেখা পেতে।

* * *

বম্বেতে এবার এক বেগম সাহেবা বললেন "বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে! উঃ! বিরাট পুরুষ! ভারতীয় সঙ্গীতে তিনি মহাত্মা গান্ধি।"

উপমাটি ঠিক সুপ্রযুক্ত না হ'লেও চিত্রময়—যাকে সাহেবী ভাষায় বলে picturesque ; তাই হয়ত শুনে ভালোই লাগে। কারণ আর কিছুই নয়। শুধু এই যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডকে যিনিই একটু কাছ থেকে দেখেছেন তিনিই মুগ্ধ না হ'য়ে পারেন নি আজ পর্যন্ত। কেন—বলি সংক্ষেপে।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গে গত বৎসর যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার মন সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর স্নিগ্ধ হাসিতে, নিরভিমান সঙ্গীত পাণ্ডিত্যে ও সর্বোপরি সঙ্গীতে তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগে। কিন্তু তারপরে যতবারই তাঁর সংস্পর্শে এসেছি মুগ্ধ হয়েছি তাঁর চরিত্রবলে ও নির্মল আদর্শবাদে আর অমনি মনে হয়েছে সাধুসঙ্গের কথা। মহাভারতে ভীষ্ম শরশয্যায় কর্ণকে বলেছিলেন :

যৌনাৎ সম্বন্ধকাল্লোকে বিশিষ্টং সঙ্গতং সতাম্।
সদ্ভিঃ সহ নরব্যাঘ্র! প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥

অর্থাৎ জ্ঞানীরা জগতে যৌন সম্বন্ধের চেয়ে সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনদের অন্তরঙ্গতাকে উচ্চতর সম্বন্ধ বলেন।

সজ্জন—সাধু—নয়ত কি? নিঃস্বার্থতায়, জ্ঞাননিষ্ঠায়, একনিষ্ঠতায়, বিনয়ে—কিসে নয়? অথচ এ-মহাপ্রাণ মানুষটির নাম আজ কজন

জানে? তাই একটু বলিই না কেন তাঁর পুণ্য আদর্শনিষ্ঠ জীবন-কাহিনী।

এক অতি দরিদ্র মারাঠী ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই তিনি গান-পাগল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর থেকে বালক ভাতখণ্ডে একাদিক্রমে সাত আট বৎসর নানা ওস্তাদের কাছে সেতার শিক্ষা করেন এবং অসামান্য ধীশক্তি, স্বরজ্ঞান ও অধ্যবসায়ের গুণে সাত আট বৎসরের মধ্যেই আমাদের সঙ্গীতের অনেক দুরূহতম আঙ্গিক আয়ত্ত করেন। কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ তাঁর ছিল অন্তহীন। ফলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁরা কয়জন সঙ্গীতোৎসাহী একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন—"গায়ক-উত্তেজন মণ্ডলী"। এ-মণ্ডলীর সভ্যবৃন্দের চাঁদার টাকায় যুবক ভাতখণ্ডে বম্বেতে বড় বড় গায়ক বাদকদের আসর বসাতেন—যথা, বিখ্যাত সদারঙ্গ আধারঙ্গ বংশের কুলাতিলক মহম্মদ আলি, আশফ আলি; বৈরম খাঁর বংশধর বেলবাগকর, বিলায়ত হুসেন, আলি হোসেন, হায়দর খাঁ; বিখ্যাত ভাস্কর রাওয়ের গুরু তানরাজ খাঁ, মৌলা বক্স, ফৈজ মহম্মদ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সময়ে বড় বড় ওস্তাদ আজকালকার মতন বিরল ছিল না তাই পণ্ডিতজির শ্রুতি আবাল্য উচ্চতম সঙ্গীতের আবহে সূক্ষ্মতম রসের অনুশীলন করবার সুযোগ পেয়েছিল যথেষ্ট।

মণ্ডলীর নিয়মিত অধিবেশন চলতে লাগল—"গায়ক-উত্তেজন মণ্ডলী" শনৈঃ শনৈঃ উত্তরোত্তর শুধু উত্তেজিত নয় উল্লসিত হয়ে উঠল বহুর সমর্থনে। ওদিকে পণ্ডিতজি অতিকষ্টে ছাত্র পিটিয়ে কোনো রকমে বি-এ পাশ করলেন। কিন্তু বম্বের হাইকোর্টে পসার জমানো অত্যধিক ব্যয়সাধ্য হওয়ার দরুণ তিনি করাচিতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পসারের জন্য যেতে বাধ্য হ'ন। এই সময়ে বম্বের একজন বড় সরকারী উকীল শান্তারাম নারায়ণ তাঁর নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে বম্বেতে পুনরায় ডেকে আনেন। কিন্তু দরিদ্র

পণ্ডিতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বম্বেতে আসতে না আসতে দুমাসের মধ্যে শান্তারাম গতাসু হলেন। তাতেও না দ'মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক স্থির করলেন যে বম্বেতে যখন এসেই পড়েছেন তখন সাহায্যদাতার অভাবসত্বেও সেখানেই প্রাক্‌টিস্ করবেন। অতিকষ্টে কোনও রকম ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করতে না করতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান একটি কন্যা অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দারিদ্র্যের উপর এ বিপদে প্রথমটায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেও এ পরীক্ষার শেষে তাঁর মনুষ্যত্বই জয়ী হ'ল। তিনি স্থির করিলেন যে যখন সংসারে তাঁর এক ভাই ছাড়া আর কেউ রইল না, তখন আর দশবৎসর মাত্র প্রাক্‌টিস ক'রে ভ্রাতার ও নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ক'রে ঠিক্ পঞ্চাশোর্ধ্বে অর্থকরী বিদ্যার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে বাকী জীবন সঙ্গীত-চর্চায় নিয়োজিত করবেন। অবশ্য প্রাক্‌টিসের সময়েও তিনি "গায়ক-উত্তেজক-মণ্ডলী"কে কখনও অবহেলা করেন নি ও বড় বড় গায়ক বাদক এলে তাদের কাছে নানা প্রশ্ন পেশ ক'রে উত্তর পেলে সে প্রশ্নোত্তর মালা বিস্তারিত ভাবে দিন পঞ্জিকায় লিখে রাখতেন। পরে তাঁর সুবৃহৎ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি" নামক অসামান্য গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে এ সব প্রশ্নোত্তর তিনি গুরুশিষ্যসংবাদরূপে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গভীর সঙ্গীতপাণ্ডিত্য ও দুর্দ্দম্য জ্ঞানানুসন্ধিৎসার স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করবে—ভবিষ্যৎ সঙ্গীতানুরাগীদের চোখের সাম্‌নে জ্ঞানীর আদর্শ উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধ'রতে।

কিন্তু এ পুস্তকখানি তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন তিনি ১৯১০ হ'তে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁকে অনেকে বহুপূর্বেই এ সব আলোচনা প্রকাশ করতে ব'লেছিল; কিন্তু পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাদের বলতেন যে পুস্তক প্রকাশ করবার আগে একবার তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন ক'রে সব বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। পরে

এ সব আলোচনাও তিনি তাঁর "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি"তে সন্নিবিষ্ট করেন।

এতদর্থে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বৎসরাধিক কাল এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন ক'রে ভারতভ্রমণ সুরু করেন—নিজের প্র্যাক্‌টিসের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর কর্ণাট সঙ্গীতকার ভেঙ্কটমখীর "চতুর্দণ্ডী প্রবেশিকা"র পাণ্ডুলিপি তাঁর হস্তগত হয়। তাতে ভেঙ্কটমখী এক স্থলে লিখেছেন যে সপ্তকে ১২টি পর্দার বিন্যাসে সর্বশুদ্ধ যে ৭২টি মাত্র ঠাটের (বা মেলকর্তা) বিন্যাস তিনি নির্দিষ্ট ক'রে দিলেন—স্বয়ং ব্রহ্মাও তার চেয়ে একটি বেশি ঠাট উদ্ভাবন করতে পারবেন না। পণ্ডিত ভাত-খণ্ডে আমাকে হেসে ব'লেছিলেন—"আমার মনে আছে, রায় মহাশয় যে প্রথম যেদিন এরূপ একটা পদ্ধতির অস্তিত্বের কথা 'চতুর্দণ্ডী প্রবেশিকা'য় পড়লাম সেদিন হতে তিন রাত্রি আমার ভাল ঘুম হয় নি। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল যে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এ অপূর্ব বিধিবদ্ধ সঙ্গীতের সম্বন্ধে সে-অঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।"

কী জ্ঞানের উৎসাহ! কি সুন্দর হৃদয়ের তারুণ্য যে, যে-সামান্য খবরে শতকরা নিরানব্বই জন লোকে রোমাঞ্চিত হওয়া দূরে থাক ভ্রূক্ষেপও করত না খবরের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্যের পূর্বাভাস এ নিঃসঙ্গ ব্রাহ্মণের নিদ্রাটুকুও হরণ ক'রে নিল। মনে পড়ে বিখ্যাত স্টিভেনসনের কোন্ এক পবিত্র মুহূর্তে কেট্‌লির ঢাকার নৃত্য দেখে বাষ্পের তত্ত্ব পর্যালোচনায় আত্মহারা হওয়ার কথা, আর নিউটনের আপেল পড়ার দৃশ্য দেখে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনায় রত হওয়ার বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—এই-ই মহত্ত্বের কষ্টি-পাথর। মেটারলিংক তাঁর বিখ্যাত Sagesse et Destinee গ্রন্থে লিখেছেন: বীরত্বের অফুরন্ত প্রেরণায় তো বহির্জগত ওতঃপ্রোত;

কেবল সে-প্রেরণা গ্রহণ করতে জানা চাই। কবিই finds tongues in trees and books in running brooks : অকবি মেঘকে মেঘই দেখে, কালো চুলের রাশি দূর থাকুক একগাছিও তার মধ্যে পায় না। নিউটন নিউটন ছিলেন ব'লেই আপেলটি পড়বামাত্র সেটিকে উদরসাৎ না ক'রে তার মধ্যে সৃষ্টির নিয়ম শৃঙ্খলা খুঁজেছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ওস্তাদ বকায়তুল্লা ছিলেন না ব'লেই চতুর্দণ্ডী-প্রবেশিকা থেকে আচম্বিত সঙ্গীত-পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করার মহৎ প্রেরণা পান। আমাদের উচ্চ-সঙ্গীতের মধ্যে একটা অপূর্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধি নিয়ম আপনা থেকেই বিকাশ পেয়েছে এটা তাঁর সজাগ প্রতিভা ও অনুভূতির অন্তর্দৃষ্টি সেদিন ধরতে পেরেছিল ব'লেই তিনি আজ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বৈয়াকরণিক ব'লে গণ্য হয়েছেন।*

এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে বেরিয়ে মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর, রামনাথ, রামেশ্বর, ত্রিচিনপল্লী, মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি নানা শহরে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করেন। সে সব আলাপের তিনি ডায়ারী বরাবর রেখে এসেছেন—এম্‌নিই ছিল তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ!

এই সময়ে তিনি বাংলার একমাত্র সঙ্গীত-গবেষক গীতসূত্রসার ও সেতার শিক্ষা-প্রণেতা মনীষী ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখার সঙ্গে সংস্পর্শে আসেন। তাঁর "গীতসূত্রসার" পড়বার উৎসাহে পণ্ডিতজী হাইকোর্টে এক বাঙালী কেরানীর কাছে প্রতিদিন

---

* কর্ণাটী-সঙ্গীত-অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে আজও এই ৭২টি ঠাট বা মেলকর্তা বিশুদ্ধভাবে তাঁদের রাগাদিতে গেয়ে দেখিয়ে থাকেন। উত্তর ভারতের সঙ্গীতে রাগাদি সম্বন্ধে এরূপ সুসম্বদ্ধ পদ্ধতিতে ঠাট নির্দিষ্টও হয় নি—বা এ বিষয়ে মতৈক্যও পাওয়া যায় না। এ-বিষয়েও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেই প্রথম রাগাদিকে মূলতঃ দশটি মূল ঠাটে ভাগ ক'রে উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারাবদ্ধ করেছেন।

অবসর ম'ত এক ঘণ্টা ক'রে বাংলা পড়তে আরম্ভ করেন। শুধু তাই নয়, বাংলা শেখার পর তিনি সমগ্র "গীতসূত্রসার" মারাঠী ভাষায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। পণ্ডিতজী এখনও শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণাবলী, পাণ্ডিত্য ও সৌজন্যের কথা বলতে বলতে উজিয়ে ওঠেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে কত পত্র লিখেছিলেন ও তাতে কত জ্ঞানগর্ভ কথার আলোচনা করেছিলেন সে সবই তিনি তাঁর হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে পেশ করেছেন।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা থেকে খবর পেয়েই পণ্ডিতজী ৺রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত সম্বন্ধে বইগুলি আনিয়ে পাঠ শেষ করেন ও তার পরে স্থির করেন যে, এরূপ সঙ্গীতোৎসাহী রাজার সঙ্গে তথা বাংলা দেশের গায়কদের সঙ্গেও দেখা করা দরকার। তা ছাড়া ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী বেলবাগকর, বিলায়ত হুসেন, আলি হুসেন, মহম্মদ আলি খাঁ, আশফ আলি, হায়দার খাঁ প্রভৃতির কাছ থেকে হাজার বারশ' ধ্রুপদ ও খেয়াল স্বরলিপি ক'রে শিখে নিয়েছিলেন ব'লে এখন গানের পুঁজিও ছিল তাঁর অপর্যাপ্ত। তাই তিনি স্থির করলেন যে, নানা দেশের গায়কদের সঙ্গেও গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনা করবেন।

পণ্ডিতজি দ্বিতীয়বার ভারত পর্যটনে বাহির হ'ন ১৯০৭ সালে। নাগপুর হ'য়ে কলকাতায় গিয়ে সেখানে রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে তিনি দেখিয়ে দেন যে অনেক রাগেরই ঠাট সম্বন্ধে তিনি সংস্কৃত মূল সঙ্গীত ব্যাকরণাদি থেকে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

বাংলা দেশের গায়কদের মধ্যে পণ্ডীতজী ৺অঘোরনাথ চক্রবর্তী ও ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত অনুরাগী। এঁদের দুজনের কথা বলতে বলতে পণ্ডিতজী উজিয়ে ওঠেন। এবারেও তিনি আমার কাছে কত দুঃখ করেছিলেন যে, ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হ'ল না। বিনয়ী পণ্ডিতজী বলছিলেন, গোঁসাইজী তাঁকে দয়া

ক'রে অনেকগুলি ধ্রুপদ শেখাবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি কত আশা ক'রেছিলেন গোঁসাইজীর কাছ থেকে নানা রত্ন আহরণ করবেন, এরূপ শিক্ষা দিতে উৎসাহী ওস্তাদ আজকাল কত বিরল ইত্যাদি।

কলিকাতায় তাঁর ৺বিশ্বনাথ রাওয়ের সঙ্গে দেখা হয়। রাওসাহেব তাঁকে বলেন যে, এলাহাবাদে তাঁর গুরু প্রিতমলাল গোস্বামীকে দেখলে পণ্ডিতজীর আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে যাবে। এ আশঙ্কায় স্তম্ভিত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাওসাহেব তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন যে গোস্বামী প্রভু রাগের কুণ্ডলী তৈরি ক'রে প্রশান্তভাবে তার ওপরে ব'সে থাকেন। ভাতখণ্ডে আমাকে হেসে বললেন: "কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না বটে রায়মহাশয়, কিন্তু আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। আমি এলাহাবাদ গেলাম শুধু এই কুণ্ডলীকর্তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম, তাতে—" বলতে বলতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসি হেসে "প্রিতমলাল গোস্বামী প্রভু প্রথমে নানারকম লম্বা লম্বা চাল দিতে আরম্ভ করার পর আমি বললাম কুণ্ডলীটি দেখতে চাই। তিনি একটি নক্সা মতন আনতেই আমি দেখলাম যে সেটি আর কিছুই নয় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তক থেকে ছাঁকা রাগরাগিনীর নকল। গোস্বামী প্রভু এ নক্সাটির গোলকধাঁধা দেখিয়ে ৺বিশ্বনাথ, কেরামতুল্লা প্রমুখ তাঁর নিরক্ষর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে এই বলে আতঙ্কে স্তম্ভিত করে রাখতেন যে তিনি রাগরাগিনীর আদি জন্মতত্ত্ব বা 'কুণ্ডলী'র শীর্ষাধিরূঢ় হ'য়ে বিরাজমান।" ব'লে তিনি আবার হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন। সে হাসি আর থামে না। আমি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম:—"তারপর?" ভাতখণ্ডে বললেন: আমার হাতবাক্সে সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও সৌরীন্দ্রমোহনের বইও ছিল। আমি সে সব বের ক'রে গোস্বামীকে দেখালাম যে তিনি এ-দুর্ধর্ষ কুণ্ডলী কোথা হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন, আমি অবাঙালী হয়েও খবর রাখি।" ব'লে আবার হাসি। "তারপর"?—"তারপর আর কি? দেখলাম

লোকটা কিছুই জানে না। শেষটায় আমার সংস্কৃত গ্রন্থাদির ভিতর পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি দেখে আর রাগালোচনা শুনে সে নিজের ভণ্ডামির মুখোস ছেড়ে হাত জোড় ক'রে দাঁড়ালো।" পণ্ডিত ভাতখণ্ডের আলোচনায় প্রায়ই এরূপ সরস পরিহাস বড় চমৎকার ফুটে ওঠে। তবে তাঁর হাসির মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুক ছাড়া ঈর্ষাদ্বেষের লেশও থাকে না ব'লে সে-হাসি সকলের কাছে এত মিষ্টি বোধ হয়। ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক পণ্ডিতজীর বালকের ন্যায় বিমল ও প্রাণখোলা হাসি যে একবার দেখেছে সে আর ভুলতে পারবে না। তাঁর সরল হাসিঠাট্টা সম্বন্ধে পরে লিখছি।

এই সময়ে তিনি কাশীতে শোনেন যে বিকানীরে অনেকগুলি সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ আছে। শোনবামাত্র এ-উৎসাহী চিরতরুণ ঠিক করেন যে বিকানীরে একবার তাঁকে যেতেই হবে। দিল্লীতে ওমরাও খাঁর গান শুনে, লক্ষ্ণৌয়ে কালকাবিন্দার সঙ্গে দেখা ক'রে, গণেশিলাল চৌবের সঙ্গে তর্কালোচনা ক'রে তিনি বিকানীর লাইব্রেরিতে অনেক-গুলি সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। সেখান থেকে উদয়পুরে ৺জাকরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁর সঙ্গে দেখা করে তাদের গান শুনে বম্বে ফেরেন।

ভারতবর্ষে এই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজী বিস্তর অপ্রকাশিত সংস্কৃত সঙ্গীত পাণ্ডুলিপিও সংগ্রহ করেন। এজন্য তাঁকে কতবার যে কত কষ্ট করতে হয়েছে সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই এবিষয়ে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব। তিনি একবার দাক্ষিণাত্যে শোনেন যে সুদূর কাথিওয়াড়ে কোন এক রাজবাড়ীর পুরোহিতের কাছে একটি মূল্যবান সংস্কৃত সঙ্গীত-পাণ্ডুলিপি আছে। পণ্ডিতজী ছুটলেন সেই সুদূর দক্ষিণ থেকে পশ্চিম ভারতে। কিন্তু হায়, এত শ্রমের পর সে পুরোহিতপুঙ্গব বললেন যে, সে-পাণ্ডুলিপি তিনি দেখানে পারেন যদি পণ্ডিতজী সেটি প্রকাশ না করেন। পণ্ডিতজী বললেন :—"আমি সাধারণের

লাভের জন্যইত প্রকাশ করি, সেই জন্যইত সংগ্রহ করে থাকি।” তাতে পুরোহিত প্রভু বললেন :—“তবে আমি সে পাণ্ডুলিপি দেব না।” পণ্ডিতজী শেষটা রাজাকে দিয়ে অনুরোধ করালেন। তখন পুরোহিত ভার্গব বললেন সেটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। অগত্যা পণ্ডিতজী রাজাকে পুরোহিতের নষ্টামির কথা খুলে বল্লেন, তখন রাজার তর্জন গর্জনে পুরোহিত প্রভু বইটি পণ্ডিতজীকে দিলেন কিন্তু এই সর্তে যে তাঁর সপরিবারে কাশী যাওয়া আসার খরচ তাঁকে দিতে হবে। পণ্ডিতজী ১৫০।২০০৲ খরচ করে তাকে সপরিবারে কাশী পাঠিয়ে তবে পাণ্ডুলিপিটি পান ও প্রকাশ করেন, যদিও সে পাণ্ডুলিপির বাজারদর কিছুই ছিল না।

আর একবার পণ্ডিতজী কচ্ছ দেশে এক শেখের কাছে একটি তথ্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপির জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু শেখপ্রভু তাঁকে দূর থেকে দেখেই বইখানি দেখিয়ে ধূলোপায়ে বিদায় দিলেন, একবার বইটি ছুঁতেও দিলেন না, প্রকাশ বা ত দূরের কথা। পণ্ডিতজীকে বড় কমবার এরূপ নিরাশ হ'তে হয়নি। কিন্তু তিনি ছিলেন সেই নাছোড়বন্দ জাতের মানুষ যারা হেরেও হার মানে না, যাদের সম্বন্ধে আপ্তবাক্য বলে : বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ প্রারব্ধমুত্তগুণা ন পুনস্তজন্তি” অর্থাৎ যারা বার বার বাধা পেলেও যা ধরে আর ছাড়ে না।

আমার সামনে সেদিন পূর্বোক্ত বেগম সাহেবা পণ্ডিতজীকে বললেন যে, শেখজি তাঁর অনুরোধে পণ্ডিতজীকে সেই গ্রন্থটি দিতে রাজি হয়েছেন। তাতে পণ্ডিতজী উৎসাহিত হ'য়ে বললেন : “বটে? তবে একদিন আপনার সঙ্গে আবার একবার শেখজির ওখানে যাওয়া যাবে, কি বলেন?” এম্‌নিই নিরভিমান তত্বজিজ্ঞাসু এই জ্ঞানবৃদ্ধ সঙ্গীত-তপস্বী!

আর একবার ইনি বরোদার মহারাণীর সঙ্গে জম্মুর লাইব্রেরিতে “রাগদর্পণ” নামক একটি গ্রন্থের সন্ধানে গিয়েছিলেন, কিন্তু বইটি

ছিল পারস্য ভাষায়; লেখা তাই পণ্ডিতজীকে নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসতে হয়। আমাকে সেদিন এখানে (বম্বেতে) কথাস্থলে বলছিলেন যে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুর নবাবালিকে লিখেছেন, সে-বই খানি কোনও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ লোককে দিয়ে হিন্দীতে অনুবাদ করাতে।

লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার উৎসাহের তাঁর সীমা নেই। কাজেই সমগ্র ভারত ভ্রমণ ও নানা স্থানে নানা শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর তিনি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করবেন স্থির করেন।

এতদর্থে তিনি প্রথমে প্রায় ১৫০।২০০ গানের সম্বন্ধে শ্লোক লিখে "লক্ষ সঙ্গীত" ব'লে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ১৯১০ সালে প্রকাশ করেন। শ্লোকগুলিতে তিনি প্রতি রাগের ঠাট, বাদী, আরোহ, অবরোহ প্রভৃতি লক্ষণ সংক্ষেপে নির্নীত ক'রে দেন। পরে নানা স্বরলিপি পুস্তকে প্রতিরাগের সূচনায় যথাক্রমে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেন। ঐ বৎসরে তিনি মারাঠী ভাষায় তাঁর অক্ষয় কীর্তি "হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত-পদ্ধতি, ১ম ভাগ" (৪০০ পৃষ্ঠার উপর) প্রকাশ করেন। এই বইখানিতে পণ্ডিতজি তাঁর অগাধ জ্ঞান গুরুশিষ্য-সংবাদ ধারায় প্রকাশ ক'রেছেন। তা'তে সব জানিত সঙ্গীত ও রচয়িতারই নামোল্লেখ ও তাঁদের যথাযথ বিচার আছে। এ বইখানি জয়পুরের এক পণ্ডিত হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করছেন। কোনও বাঙালী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে তা'তে বাংলা সঙ্গীত শিক্ষার্থীর মহা উপকার হবে। কেন না, এ বইখানি শিক্ষার্থী ও জ্ঞানান্বেষী উভয়েরই জন্যে লেখা ও নানা ব্যাসকূটই শিক্ষার্থীর মুখে প্রশ্ন হিসাবে সাজানো হয়েছে। তাছাড়া ঐ বৎসরে পণ্ডিতজী "স্বরমেলকলানিধি নামক" একখানি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন।

১৯১১ সালে পণ্ডিতজী "সঙ্গীতসারোদ্ধার," "অষ্টোত্তরশততাল-লক্ষণম্" ও "রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর" নামক তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ

করেন। ১৯১২ সালে "সদ্রাগচন্দ্রোদয়" ও "সঙ্গীতপারিজাত প্রবেশিকা" প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালে "অভিনব তালমঞ্জরী," "চত্বারিংশৎরাগ-নিরূপণম্," "লক্ষণগীতসংগ্রহ" ও "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি ২য় ও ৩য় ভাগ" প্রকাশ করেন। "লক্ষণগীত সংগ্রহে" পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রায় দুই শত লক্ষণগীত প্রকাশ করেন।* ১৯১৭ সালে "সঙ্গীতসুধাকর", ১৯১৮য় "সুগমরাগমালা", "রাগতরঙ্গিনী", "চতুর্দণ্ডী-প্রবেশিকা" ও "হৃদয়কৌতুকপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে "অভিনবরাগমঞ্জরী" ও "অনুপসঙ্গীতবিলাস" প্রকাশিত হয়। তা' ছাড়া বম্বেতে "গীতমালিকা" নামক একটি ত্রৈমাসিকীতে পণ্ডিতজী পাঁচ বৎসরে প্রায় একশত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যার সম্বন্ধে আগেই লিখেছি। স্কুলের ছাত্রেরা বাস্তবিকই চমৎকার গাইতে পারে পণ্ডিতজীর চমৎকার পদ্ধতির গুণে। পণ্ডিতজী নিজে গোয়ালিয়রেরই জনকয়েক রাজকর্মচারীদের শিক্ষা দিয়ে সিন্ধিয়ারাজের আনুকূল্যে তাঁর বিখ্যাত গোয়ালিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আজ ভারতবর্ষে এ-স্কুলটি অদ্বিতীয়। এর পঞ্চবার্ষিক ছাত্রেরা প্রত্যেকে প্রায় পাঁচ শত ধ্রুপদ খেয়াল গাইতে পারে। লক্ষ্ণৌয়ে ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে নিখিলভারত-সঙ্গীত-সম্মেলেন এই স্কুলের কয়েকজন ছাত্র অতি বিশুদ্ধ তানমালায় গান করেছিল। মহারাজ সিন্ধিয়া এ-স্কুলের জন্য পণ্ডিজীকে ৬০০৲ টাকা মাসিক বেতনে গোয়ালিয়রের স্কুলের সর্বাধ্যক্ষ হ'তে অনুরোধ করেন। তা'তে পণ্ডিতজী হেসে বলেন ঃ—"মহারাজ,

---

* লক্ষণগীতগুলি রাগনির্ণয়ার্থক কথাসম্বলিত গান। অর্থাৎ প্রতি রাগের লক্ষণগীতের কথা হচ্ছে সেই রাগের আরোহ অবরোহ বাদী সম্‌বাদীর বর্ণনা। কাজেই একটি লক্ষণগীত শিখলে শুধু সে রাগটি শেখা হয় না, রাগটির বিস্তার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ ক'রে রাখা হয়। যেমন "গাও বাগেসরী মৃদু লগত সুর গ নি কর হর প্রিয়া ঠাট তীবর করত ধ রি।"···ইত্যাদি।

আমি অর্থের লোভে এ কাজ করিনি। তাই বেতন আমি নিতে পারি না। তবে আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি যে বৎসরে তিন চারবার আমি বম্বে থেকে গোয়ালিয়রে এসে স্কুলের কার্য পরিদর্শন ক'রে যাব—কেবল আমাকে যেন ট্রেনভাড়াটি দেওয়া হয়, কারণ আমি দরিদ্র।" সে-প্রতিশ্রুতি তিনি অদ্যাবধি রেখে এসেছেন।

এ-হেন আদর্শবাদী যে-কোনো দেশেরি গৌরব! মহারাষ্ট্রে অন্ততঃ ব্যক্তিগত মহত্ত্বের দিক্ দিয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে কারুর চেয়েই কম মনে করা যায় না—শুধু গবেষক ব'লেই নয়, মানুষ ব'লেও বটে। এ খাঁটি মানুষটির আত্মমর্যাদা ও নিঃস্বার্থতার দীপ্ত বাণী শুনলে জগদ্বিখ্যাত জর্মন সঙ্গীত রচয়িতা বীটোভ্‌নের অনুপম গর্ববাণী মনে পড়ে। তিনি কবি গেটেকে ব'লেছিলেন: "রাজা মহারাজার কাছে তুমি মাথা হেঁট করলে কি ব'লে? যখন তুমি ও আমি একত্রে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলি, রাজারাজড়ারই বরং বোঝা উচিত কারা চলেছে! তারা কী করতে পারে শুনি? বড় জোর পুরস্কার, অর্থ, জায়গীর, রাজসম্মান দিতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব দিতে পারে না।"*

গোয়ালিয়র স্কুলের জন্য পণ্ডিতজীকে বড় কম পরিশ্রম করতে হয়নি। শুধু শিক্ষকদের গড়ে তোলা নয়, ক্লাসে ব্যাখ্যা করতে হয় কোন পদ্ধতিতে রাগসঙ্গীত শেখা সবচেয়ে সহজ। এ জন্যে তাঁকে "ক্রমিক স্বরলিপি পুস্তক" রচনা করতে হয়েছিল। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে পণ্ডিতজী তাঁর অন্যতম অক্ষয় কীর্তি চার ভাগ "হিন্দুস্থানী ক্রমিক পদ্ধতি" প্রকাশ করেন। এই চারভাগে তিনি অন্যূন তিন শো ধ্রুপদ খেয়াল প্রকাশ করেন। অধিকাংশই পুরানো বনিয়াদি ঘরের গান। তা ছাড়া প্রতি রাগের প্রথমেই তার রূপ, আরোহ অবরোহ, বাদী, পকড় প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, এ-স্বরলিপি খুবই সহজ। পণ্ডিতজী আমাকে

* রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত বীটোভ্‌নের জীবনী।

দেখালেন যে এ-পদ্ধতি তিনি প্রায় হুবহু "সঙ্গীত-রত্নাকর" থেকে গ্রহণ করেছেন। সব রকম হিন্দি স্বরলিপির পদ্ধতির মধ্যে বোধ হয় পণ্ডিতজীর স্বরলিপিই শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতজীর ক্রমিক পদ্ধতির তৃতীয় ভাগ পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে ও তা'তে আরও শতাধিক নূতন গান আছে। তা' ছাড়া তাঁর পঞ্চম ভাগে প্রায় আরও তিন চার শো উচ্চাঙ্গের গানের স্বরলিপি ছাপা হ'বে। প্রত্যেক সঙ্গীত শিক্ষার্থীরই (শুধু শিক্ষার্থী নয়, প্রতি সঙ্গীত অধ্যাপকের) কাছে এ চার ভাগ স্বরলিপি যে হবে বহুমূল্য একথা বলাই বাহুল্য।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডের স্বরলিপি পুস্তকের দ্রুত প্রচারে মুসলমান ওস্তাদেরা ঈর্ষান্বিত ও ত্রস্ত হ'য়ে নিন্দাচ্ছলে প্রায়ই বলে থাকেন যে, স্বরলিপি দেখে শিক্ষার্থীর উচ্চ সঙ্গীত শেখা অসম্ভব। কথাটা সত্য। কিন্তু স্বরলিপির মূল উদ্দেশ্যই এঁরা ভুল বোঝেন বা বোঝাবার চেষ্টা করেন। কারণ স্বরলিপি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত শিক্ষার্থীর গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না, স্বরলিপি কেবল গীতজ্ঞ ছাত্রেরই সহায় হ'তে পারে। এই কথাটি না বুঝেই স্বরলিপি বিরাগীরা অনর্থক উষ্মা প্রকাশ ক'রে থাকেন। তবে স্বরলিপির উপকারিতা সম্বন্ধে পরে একটা প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখার ইচ্ছা আছে ব'লে আজ আপাততঃ এইটুকু ব'লেই থামি যে, আমাদের সঙ্গীতে স্বরলিপির উপকারিতা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অনুরূপ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গানশিক্ষার সুবিধার জন্যে, তথাশিক্ষিত গায়কের স্মৃতিশক্তির সহায় হিসেবে সঙ্গীত স্বরলিপির স্থান আছেই আছে।* তবে কেন সে-স্থানকে খুব বড় ক'রে দেখা উচিত নয়, সে সম্বন্ধে পরে লেখার ইচ্ছে রইল।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ১৯১২ সালে ফিলহার্মনিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা

* আমাদের সঙ্গীতে স্বরলিপির সঙ্কেতবাহুল্য কি কি কারণে নিরর্থক সে সম্বন্ধে ১৯২৪ সালে বোধ হয় নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসের Modern Reveiw-এ শ্রীযুক্ত ফাডকের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করেন ও ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা গ্রন্থের প্রণেতা ক্লেমেণ্ট সাহেবকে সভাপতি করেন। তার পরে নানা কারণে সাহেব পণ্ডিতজীর শত্রুতাচরণ করতে সুরু করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কী উপায়ে বরোদায় ১৯১৬ সালে প্রথম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ডেকে উদয়পুরের সভাগায়ক বিখ্যাত জাফরুদ্দীন খাঁর সাহায্যে সাহেবপুঙ্গবের মতামত খণ্ডন করেন, সে সব বিবরণ বাহুল্য ভয়ে লিখলাম না। * এখানে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে তিনি খানিকটা বাধ্য হ'য়েই সাহেবকে সে-সভায় অপদস্ত করেছিলেন, কারণ নৈলে সাহেব সঙ্গীতানভিজ্ঞ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নানা স্কুল কলেজে তাঁর শ্রুতিকণ্টকিত হার্মোনিয়ম প্রচলিত করতেন। এ-ঘোর অপচেষ্টায় কৃতকার্য হ'লে যে সাহেবপুঙ্গব আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের মহাক্ষতি সাধন করতেন এ বিষয়ে সুধীজনের মধ্যে মতভেদ নেই। সুতরাং এ জন্যেও উচ্চ সঙ্গীতানুরাগীদের সকলেরই পণ্ডিতজীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তা ছাড়া হাল আমলে সেই থেকে ফি বছর একা পণ্ডিতজীই নিখিল-ভারত সম্মেলন ডেকে আসছেন। তিনিই আমাদের দেশে প্রথম সঙ্গীত সম্মেলনের পুরোহিত ও তার পরে দিল্লীতে, কাশীতে ও লক্ষ্ণৌয়ের সম্মেলনের প্রধান কর্মকর্তা।

পণ্ডিতজী আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে-অক্লান্ত নিষ্ঠায় ভারতীয় সঙ্গীতের সেবা ক'রে এসেছেন, সেজন্যে তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে সত্যই ভাষা নেই একথা যিনিই তাঁর সঙ্গীতে নানামুখী সেবার খবর রাখেন তিনিই স্বীকার করবেন। সঙ্গীতের এই একান্ত উপাসকটি যৌবনেই সঙ্কল্প ক'রেছিলেন যে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ওকালতি থেকে যৎসামান্য কিছু সঞ্চয় ক'রে নিয়ে বাকি জীবন সঙ্গীত-সাধনায় নিয়োগ করবেন। জীবনের প্রভাতে কত আদর্শপন্থী

* ১৯১৬ সালের বরোদা সম্মেলনের রিপোর্টে পূর্ণ কাহিনী দ্রষ্টব্য

যুবকই না মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে তীর্থযাত্রা সুরু ক'রে থাকেন—তাঁদের কজন জীবনসন্ধ্যায় লক্ষ্যে পৌঁছন? বড় হ'তে হ'লে শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলে না—"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—বড় সার্থকতার পথ আগলে থাকে অন্তহীন বাধা। শুধু নিষ্ঠায় এসব বাধা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাই তো পণ্ডিতজীর বিরল নিষ্ঠার কথা ভেবে মন ভ'রে ওঠে, জীবনের লক্ষ অকরুণ বাধাবিপত্তিকে যিনি জয় করেন সারা জীবন একলা চ'লে, প্রণাম করতে ইচ্ছা হয় তাঁর দুর্দম অধ্যবসায়কে।

তারি নাম প্রকৃত বীরত্ব যা মানুষের জীবনের দুর্বহ বিয়োগ ও গভীর নিরাশাকেও পরিশুদ্ধির আগুনে রূপান্তরিত করবার শক্তি ধরে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের জীবন এই বীরত্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। এখনও তিনি লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতাদির স্বরলিপি প্রকাশার্থে জয়পুর, রামপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি পর্যটন ক'রে বেড়ান, যেন এ অদ্ভুত বৃদ্ধের জীবনে বিশ্রামের কোনও দাবি-দাওয়াই নেই। এখনও ইনি বম্বেতে বিনা পারিশ্রমিকে দুটি স্কুলে সঙ্গীত অধ্যাপনা করেন ও নানাস্থানে অপূর্ব সরস ও জ্ঞানগর্ভ লেক্‌চার দিয়ে বেড়ান। তাঁর জীবনে জলঝড় যথেষ্ট ব'য়ে গেছে কিন্তু প্রতি বিপদ-আপদকেই তিনি গ্রহণ করেছেন এক অপরূপ আত্মসমাহিত ভঙ্গিতে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেই। তিনি আজকাল কানে একটু কম শোনেন। সঙ্গীতানুরাগীর পক্ষে এ দুঃখ যে কী তীব্র সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পণ্ডিতজী একদিন আমায় হেসে বল্‌লেন: "এতে এখন আমার আর তত দুঃখ নেই। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ত পৌঁছন গেছে, ব্রতও প্রায় সারা হ'য়েছে। এখন যে-কয়টা বৎসর বাঁচি তার জন্য যেটুকু শুনতে পাই তাই যথেষ্ট। আর বৎসর কয়েক বাদে যখন প্রকৃতির কোনও পরিচিত মধুর ধ্বনিই শুনতে পাব না—তখন আশা করি আমার বাকী কাজের হিসেব নিকেশেরও অবসান হবে। তাই এতে আমার দুঃখ নেই।" আর একদিন আমায় বলেছিলেন: "লক্ষ্ণৌয়ের গভর্ণর লক্ষ্ণৌয়ে

অবিলম্বে সঙ্গীতের কলেজ স্থাপন করতে চান। আমি সেখানে লিখেছি, এ-কলেজটি ঝটিতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। নৈলে আমার যেটুকু শক্তি এখনো আছে সেটুকু দেশের কাজে আসবে না। তাই আমি চাই যে এ-কাজ তাড়াতাড়ি সুরু হ'য়ে যাক্। আমি লিখে দিয়েছি যে, আমি ফি বছর ছয় মাস লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে থেকে কলেজের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি, কন্সার্ট দেওয়ার রীতি, ওস্তাদ সংগ্রহ, তাঁদের শিক্ষকরূপে পরিণত করা প্রভৃতি নানা কাজের ভার গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু দেরি হ'লে আমার বড় আক্ষেপ থেকে যাবে যে আমার জীবনব্যাপী চেষ্টা ও সাধনার অর্ঘ আমি আমার শেষ বয়সে দেশের সেবায় লাগাতে পারব না।" এ কথায় আমি দুঃখিত হ'য়ে পণ্ডিতজীর দীর্ঘজীবন কামনা করতেই তিনি প্রশান্তভাবে মাথা নেড়ে হেসে বললেন: "না না রায় মহাশয়, আমার আর ক'দিন? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমাদের দেশে ৬৫ বৎসর বয়স অবধি আমি বাঁচতে পেরেছি, আর কতদিন বাঁচব তোমরা আশা কর? আর বড় জোর দু'তিন বৎসর। তাই তার আগে আমার শেষ কাজটুকু সমাপ্ত ক'রে যেতে চাই।" সেদিন এ নিঃসঙ্গ তেজস্বী মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে করতে কেবলই মনে হচ্ছিল বেগম সাহেবার কথা: "পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ভারতীয় সঙ্গীতে মহাত্মা গান্ধী।" সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ইংরাজি উদ্ধৃতি মনে ওঠে গুণগুণিয়ে: "The world often knows not its greatest men."

* * *

পণ্ডিতজির সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় ১৯২৭ সালে জানুয়ারি মাসে—লক্ষ্ণৌয়ে।* তখন আমি সেখানে রোজ সকালে শ্রীকৃষ্ণ

* পণ্ডিতজি সম্বন্ধে শেষের এই কয়টি পাতা পরে আমার "আবার ভ্রাম্যমাণ"-এ বেরিয়েছিল। সেটি এখানেই সুপ্রযুক্ত হবে ব'লে উপসংহার হিসেবে এখানেই জুড়ে দিলাম।

রতনজনকরের সঙ্গে যেতাম কদরপিয়ার নাতি নবাব নুরুদ্ধের মির্জা সাহেবের কাছে ঠুংরি শিখতে। সে-সময়ে পণ্ডিতজির বহুদিনের স্বপ্ন সফল হয়েছে: লক্ষ্ণৌয়ে সরকারী আনুকূল্যে Maris College of Music প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণর পরিচালনায়। এই কলেজে প্রায়ই পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা হ'ত কলেজের একটি আসবাবহীন কক্ষে। পণ্ডিতজি এই কক্ষে সন্ন্যাসীর মতই থাকতেন কলেজ পরিদর্শন করতে এসে। তাঁর সঙ্গসুখে জ্ঞান, আনন্দ ও হাসির অফুরন্ত খোরাক পেয়ে কী আনন্দেই যে কাল কাটত! শুধু আনন্দই না—তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল যেন একটা দীক্ষা: নিষ্ঠার। মনে হ'ত আমাদের —বাঙালীর—মধ্যে যদি এ-চারিত্রশক্তির প্রাদুর্ভাব একটু বেশি হ'ত তবে সঙ্গীতে বাঙালী কী না করতে পারত? যদি বাঙালীর বহুমুখী কল্পনার সঙ্গে যোগ দিত মারাঠির অপরাজেয় তপঃশক্তি—কিন্তু থাক্ এ যদি-র পালা। কবির কথা মনে হ'লে দুঃখ বাড়ে বই কমে না— "Of all the sad thoughts the saddest is: what might have been!"

সঙ্গীতবিদ্যালয়ের দোতলার এক কোণের রিক্ত ঘরটিতে তাঁর সঙ্গে আমার যতবারই দেখা হ'ত মনে হত—কোথায় এ-ব্রাহ্মণের গৃহ সুদূর বম্বেতে, আর কোথায় তিনি বাড়িঘর ছেড়ে লক্ষ্ণৌয়ের দারুণ শীতে একটি সামান্য সতরঞ্চির উপর ব'সে কথা কইছেন, গান শেখাচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন দিনের পর দিন। কেন? না লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত-কলেজের বনেদটি গেঁথে দিতে। সঙ্গীতের প্রতি এহেন প্রেম ক'জনের মধ্যেই বা দেখেছি?

এ-বৎসর যেদিন পণ্ডিতজির সঙ্গে এই ঘরটিতে আমার প্রথম দেখা হয় সেদিন তিনি গোয়ালিয়র থেকে সোজা আসছেন। ফি বছর দুবার ক'রে তাঁকে যেতে হয় সেখানে তাঁর নিজের-হাতে-গড়া সাধের সঙ্গীতবিদ্যালয়টির তত্ত্বাবধান করতে। এ-কাজ তিনি বরাবরই ক'রে এসেছেন সিন্ধিয়ারাজের কাছ থেকে দক্ষিণা না নিয়ে। চাইলে

পেতেন মোটা টাকাই—কিন্তু এ হ'ল তাঁর প্রেমের কাজ—labour of love, বলতেন তিনি। তাই নিতেন শুধু ট্রেনভাড়া—কারণ তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল বলতে যা বলে তা নয়—চ'লে যায়—অল্প কিছু টাকা জমিয়েছিলেন তাই থেকে। সাঙ্গীতিক যেসব বই তিনি প্রকাশ করেছেন সেসব থেকেও তিনি লাভের অংশ নেন না—বইগুলির দাম এত সস্তা করেছেন যাতে খরচটা উঠে যায়। জানতে ইচ্ছা হয় এ-বৈশ্যযুগে এহেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থকার কজন আছেন—যিনি বলতে পারেন জ্ঞান তাঁর বিকিকিনির সামগ্রী নয়—আদরের বস্তু, আর আদরের বস্তু ব'লেই দানেই তার চরম সার্থকতা।

গোয়ালিয়র স্কুল সঙ্গীতজগতে একটি আবির্ভাব। একাই তিনি এ-স্কুলটির গোড়াপত্তন করেন—তার শিক্ষকদের পর্যন্ত তৈরি ক'রে নিয়ে। প্রথমে দুচারটি গায়ক ও বাদককে হাতে নেন ও তাঁর স্বকীয় পদ্ধতিতে শিখিয়ে পড়িয়ে গ'ড়ে তোলেন অক্লান্ত চেষ্টায়। অদ্ভুত তাঁর মনীষা ও শিক্ষাপদ্ধতি—তাই কয়েক মাসেই শিক্ষক-সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজও হ'ল না। বাঙালি দলাদলিতেই অস্থির, দশে মিলে একটা বড় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবে কেমন ক'রে? থাক্। পণ্ডিতজির কথাই বলি।

পুনা ও বম্বেতেও তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় দুএকটি বিদ্যালয়ে। এতদিনে লক্ষ্ণৌয়ে হ'ল। কলকাতায় হবে কবে? কবে কলকাতায়ও আমরা শুনতে পাব রাগসঙ্গীতের এই ধরণের সুচারু অধ্যাপনা, দেখতে পাব নবদীক্ষিত প্রতিভার অভ্যুদয়? গোয়ালিয়রে পণ্ডিতজির প্রতিষ্ঠিত স্কুলের তরুণ ছাত্রদের মধ্যেও যে-অসামান্য গীতিনৈপুণ্য মমকে চমকে দেয় সে-নৈপুণ্য বাঙালীর কি নেই? অবশ্য আছে। কিন্তু তাকে গ'ড়ে তুলবে কে? বাঙালীর মধ্যে কোথায় পণ্ডিতজির মতন বৈয়াকরণিক, শিক্ষাদাতা তথা দীক্ষাগুরু?

আমাদের সঙ্গীত হাল আমলে অশিক্ষিত ওস্তাদদের হাতে প'ড়ে যে দুর্গতির কোন্ রসাতলে পৌঁছেছে অনেকেই জানেন আজকের

দিনে। কিন্তু কী ক'রে হ'ল এ-দুর্দশা অনেকেই রাখেন না সে-খবর। এই খবরটুকুর ছবিই আজ খানিকটা সাংবাদিক তথা চিত্রীর মতন আমি ধরব বাংলার সঙ্গীতজিজ্ঞাসুদের কাছে। পণ্ডিতজির মুখের কথা উদ্ধৃত করলে ছবিটা সব চেয়ে সহজে ফুটে উঠবে ব'লেই আজ কলম ধরেছি। তিনি যা যা বললেন টুকে রেখেছিলাম তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরেই। কথাবার্তা হয়েছিল ইংরাজিতে। এখানে দেব তার তর্জমা।

* * *

পণ্ডিতজির কাছে একাধিকবার শুনেছি; সেদিনও শুনলাম: "দিলীপ, যদি তুমি কোনো ওস্তাদকে সুরট গাইতে বলো তো তিনি ভুল ক'রে দেশ গাইবেন। দেশ গাইতে বললে সুরট গাইবেন। কিন্তু যদি দেশ গাওয়ার পর বলো—'এবার সুরট শোনান তো ওস্তাদজি'—তবে সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে তিনি বলবেন: 'ঔর এক রোজ গাউঙ্গা'।" ব'লেই সে কী হাসি! সরল বালকের হাসি—বিদ্রূপের আঁচ নেই সেখানে, শুধুই কৌতুকের স্বচ্ছ ধারা।

আমি: বলেন কি পণ্ডিতজি? বড় বড় ওস্তাদেরা যদি দেশ সুরটের প্রভেদ না জানেন তবে জানবে কে?

পণ্ডিতজি (হেসে): আমি সারা ভারতবর্ষটা ঘুরে বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে মোকাবিলা ক'রে তবে বলছি একথা দিলীপ। তাই তো রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ আমাকে রচনা করতে হ'ল—ওস্তাদরা স্বরলিপির ধার ধারেন না, রাগসঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধার পাশ দিয়েও যান না ব'লে। আমি অনেকবার কনফারেন্সে তাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়েছি তাঁদের এজাহার—একের পর এক। তাই আমি ঠেকে শিখেছি, যে খুব কম ওস্তাদেই জানেন—কী ক'রে সদৃশ রাগ-গুলির রূপভেদ হয় ও কেন সূক্ষ্ম রূপান্তরে রসের যুগান্তর হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি: খুব কম ওস্তাদেই খবর রাখেন তাঁরা

যে-সব রাগ গাইছেন তাতে কোন্ কোন্ পর্দা লাগছে কি ভাবে। ধরো, একজন অলহৈয়া রাগ গাইলেন, তুমি জিজ্ঞাসা করলে—এতে কোমল নি লাগছে কি না। ওস্তাদজি হয়ত বললেন : 'না'। তুমি তখন বললে : 'সে কি ওস্তাদজি ? লাগছে যে !' অমনি ওস্তাদজি মাথা চুলকে ব'লে বসবেন : 'হো সকতা সাব ! ময় ফির গাতা হুঁ —আপ দেখ লিজিয়ে কোমল নিখাদ লাগতা কি নহি।'

আমি : এমন ওস্তাদরা বড় গাইয়ে হবেন কেমন ক'রে ?

পণ্ডিতজি : কেন হবেন না ? রেয়াজ। অসাধারণ তাঁদের সাধনা। আশৈশব ঐ-ই করছেন তো। গলা একেবারে পোষ মেনে গেছে— যা হুকুম করছ তামিল করবে। যেখানে ইচ্ছে চালাও চলবে, থামাও থামবে। শুনে শুনে ছাপ ব'সে গেছে—সব জড়িয়ে। কিন্তু তাব'লে বিশ্লেষণের কিছুই জানেন না—কারণ স্বরলিপিজ্ঞান নেই। বুঝলে না ? অবিশ্যি হুএকজন ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিতে হবে—যেমন উদয়পুরের ওস্তাদ জাকরউদ্দিন।

আমি : কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে না কি যে যদি বিশ্লেষণ বা স্বরলিপি না জেনেও ভালো গাওয়া যায় তবে কী দরকার এত শত গবেষণার ?

পণ্ডিতজি : ভালো গাওয়া যার একমাত্র আদর্শ তার বিশ্লেষণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলে। কিন্তু যদি সহজে অপরকে নিজের শিক্ষার ফল দিতে চাই তাহ'লে স্বরজ্ঞানের কাছে হাত পাততেই হবে। এতে ক'রে যে কতখানি শ্রম লাঘব হয় তা স্কুল করতে গিয়ে আমি চাক্ষুষ করেছি। তুমি আমার গোয়ালিয়র স্কুলের বালক ছাত্রদের দেখ নি কি যারা একশো দেড়শো খেয়াল নির্ভুল গাইতে পারে ? কেউ কোনো গান গাইলে খুব কঠিন না হ'লে তারা তখনি তখনি স্বরলিপিতে তুলে নিতে শিখেছে। অবিশ্যি ওস্তাদেরাও শেখান কিন্তু তাতে দেরি হয় শিখতে। এযুগে মানুষের সময় ক'মে এসেছে। গান শিখতে যারা আসে তাদের প্রায়ই পড়াশুনোও করতে হয়। কাজেই দীর্ঘকাল

ধরে ওস্তাদি পদ্ধতিতে গান শিখবে তারা কেমন করে বলো দেখি? ওস্তাদদের কণ্ঠসাধনা ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজ ছিল না—কিন্তু আমাদের, মানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের তো আছে আরো অনেক কাজ।

আমি: আপনার এখানকার স্কুলে গান শেখানো চলছে কেমন?

পণ্ডিতজি: ছাত্র অনেক পেয়েছি, তারা খাটিয়েও বটে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি, তারা প্রায় সকলেই কলেজের ছাত্র—কেউ এক বছর, কেউ দু বছর, কেউ বড় জোর তিন বছর থাকবে। কাজেই তাদের দিয়ে বেশি ফল পাওয়ার আশা দুরাশা। গোয়ালিয়রে আমার স্কুলে আজ দুশো ছেলে গানবাজনা শেখে। তারা প্রায় সবাই স্কুলের ছেলে, কাজেই তাদের আমি পাই পুরো পাঁচটা বছর। পাঁচ বছর শেখানোই চাই, তার কমে হয় না।

আমি: কিন্তু তাহ'লে এখানে উপায়?

পণ্ডিতজি (চিন্তিত): উপায়?....আমি এখানকার সব স্কুলের হেডমাস্টারদের অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছি—প্রতি ক্লাসের কয়েকজন ক'রে ছেলে পাঠাতে। তাদের মধ্যে কয়েকটিকে আমরা বেছে নেব পরীক্ষা ক'রে। এখানকার অনেকগুলি তালুকদারকেও ধরেছি—তাঁরা ফি তালুক থেকে যেন দুএকজন ক'রে সঙ্গীতপটু বালককে স্কলার্শিপ দিয়ে এখানে পাঠান।

আমি: তাদের থাকার ব্যবস্থা?

পণ্ডিতজি: কাছে একটা বোর্ডিং করব ঠিক করেছি। সেখানে আমাদের এই কলেজেরই কোনো অধ্যাপককে পরিদর্শক বাহাল করব। দেখি এ-প্রস্তাবে তালুকদাররা রাজি হন কি না।

আমি: রাজি হবেন না কেন?

পণ্ডিতজি: বলা যায় না। অনেকখানি নির্ভর করছে আমাদের এডুকেশন মিনিস্টর রাজেশ্বর বালি সাহেবের এবারকার ইলেকশনে

জয়ী হওয়ার উপর। যদি হন তবে তিনি আমাদের সঙ্গীত কলেজের অনেক আনুকূল্য করবেন বলেছেন। তাই আমরা অষ্টপ্রহর প্রার্থনা করছি যাতে বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁর বাঞ্ছা পূর্ণ করেন—হা হা হা।

শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরও খুব হেসে উঠলেন।

আমি (হেসে): বালি সাহেব আপনাদের অধ্যাপক জোগানোর বন্দোবস্ত করেছেন কেমন?

পণ্ডিতজি: আপাতত দুজন মুসলমান ওস্তাদ বাহাল হয়েছে, এছাড়া আমার ছাত্র দুটি—রতনজনকর ও নাথু।

আমি: কিন্তু এ কয়জনই তো খেয়ালি—ধ্রুপদ শেখানোর কী হবে?

পণ্ডিতজি (বিষণ্ণসুরে): ঐখানেই তো মুস্কিলে পড়েছি দিলীপ। ধ্রুপদ যে লোপ পেয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম বাংলাদেশ থেকে কোনো ধ্রুপদীকে আনাব। কিন্তু গোঁসাইজির (৺রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী) দেহান্তের ফলে মহা বিপন্ন হ'য়ে পড়েছি সত্যি। তাঁর পরে আর কোনো সত্যিকার বড় ধ্রুপদী আছে কি বাংলাদেশে?

আমি: কই, দেখতে তো পাই নে।

পণ্ডিতজি: সেই তো গোল। কী যে করি! লাহোরে একজন মৌলাবক্স ছিলেন কিন্তু মাস তিনেক হ'ল তিনিও গতাসু হয়েছেন।

আমি: ইন্দোর থেকে আল্লাবক্সের ছেলে সঙ্গীতরত্ন নাসিরুদ্দিনকে আনানো যায় না?

পণ্ডিতজি (হেসে): সে-রত্নটিকে আনতে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনবে? তিনি ব'লে পাঠালেন—আমার নিমন্ত্রণে তিনি তো আসতে পারেনই না, আমাদের এডুকেশন মিনিস্টরও তাঁর যোগ্য নিমন্ত্রণকর্তা নন—তবে যদি ইন্দোরের পোলিটিক্যাল এজেন্টকে লাট সাহেব নিজে বলেন

তবে তিনি বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন—হা হা হা।—আরো আছে—হাসির এখনি হয়েছি কী? তিনি আমাকে এ-ও বেশ প্রাঞ্জল ভাষায়ই জানিয়ে দিয়েছেন যে যদি তিনি আসেনই তাহ'লেও সাবধান, —কারণ তিনি কোনো চল্‌তি মতামতই মানবেন না, কোনো ছাপা বইয়েরই ধার ধারবেন না, কোনো স্বীকৃত পদ্ধতিই স্বীকার করবেন না, কোনো রাগই শেখাবেন না কোনো দস্তুর মেনে—ধরো হ'ল তাঁর মর্জি তো একটা রাগই শিখিয়ে যাবেন তাঁর যতদিন ইচ্ছে তাতে শিক্ষার্থীর উদরাময়ই হোক কি অনিদ্রাই আসুক।

আমি: মানে আপনার পদ্ধতিকেই তিনি বাণ হেনেছেন এই তো?

পণ্ডিতজি: তা তো বটেই—কিন্তু তাতে আমার খেদ নেই—আমার দুঃখ এই যে যে-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছি আমি সমস্ত জীবনের সঞ্চিত সাধনায় সে-পদ্ধতি সম্বন্ধে রাম শ্যাম যদু হরি যে-কেউ মত দেবে আর লোকে মন দিয়ে শুনবে? সমালোচনার নামে যে যা ইচ্ছে তা-ই বলবে?

আমি: কি রকম?

পণ্ডিতজি: শোনো তাহ'লে। এবারে গোয়ালিয়রে এক পণ্ডিতা বেগম সাহেবার অভ্যুদয় হ'ল হঠাৎ। তিনি বললেন: 'পণ্ডিতজি, আপনার এই সব ক্লাস ট্লাস ক'রে সকলকেই এক ধরণের একমাটা শিক্ষা দেওয়াটা বেবাক্ ফাঁকা।' আমি তাতে কী ধরণের শিক্ষা বিল্‌কুল নিরেট জানতে চাইলাম। বেগম সাহেবা বললেন একগাল হেসে: 'খুবই সোজা। ধরুন সকলেই কিছু একাধারে ধ্রুপদী খেয়ালী ও টপ্পী হবে না, বটে তো? কারুর কারুর গলা ধ্রুপদের, কারুর বা খেয়ালের, কারুর টপ্পা ঠুংরির গলা। তাই যথার্থ শিক্ষক বলব তাঁকেই যিনি প্রতি শিক্ষার্থীর স্বাধিকার এঁচে নিয়ে সেই অনুসারে হয় ধ্রুপদ, নয় খেয়াল, নয় টপ্পা ঠুংরিতে তালিম দেবে প্রথম থেকেই। বুঝলেন তো কেমন পরিষ্কার আইডিয়া?' আমি বললাম:

'মাফ করবেন বেগম সাহেবা, আইডিয়াটি শুনতে যত পরিষ্কার, চোখ চেয়ে পরীক্ষা করতে গেলে হয়ত তার চেয়ে একটু ঝাপসা ঠেকবে। চলুন এক্ষনি আপনি আমার ইস্কুলে। সেখানে মাত্র দশটি ছেলে আপনার সাম্‌নে ধ'রে দেব। আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না শুধু বাৎলে দেওয়া ছাড়া কার গলা ধ্রুপদের ছাঁচে ঢালা, কার গলা খেয়ালের, কার টপ্পাঠুংরির।—চলুন না।' বেগম সাহেবা আমার তৎপরতা দেখে একটু থতমত খেয়ে বললেন: 'একবার মাত্র শুনে আমি কেমন ক'রে রায় দেব কোন্ ছেলেটির গলা কোন্ ঢঙের গানের জন্যে উপযোগী?' আমি বললাম: 'একবার কেন? পাঁচশো সাড়ে সাতাত্তর বার শুনুন না'—হা হা হা হা।

আমরাও যোগ দিলাম হাসিতে। হাসি থামলে পণ্ডিতজি বললেন: "এই কথাটা আমাদের দেশে আমরা প্রায়ই ভুলে যাই দেখবে—বিশেষ ক'রে গানটান শেখানোর বেলায়—যে বাইরে থেকে তীরন্দাজি করা যত সহজ কার্যক্ষেত্রে নেমে গ'ড়ে তোলা ঠিক ততটা সহজ নয়। তাই তো আমার গান শেখানোর পদ্ধতির এত অপযশ ওস্তাদমহলে।" ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে গেলেন: "কিন্তু বেগম সাহেবার ইঙ্গিতটি একেবারে অসার বললেও সত্যের অপলাপ হবে। কারণ একথা অসত্য নয় যে কারুর কারুর গলা বিশেষ শ্রেণীর গানে খোলে। আমার বক্তব্য এই যে কার গলা কোন্ ঢঙের গানে খুলবে সেটা প্রথমেই ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব—সেটা ধরা যায় কখন? না, যখন কণ্ঠের পার্সনালিটির বিকাশ হয়—তার আগে নয়। কিন্তু তা যতদিন না হচ্ছে ততদিন কোনো একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে প্রতি শিক্ষার্থীর গোড়ার গাঁথুনিটা পাকা ক'রে দেওয়া যেতে পারে মাত্র—এর বেশি কিছু করা অসম্ভব, শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়, প্রতিভার সৃষ্টি করা যায় না। তাই আমি চাই যে ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই প্রতি বালককে পাঁচ বৎসরে আমি শিখিয়ে দেব:—

(১) স্বরজ্ঞান, যাতে ক'রে সে যা গাইবে তার রূপ রস ঠাট ঠমক

সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে উঠবে ; (২) ধ্রুপদ ও খেয়ালের তিন চারশো শ্রেষ্ঠ ঢঙের গান, যাতে ক'রে গানে ঢঙ সম্বন্ধে তাদের রুচি গ'ড়ে উঠবে ঠিক পথে ; (৩) গানে লয়ের তাৎপর্য ও তার স্থান।

আমি : কিন্তু আলাপের বেলা? অনেকে অনুযোগ করে এখানে আলাপ শেখানো হয় না।

পণ্ডিতজি : আলাপের আমি বিরোধী নই। জানো তো উদয়পুরের বিখ্যাত 'আলাপী' জাকরুদ্দিন খাঁর আমি কি রকম ভক্ত। আমি বলতে চাই—প্রথম থেকেই আলাপ শিখিয়ে শিক্ষার্থীকে সুরের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা যায় না। আলাপ আয়ত্ত হ'তে সময় লাগে—আলাপে রসসৃষ্টি করতে পারা যায় তখনই যখন রাগের সমগ্র চলনটা চিত্তপটে একেবারে আঁকা হ'য়ে যায় তার বহুবিধ গতিভঙ্গির পরিচয় পেতে পেতে। আমার প্রধান কাজ হ'ল উচ্চ সঙ্গীতের বহুপ্রচার। একদিন সে-সঙ্গীত ছিল রাজসভার পর্দানসীনা—আমি চাই তাকে জনসভার নিত্যসঙ্গিনী করতে। অসূর্যম্পশ্যরূপা হ'লে নারীর গৌরব বাড়ে কি না জানি না—কিন্তু সঙ্গীতের যে সর্বনাশ হয় এটা জানি।

আমি : কিন্তু মাফ করবেন পণ্ডিতজি, উচ্চসঙ্গীত তো সকলেই এখনি বুঝতে পারবে না। তার রসগ্রহণ করতে হ'লেও কিছু সাধনা তো চাই-ই চাই?

পণ্ডিতজি : মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তো সত্যি যে অনেক সঙ্গীতপ্রিয় লোক আছেন যাঁরা উচ্চ সঙ্গীতের দেখা পেতে চান অথচ পান না, কালোয়াতির লম্ফঝম্ফের দেয়ালে ঘা খেয়ে কেঁদে ফিরে আসেন বলতে বলতে যে বীণাপাণি তাঁদের জন্যে উচ্চসঙ্গীত সৃষ্টি করেন নি—বৃথা চেষ্টা। আমি চাই উচ্চসঙ্গীতের দুয়ার খুলে দিতে—তাকে বিলিয়ে দিতে—শুধু সুমার্জিত সমজদারদের দরবারেই নয়—অশিক্ষিত শ্রুতিহীনদের বারোয়ারিতেও হোক তার গতিবিধি। এরা হয়ত প্রথমে এ-সঙ্গীতকে অনাদর করবে। করলই বা। তবু

শুনতে তো পাবে। আর কেবল শুনতে শুনতেই রুচি তৈরি হয়। ভালোকে ভালো ব'লে চেনা শক্ত, কিন্তু ভালোর পরিচয় না পাওয়া শোচনীয়। কেন না যারা এ-পরিচয় পায় না তারা সুরুচির আনন্দ-রসও পায় না। তাই আমি এখানকার কলেজে প্রতি শনিবারে সন্ধ্যায় demonstration class খুলেছি যাতে সবাই সেখানে আসতে পারে নাথু রতনজনকরের গান শুনতে। প্রথম প্রথম লোক হ'ত না তেমন। কিন্তু একদিন তুমি এসো—দেখো ক্রমশ কেমন ভিড় জমছে।

* * *

পরদিন সকালে আবার গেলাম পণ্ডিতজির কাছে। সঙ্গে ছিল বন্ধু ধূর্জটি—সঙ্গীতের খ্যাতনামা সমজদার। ঘরের মধ্যে পণ্ডিতজি একটি সঙ্গীতকল্পদ্রুম পড়ছিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর প্রসাধন করছিল ঠুংরি শিখতে বেরুবে ব'লে।

পণ্ডিতজি আমাদের দেখেই তাঁর প্রাণখোলা প্রভাতী হাসি হেসে বললেন: এসে দিলীপ। বসুন প্রফেসর মুখার্জি।

ধূর্জটি: আমাকে আর প্রফেসর ব'লে লজ্জা দেন কেন, পণ্ডিতজি?

পণ্ডিতজি: সে কি কথা? বাঃ। প্রফেসরকে প্রফেসর না বললে নামের ডিগনিটি থাকবে কেন? হা হা হা হা।

আমি (ব'সে): পণ্ডিতজি, কাল আপনার সঙ্গে আমার কথা-বার্তা বাড়ি গিয়েই লিখে ফেললাম—"উত্তরা"য় ছাপাতে চাই আপনার অনুমতি হ'লে।

পণ্ডিতজি: আমার আবার কথা—তা আবার ছাপানো। তুমি আমাকে এত বাড়াও দিলীপ যে—

আমি (বাধা দিয়ে): সে আমাদের বিবেচ্য পণ্ডিতজি। আমি কাল ধূর্জটির কাছে বলছিলাম আপনার সঙ্গে কি কি কথা হ'ল।

বলছিলাম গোয়ালিয়রে এবার ওম্‌রাও খাঁর খেয়াল শুনে আপনি খুব খুসি।

পণ্ডিতজি (ধূর্জটিকে): সেখানে এবারে এক বাইজির গান শুনেও ভারি তৃপ্তি পেয়েছি।

ধূর্জটি: কে পণ্ডিতজি?

পণ্ডিতজি: একজন নতুন বাই। ছশো টাকা ক'রে মাইনে পান, সিন্ধিয়ার সভা থেকে। ইন্দর বাই বুঝি তার নাম।

ধূর্জটি: ইন্দর বাই! শুনেছি তাঁর নাম। দিলীপ ওর গানের বই "ভ্রাম্যমাণে" খুব সুখ্যাতি করেছে তাঁর। শুধু খেয়ালের নয়—ঠুংরি গজলেরও।

পণ্ডিতজি: তাই নাকি? তা ইন্দর বাই খাসা গায় ঠুংরি।

আমি: ঠুংরি কি আপনি পছন্দ করেন সত্যিই?

পণ্ডিতজি: নিশ্চয়ই—যদি ভালো ক'রে গাওয়া হয় অবিশ্যি। তাই তো আমাদেব কলেজে আমি ঠুংরি শেখানোরও ব্যবস্থা করেছি।

ধূর্জটি: একথায় দিলীপ ভারি খুসি হবে—কারণ জানেনই তো ও ঠুংরির কি রকম ভক্ত।

আমি (সোৎসাহে): ভালো জিনিষের ভক্ত হব না পণ্ডিতজি? খেয়াল খুবই ভালো মানি, কিন্তু ঠুংরির এখনো তেমন বিকাশ হয় নি একথা ভুললে চলবে না। ঠুংরিকে ওস্তাদেরা বাইজিদের গান ব'লে আজো অবজ্ঞা করেন এতেই আমার আপত্তি। কিন্তু ঠুংরি পুরুষদের কণ্ঠেও সুন্দর শোনাতে পারে যদি আমরা মেয়েদের ঢঙ নকল না করি। কিন্তু হয়েছে কি, বাইজিদের ঢং অনুকরণ না ক'রে ঠুংরি গাওয়া খুব সোজা নয়।

পণ্ডিতজি: খুব ঠিক কথা। আমি আমার ক্রমিক পুস্তক-মালিকাতে লিখেছি এই কথাই। এই দেখ না—

ব'লেই পণ্ডিত তাঁর স্বরচিত বই থেকে প'ড়ে শোনালেন ঠুংরি সম্বন্ধে কি লিখেছেন। তার সার মর্ম এই যে ঠুংরিতে রাগের বিশুদ্ধতার

চেয়ে শ্রুতিমধুরতাকে বড় ক'রে দেখা হয় ব'লে ঠুংরি ওস্তাদসমাজে অনাদৃত বটে, কিন্তু ঠিক ম'ত গাইতে জানলে ঠুংরি অতি সুন্দর সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে। তবে মুস্কিল হচ্ছে ঠুংরি গাওয়া সহজ নয় ও রীতিমত শিক্ষাসাপেক্ষ।

পণ্ডিতজি (বইটা মুড়ে) ঃ তাই তো আমি রতনজনকরকে কদর পিয়ার ঠুংরি শিখতে পাঠাই নবাব সাহেবের ওখানে। শ্রীকৃষ্ণ হালে অনেকগুলি ঠুংরি শিখেছে, শুনেছেন কি প্রফেসর ?

ধূর্জটি মাথা নেড়ে জানাল—শুনেছে ও খুব ভালো লেগেছে।

আমি ঃ ভারি সুন্দর ঠুংরি শিখেছেন রতনজন কর।

পণ্ডিতজি ঃ আমার ভরসা আছে ও পরে ঠুংরিও ভালো শেখাবে। উপস্থিত আমাদের কলেজের তিনটি অভাবের দরুণ আমি একটু ভাবিত আছি ঃ—(১) বাজনা শেখানোর ব্যবস্থা করা, (২) ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জোগাড় করা, (৩) মহিলাদের ক্লাস খোলা।

ধূর্জটি ঃ কিন্তু মহিলারা সবাই চান—আপনার কিম্বা রতনজনকরের ক্লাসে আসতে। মুসলমান ওস্তাদদের কাছে যেতে তারা ভারি নারাজ।

পণ্ডিতজি ঃ জানি, কিন্তু ঐখানেই তো মুস্কিল। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন কাগজে ছাপিয়ে দিতে যে মেয়েদের ক্লাসে মুসলমান ওস্তাদরা ঢুকবে না। কিন্তু তাহ'লেই ফের ঐ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঢুঁ মারবে না কি লাভের রাজ্যেও ?

আমি ঃ কিন্তু অশিক্ষিত ওস্তাদদের লম্বা লম্বা কথা শুনতে যেতে কার ইচ্ছে করে বলুন পণ্ডিতজি ?

পণ্ডিতজি (হেসে) ঃ যা বলেছ দিলীপ। দু একটা গল্প মনে পড়ল, এবারই শুনে এলাম গোয়ালিয়রে এক ওস্তাদের মুখে।

ধূর্জটি ঃ বলুন না।

পণ্ডিতজি ঃ সুর হ'ল গান থেকেই। হ'ল কি—এক আসরে এক ওস্তাদ গাইছিলেন ঃ 'পিয়ারা তুমরে কারণ চিত্ত উদাস।' যে

হুঙ্কার তিনি দিচ্ছিলেন তাকে উদাসীর হুঙ্কার বলা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু সে যাই হোক তাঁর নায়কের উদাসভাবের হুহুঙ্কারী ছবিটি ফোটানো শেষ হ'লে তিনি আমার দিকে গর্বিত ভাবে তাকালেন। কী করি? আমাকে বলতে হ'ল: "মহশাল্লা, খাঁ সাহেব! কী তানই দিলে আজ!" ওস্তাদজি সলজ্জ হেসে বললেন: "তবু তো আপনি আমার ওস্তাদ হোমরাও খাঁর তান শোনেন নি।"—"কী রকম?"—"সে আর বলব কি পণ্ডিতজি—শুনুন তবে। আমাদের মহারাজার ছাদ দেখেছেন তো?—কী উঁচু ছাদ—লক্ষ্যও ক'রে থাকবেন? তাহ'লে বুঝুন ওস্তাদ হোমরাও খাঁ সাহেবের তানের প্রচণ্ড তাকৎ—ফি বার যখন নিতেন তাঁর তিনসপ্তকের হলক তান ঐ উঁচু ছাদের পাথরগুলোও উঠত কেঁপে—একেবারে দুলে!"

—"আশ্চর্য!"

—"আশ্চর্য? আশ্চর্যের এখন হয়েছে কী পণ্ডিতজি?"

—"আরো আশ্চর্য আছে না কি?"

—"তব্ কেয়া?"

—"কি রকম?"

ওস্তাদজি বললেন: "মহারাজ সিন্ধিয়া তাঁর প্রাসাদের মস্ত মস্ত পাথরগুলো ওস্তাদজির হলক তানে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে দেখে তো হতভম্ব! ওস্তাদজি তখন গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন: 'এ তো কী জনাবালি! আমি এমন গমক দিতে পারি, যে হাতিশালের হাতি ভেগে যাবে।' সিন্ধিয়া বাহাদুর বললেন: "ঐসা?" ওস্তাদজি মুচকে হেসে বললেন: "তব, কেয়া! তবু সিন্ধিয়া বাহাদুরের বিশ্বাস হ'ল না। বললেন মাহুতকে হাতি আনতে—দেখাই যাক না। এল হাতি। অকুতোভয়ে ওস্তাদজি দিলেন মাত্র কয়েকটি গমক। ছাদের পাথর উঠল ফের দুলে—হাতি তো একেবারে উর্ধ্বলাঙ্গুল হ'য়ে দে দৌড়। মহারাজ সিন্ধিয়া তৎক্ষণাৎ সে-হাতি বখশিশ দিলেন ওস্তাদকে। বুঝলেন পণ্ডিতজি, একেই বলে গান

আর এরই নাম শ্রোতা। সে-জমানাই (যুগ) ছিল আলাদা পণ্ডিতজি—কদরদানও তেম্‌নি। আমার ওস্তাদের কাছে শুনেছি যে, তান সহজে আসে না। তবে সেকালে রেয়াজ করতেন তাঁরা কেমন! প্রথম কুড়ি বৎসর শুধু সা রে গা মা। তারপর পঁচিশ বছর আলাপ। তারপর ত্রিশ বছর শুধু তান আর তান।—তবে তাদের সামান্য কিছু আসত—অতি সামান্য, বুঝলেন পণ্ডিতজি! একি আপনার শাস্ত্রের কর্ম? যান। ফেলে দিন গে ওসব শাস্তর দরিয়াতে। ওসব প'ড়ে যা হয় পণ্ডিতজি, সে গান নয়। গান হ'ত সে যুগে যখন এক একটা তানের জন্যে ওস্তাদরা জান দিত।" আমি শিউরে উঠে বললাম: "জান দিত? বলেন কি খাঁ সাহেব? নিজের জান?"—"তব্ কেয়া? নৈলে কি আর তান হয় পণ্ডিতজি, হয় কেবল ঐ আলাপের স্বরলিপি। হস্‌সু খাঁ কেমন ক'রে মারা গিয়াছিলেন খবর রাখেন?"—"বলুন না ওস্তাদজি—শিখতেও তো পারব কিছু।" ওস্তাদজি আমার বিনয়ে একটু প্রসন্ন হলেন, বললেন, "এ গল্প খোদ আমার ওস্তাদের কাছে শোনা পণ্ডিতজি—স্বকর্ণে। হস্‌সু খাঁ এমন একটা সাড়ে তিন সপ্তকের তান ছাড়লেন যে তাঁর বুকের একটা পাঁজর আর একটা পাঁজরের উপর উঠে বসল চেপে।"

"বলেন কি?"

"তব্ কেয়া? নৈলে আর তান বলেছে কেন পণ্ডিতজি! কিন্তু হ'লে হবে কি, সেখানে বসেছিলেন কে জানেন? একেবারে খোদ আহম্মদ খাঁ। তিনি হস্‌সু খাঁকে থেমে যেতে দেখেই হাঁ হাঁ ক'রে ব'লে বসলেন: করো কি ওস্তাদ—জান যাবে ব'লে কি তান থামবে? ফিরিয়ে আনো তান সুরে—ছেড়ো না। হস্‌সু খাঁ মরীয়া হ'য়ে সুরের তান সুরে ফিরিয়ে আনলেন বটে—কিন্তু পাঁজর আরো এক ধাপ চ'ড়ে গেল—হস্‌সু খাঁ তুললেন পটল!"

ব'লেই পণ্ডিতজির আবার সেই হা হা ক'রে হাসি।

পথে আসবার সময় কেবলই মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল তাঁর সৌম্য গৌর কান্তি প্রতিভাদীপ্ত ললাট ও প্রাণখোলা হাসি। ভাবছিলাম—একটি আইডিয়া—মাত্র একটি—অথচ তাতেই সমস্ত মানুষটা গেল কি না রূপান্তরিত হ'য়ে! মনে পড়ছিল শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধের একটি ছত্র: "Man approaches nearer his perfection when he combines in himself the idealist and the pragmatist, the originative soul and the executive power." (Ideal and progress)

* * *

শুনেছিলাম ইন্দোরের রাজসভায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গাইয়ে বাজিয়ে আছে—নবরত্ন না মিলুক দু তিনটি রত্নও কি মিলবে না জপ করতে করতে ধাওয়া করলাম ইন্দোরে।

সেখানে কলেজের উপাচার্য মহাশয়ের আতিথ্যে খোলা আকাশ-বাতাসের আবহাওয়ায় কদিন বড় আনন্দেই কেটেছিল।

এখানে দুটি খানদানী ওস্তাদ পরিবার আছেন: এক, বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলি খাঁর শিষ্য ওয়াহিদ খাঁর ভ্রাতা, পুত্র প্রপৌত্রাদি; দুই, বৈরম খাঁর বংশধর আল্লাবন্দে খাঁর পুত্র সঙ্গীতরতন নাসিরুদ্দীন খাঁ। (আনওয়ারে আলাবন্দে এখনও গমকের হুংকার দিয়ে চলেছেন—কিন্তু সেখানে যাবার আর প্রেরণা পাইনি।) এঁর জেঠতুত ভাই জিয়াউদ্দীনের কথা বলেছি যিনি এখন জয়পুরে টিম্ টিম্ ক'রে গাইছেন একা ধ্রুপদ আলাপ। কিন্তু সঙ্গীতরতন নাসিরুদ্দীন ভ্রাতার মতন গতানুগতিক গাইয়ে নন—সত্যিই একজন গুণী—সুগায়ক ও সুকণ্ঠ। অদ্ভুত তাঁর কণ্ঠসাধনা। মধুর তাঁর কণ্ঠ ও সুরের সূক্ষ্ম কারুকাজ তাঁর গলায় চমৎকার ফোটে। কেবল ইনি মাঝে মাঝেই গমক দিতে থাকেন বড় বেশিক্ষণ ধ'রে। সঙ্গীতে বিবিধ অলঙ্কার—

মিড়, কম্পন, তান, গমক প্রভৃতি—সৃষ্ট হওয়ার সার্থকতাই এই যে তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগালে গানের সৌষ্ঠব বাড়ে। অপর পক্ষে শুধু একটি বা দুটি অলঙ্কার স্থানে অস্থানে অবিশ্রান্তভাবে ব্যবহার করলে তাতে গান একঘেয়ে শোনাতে বাধ্য। নাসিরুদ্দীনের চেয়ে আল্লাবন্দে খাঁর গান বেশি একঘেয়ে এইজন্য যে, আল্লাবন্দে খাঁ গমক ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে যতক্ষণ না শ্রোতার প্রাণবিহঙ্গম খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করেন ততক্ষণ আর থাম্‌তে চান না। অনবরত তানেও যে গান এইরূপই একঘেয়ে লাগে তার জাজ্বল্যমান পরিচয় পাওয়া যায় বম্বের বালগন্ধর্বের গান শুনলে। শুধু কম্পনে যে গান কত নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে—আ-আ-আ-আ, ই-ই-ই-ই, উ-উ-উ-উ-উ কম্পনসম্বল য়ুরোপীয় গানে। য়ুরোপীয় কণ্ঠসঙ্গীতের এই "সবেধন নীলমণি" অলঙ্কারটির একান্ত বাহুল্যে যে সঙ্গীতরসিক ভারতীয়ের হৃদ্‌যন্ত্র কি রকম দেখতে দেখতে বিকল হ'য়ে পরে ভুক্তভোগীর অগোচর নেই। ঠিক তেমনি সঙ্গীতরত্নের শ্রান্তিহীন যতিহীন গমকে শ্রোতার প্রাণ আইপাই করে। তবু বলব তাঁর মধ্যে সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম কলাকারুর রস মেলে তাই তাঁর গানে কান ও মন দুইই প্রসন্ন হয়—বিশেষ তাঁর দ্রুত সার্গম আলাপে ও যখন তখন যে কোনো পর্দায় কণ্ঠকে অচঞ্চল রেখে রসসৃষ্টি করার নৈপুণ্যে।

এবার নাসিরুদ্দীনের অনেক অনুযোগ ও হামবড়াই-ই শোনা গেল। আজকাল ওস্তাদদের মধ্যে শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে—(বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মহাপ্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বিরুদ্ধে) যে একটা তীব্র বিমুখতা ও বিদ্বেষ জেগে উঠ্‌ছে, তার একটা নিবিড় রস নাসিরুদ্দীনের ও অন্যান্য অনেক ওস্তাদের 'ভাতখণ্ডে তর্পণে' প্রতীয়মান হয়। ক্রমে সকলে বুঝছে যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দেশে সঙ্গীতের প্রচার ও বহুল স্বরলিপি প্রকাশ ক'রে তাদের যথেচ্ছাচার ও জ্ঞানপ্রচার-কার্পণ্যের এক মহা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সেদিন বম্বেতে আমায় বলছিলেন:—"এদের আমার প্রতি রাগের প্রধান কারণ এই যে, তাদের 'খানদানী' গান আমি প্রকাশ্যভাবে সাধারণের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। এরা কেউ কেউ আমায় স্পষ্টই বলেছে যে, আমি তাদের অন্ন মেরেছি। এখন অনেক শিক্ষার্থী আমার বই দেখে তাদের ফরমাশ করে, অমুক অমুক গান তাদের শেখানো হোক্—যে সব গান তারা সাতজন্মেও কখনও অপরকে শেখায় না।"

নাসিরুদ্দীন খাঁ আরও একটু বেশিদূর গিয়েছেন। তিনি আমায় বলেন যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বইগুলি "দরিয়ামে ফেকনেকো কাবিল" অর্থাৎ নদীতে ফেলে দেওয়ার যোগ্য। তাঁর বইগুলি এরূপ সুভীষণ অন্তঃকৃত্য কামনা করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রশান্তভাবে বল্‌লেন বইগুলি লেখার সময় তাঁকে ও তাঁর খানদানী ঘরের পরামর্শ নেওয়া হয়নি।

কথাটা একটু বিসদৃশ রকমের অহমিকাপূর্ণ হ'লেও একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মতনও নয়। কারণ একথা স্বীকার করতেই হবে যে খানদানী ঘরে ভাল চালের গান ও উৎকৃষ্ট ঢঙের রাগাদি আছে। অর্থাৎ আমাদের এসব গান আদায় করতে হ'লে তাঁদের কাছে হাত পাততেই হঁবে যাঁরা খানদানী ঘরের মুসলমান ওস্তাদ। কিন্তু পণ্ডিতজীর নিন্দা করার সময়ে এই সব ওস্তাদেরা ভুলে যান একটি নিদারুণ সত্য যে তাঁরা এসব গান নিজেদের পরিবারের বাইরে কাউকে বড় একটা শেখাতে চান না। সেই জন্যেই না পণ্ডিতজিকে এত কষ্ট ক'রে এসব গান নানা ওস্তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে তাদের অনেক তুতিয়ে পাতিয়ে।

কিন্তু পণ্ডিতজির রাগসংগ্রহ "নদীতে বিসর্জন দেওয়ার যোগ্য" এ-অভিযোগ অচল—বিশেষত এযুগে। কেননা এ যুগে স্বরলিপির প্রচার উত্তরোত্তর বাড়বেই বাড়বে ও তাতে ক'রে শিক্ষার্থীর লাভ বৈ লোকসান হবার কথা নয়। তাই মুসলমান খানদানীদের কাছে

শ্রেষ্ঠ চালের বহু নাম আছে একথা যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি অনস্বীকার্য আর একটি কথা: যে, পণ্ডিতজি তাঁদের কাছ থেকেই তাঁর অমূল্য গানের পুঁজি সংগ্রহ করেছেন। এজন্য অনেক সময়েই নানা ওস্তাদকে গুরুপদে বরণ করতেও তাঁর কুণ্ঠা হয় নি। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই, পেলেও পাইতে পারো লুকানো রতন"—পণ্ডিতজি এই অন্বেষু মনোভাবের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সঙ্গীতরাজ্যে তাঁর মতন জিজ্ঞাসু কোনো দেশেই বেশি মেলে না।

কিন্তু সঙ্গে নাসিরুদ্দীনের একটি অভিযোগের সত্যতাও অস্বীকার করা যায় না। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন: "আপনারা কথায় কথায় প্রায়ই বলেন আমরা আপনাদের মন দিয়ে গান শেখাই না। কিন্তু এজন্যে আপনারাও কি কম দায়ী বলবেন? আগে আমাদের 'ইল্‌মের' (জ্ঞানের) কদর করতে শিখুন, তারপর আমাদের দোষ দেবেন।" কথাটি সত্য। তেজস্বী আবদুল করিম খাঁও একবার আমাকে বলেছিলেন যে, এক রাজা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে তাঁকে তাঁর নিজের শতরঞ্চে ব'সে গান গাইতে অনুমতি না দেওয়ার জন্যে তিনি গান না গেয়ে চ'লে আসেন। গুদের জ্ঞানের কদর করতে না পারা আমাদের ধনী তথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি শোচনীয় অ-গুণ—কলঙ্ক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা আছে: যে নিজেকে সম্মান করে না, সে কোনোদিনই অপরের সম্মান পায় না। আজকের দিনে কজন ওস্তাদ আত্মসম্মানী। তাই নাসিরুদ্দীন ও করিম খাঁর অভিযোগের সত্যতা মেনেও তাঁদের একথা বলা চলে যে যেদিন ওস্তাদেরা নিজের নিজের গুণের মর্যাদা দিতে শিখবে সেদিন আপনা থেকেই লোকমতের মোড় ফিরবে, শ্রোতারা তাঁদের অবজ্ঞা না করে সম্মান করতে সুরু করবে। পরমহংসদেব প্রায়ই বলতেন: ঠাকুর মানী লোকের অসম্মান করেন না।

(এ-অংশটুকু পাদটীকা হিসেবে গ্রহণীয়—১৯৬০ সালে লেখা: আমি পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম আমার নানা

প্রবন্ধে ও ভাষণে, আজ সেগুলি ফলেছে, এতে আমার আনন্দের সত্যিই অবধি নেই। আজ ওস্তাদ সম্প্রদায় আমাদের জনসাধারণের কাছে সমাদৃত, সঙ্গীতরসিকদের কাছে সম্মানিত—। এমন কি রাজপুরুষদের কাছেও অবজ্ঞাত নন আর। তাঁরা দেশবিদেশে গিয়ে ভারতের সাঙ্গীতিক মহিমা প্রচার ক'রে দেশে এসেও মান পেয়েছেন। তবে তাঁরা আজো যে-স্বীকৃতি পান নি বিদ্বৎসমাজে সে-স্বীকৃতি তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য। অদূর ভবিষ্যতে আসবেই আসবে সে-স্বীকৃতি যখন পদস্থ রাজপুরুষকে ছেড়ে লোকের প্রশংসমান দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে প্রকৃত গুণী-জ্ঞানী, শিল্পী ও মহাত্মাদের প্রতি। যখন গুণীদের গুণপণাকে রাজপুরুষদের পদবীর চেয়েও উচ্চস্থান দেওয়া হবে—যখন সর্বসাধারণের মনে এই ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে দেশের গৌরব তার জ্ঞান ধ্যান শিল্প সঙ্গীত কাব্যের বিকাশে—মোটা মাইনের চাকরি পেয়ে পদস্থ কর্মচারী হ'য়ে গদিয়ান হ'য়ে অলস বিলাসের আত্মপ্রসাদে কাল কাটানো নয়।)

* * *

ইন্দোরের ওস্তাদ ওয়াহিদ খাঁর কথা বলেছি-এবার তাঁর গুণপনার কথা বলার পালা।

ইনি সত্যই খানদানী। তাঁর অন্যতম প্রমাণঃ তাঁর "গরিব-খানা"য় পদার্পণ করতে না করতে অশীতিপর মিষ্টভাষী বৃদ্ধ শুধু যে "এলাইটি" দিয়ে সংবর্ধনা করলেন তাই নয়, আভূমি-প্রণত কুর্ণিশ ক'রে আমাকে "তশরীফ" রাখতে অনুরোধ ক'রে সবিনয়ে বললেন যে মাদৃশ মান্যগণ্য রসিককে তিনি গানা সুনানেকো কাবিল নন—কিছুতেই নন। অপিচ ওঁর গবিরখানাকে মাদৃশ কদরদানের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে আল্লারই হুকুমে, নৈলে এ-অঘটন ঘটতে পারত না। তারপরেই কিন্তু ব'লে ফেললেন (আচম্‌কাই হবে) যে ওয়াহিদ খাঁর খানদানী ঘরানা চীজের নাম শুনলেই সারে হিন্দুস্তানের গাওয়াইয়ারা

নিজের কান ধ'রে আল্লা বিসমিল্লা মন্ত্র জপ ক'রে যাবেন। বিনয়ী বৈ কি।

কিন্তু সে যাই হোক ওয়াহিদ খাঁ নির্ভেজাল গুণী এ নিঃসন্দেহ। শুধু তিনি কেন তাঁর পরিবারের নানা বালক-বালিকার গান শুনতে শুনতে মনে হ'ল বৈ কি যে উচ্চাঙ্গের গান এদের প্রায় মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। আবাল্য শিক্ষিত সংস্কৃত পরিবারে যারা মানুষ তাদের মধ্যে যেমন একটি সহজ সৌকুমার্য দেখা যায় তেমনি খাঁটি গুণি-পরিবারে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি শুধু যে সহজ বোধ জন্মায় তাই নয় অশিক্ষিত পটুতাও আশ্চর্য হ'য়ে ফুটে ওঠে। মনে পড়ে আবদুল করিমের কথা ঃ "হমারে ওহাঁ কুত্তা ভি গা সকতা!" আর সত্যিই তাঁর কুকুর পর পর সাতটি সুর শোনাতে পারে। আমার স্বকর্ণে শোনা—আষাঢ়ে গল্প নয়।

ওয়াহিদ খাঁর কুত্তার মধ্যে গীতি-প্রতিভার এহেন কোনো আশ্চর্য বিকাশ দেখতে পাই নি বটে (বলতে কি তাঁর কুত্তা ছিল কি না, তাও মনে করতে পারছি না) কিন্তু তাঁর নবমবর্ষীয় কুলতিলক শ্রীমান্ আবদুল রশীদের গান শুনে সত্যিই চম্‌কে উঠতে হ'ল। কী অদ্ভুত কণ্ঠসাধনা, শ্রুতিবোধ, তান কর্তব্যের নৈপুণ্য। তোড়ি গান্ধারী বসন্ত প্রকৃতি কঠিন রাগও সে এমন আশ্চর্য তানলয়ের সহযোগে বিস্তার করল যে মনটা বিস্ময়ে পুলকে ভ'রে উঠল। মনে পড়ল এড্‌গার আলেন পো-র কথা ঃ "It is a happiness to wonder."

তাঁর বয়স্ক পুত্র লতিফ খাঁ উৎকৃষ্ট বীণকার। তাঁর ঝঙ্কার, গমক, মিড়, তান, ঝালা, লড়গুথাও সবই প্রাণস্পর্শী। একদিন সমস্ত সকালটাই তাঁর নিপুণ হাতের বীণা শোনা গেল, কিন্তু শুনলাম তাঁর এক পিতৃব্য মোরাদ খাঁ নাকি তাঁর চেয়েও ভাল বীণা বাজান। শুনবামাত্র দলবল বেঁধে মোরাদ খাঁর বাড়ীতে চড়াও হওয়া গেল।

মোরাদ খাঁ সত্যি লতিফ খাঁর চেয়ে অতি শ্রেষ্ঠ বাজিয়ে। একই শহরে দুই জন এরূপ প্রথম শ্রেণীর বীণকারের বীণা শুনে মনটা খুসিতে

ভরে উঠ্‌ল! তোড়ি, জৌনপুরী, দেশী ও ভৈরবী এই চারটি রাগ তিনি তাঁর নিপুণ হাতে যে কি অপূর্ব বাজালেন, তার সম্যক্ তারিফ করা কঠিন! তাঁর বাজানর ঢং অনেকটা লতিফ খাঁরই মতন, কেবল তিনি বীণায় গমকের কাজের চেয়ে মিড়ের কাজই বেশি দেখান। তাতে ক'রে তাঁর বীণাবাদন লতিফ খাঁর চেয়ে সম্ভ্রমে (dignity) কম গরীয়ান্ হ'লেও ললিত সৌন্দর্য বেশি মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠে। তাঁর ও লতিফ খাঁর বীণার মধ্যে যেমন পারিবারিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তেম্‌নি প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যটিও পাওয়া যায়। দুই জন সত্য শিল্পীর মধ্যে এক ঢঙের সাদৃশ্য থাক্‌লেও তাঁরা যে নিজের নিজের গুণপনার মধ্যে নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ না ক'রেই পারেন না, এই সত্যটি খুড়ো-ভাইপোর বীণার তুলনায় যেন সেদিন বড় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

মোরাদ খাঁকে গত বৎসর লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে যান নি কেন জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সগর্বে জবাব দিলেন: "সাব্! কম খানা, মগর ইজ্জৎসে রহনা।"

আবার সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি: নূতনের বিরুদ্ধে প্রাচীনের বিদ্রোহ—প্রাচীনের বিরুদ্ধে নূতনের প্রতিবাদের প্রতিরূপ। গতানুগতিকতা চায় অভ্যাসের জের টেনে চলতে। তাই এ-শ্রেণীর ওস্তাদেরা মামুলিপন্থী হ'য়ে চান ধনী পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান ক'রে তাঁদের কথায় উঠতে বসতে। এসব ওস্তাদকে যখন তখন রাজসভায় রাজার হুকুমে হাজিরি দিয়ে বাজে সভাসদদের মনস্তুষ্টি করতে হয়। অনেক সময়ে কেউই শুনছে না তবু বাজিয়ে যেতে হয়, প্রসাদদাতাদের প্রসন্ন রাখতে কেবলই সেখান বাজাতে হয় তাঁরা সমজদার হোন বা না হোন। "ইজ্জৎসে রহনা"ই বটে!

* * *

সবাই একবাক্যে বললেন: "হ্যাঁ, গাইয়ের মতন গাইয়ে বটে কেশব রাও আপ্তে। বৃদ্ধ—মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। আমরা তাঁর ওখানে যেতে যথাবিধি আপ্যায়িত করলেন, কিন্তু গান করতে আর চান না, তাঁর বহুদিন সঞ্চিত আক্ষেপের ঝুলি ঝাড়তে আরম্ভ করলেন: "ধ্রুপদ ত উঠেই গেল; আমাদের সময়ের গান সে এক চীজ ছিল, আর আজকালকার বাজে গান এ এক অন্য জবর চীজ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমাদের গানে ছিল শুধু সুর ও লয়; আজকালকার গানে হয়েছে—সব 'বরবাদ'; আমাদের সময়ে স্বরে ছিল শান্তিপর্ব, আজকাল সুরে এসেছে 'গদাপর্ব' ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃদ্ধ 'গদাপর্ব' বলে খুব এক গাল হেসে নিলেন। আসরের অন্য সব শ্রোতাও দোয়ার দিলেন সে ব্যঙ্গহাস্যে। অশীতিপর বৃদ্ধের কৌতুকোজ্জ্বল চোখ সংস্কৃতমিশ্রিত ভাঙা হিন্দি, শিখা নেড়ে রসিকতা, সবই আমাদের ওস্তাদি-সঙ্গীতের অভিজ্ঞতায় এক নতুন জিনিষ হওয়াতেই বোধ হয় আমরা বৃদ্ধের অনর্গল গল্পে হৃষ্ট হয়ে উঠ্‌লাম! ওস্তাদ সম্প্রদায়ের মধ্যে রসিকতা! এ-অভাবনীয় যোগাযোগে মনটা খুসি না হয়ে আর করে কি?

কিন্তু জরা যে অনেক সময়ে মানুষকে একটু বেশি রকম বহুভাষী (garrulous) করে তোলে সেটা হঠাৎ উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা গেল, যখন ঘড়ি খুলে দেখা গেল যে, এ-ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুধু বৃদ্ধের পানসাজা ও ফোক্‌লা দাঁতের হাসি ছাড়া অন্য কোনও অপরূপ শিল্পকলারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয়, নাসিরউদ্দীন-প্রমুখ ওস্তাদদের তাঁর চেয়ে বেশি মাহিনা দেওয়ার অসমীচীনতা, মহারাজার তাঁকে অবহেলা করার অনৌচিত্য, তাঁর গানের সমূহ অসুবিধা হবে বুঝে বিধাতার তাঁর দন্তগুলি অপহরণ করা রূপ অবিবেচকতা, তাঁর বহুদিন কারুর সঙ্গে আসরে ব'সে দুটো প্রাণের কথা বলার সুযোগাভাব—এই জাতীয় নানান্ বিচিত্র অনুযোগ অভিযোগের মশলায় রসিকতার সাত সতেরো ব্যঞ্জন পরিবেষণে তিনি শেষটায় এতই মুখর হ'য়ে উঠলেন যে, সত্যিই

মনে হ'ল, তিনি বেমালুম ভুলে ভেবে বসেছেন যে, বাঞ্ছাকল্পতরু আমাদের সেই ঘোর রাত্রে বিদেশে বিভূঁয়ে টাঙ্গা ক'রে বহু উত্থান-পতনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হাড়ে হাড়ে অনুভব ক'রে তাঁর "গরিবখানায়" হাজির করেছিলেন শুধু জগতের অনিত্যতা, ধনীর অব্যবস্থিতচিত্ততা ও রুচির পরিবর্তনশীলতার সম্বন্ধে তাঁর দন্তহীন হাস্যমুখর গবেষণা উপভোগ করতে। কিন্তু হায়রে! ওস্তাদ সম্প্রদায় থাকেন খানিকটা মায়াবাদীদের মতনই কালাতীত চেতনায়, তাই তাঁদের মনে হয় না একবারো যে শ্রোতারাও তাঁদের মতন কালাতীত চেতনায় অবস্থান করেন না ব'লে বাজে গালগল্পে কালক্ষেপ করতে হ'লে মনস্তাপে ক্লিষ্ট হ'তে পারেন।

কেশব রাও অশীতিপর বৃদ্ধ। তাই তাঁর গানের সমালোচনা করতে মন সরে না। কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ধ্রুপদের গুণগানে পঞ্চমুখ হওয়ার পরে তিনি আমাদের অনুরোধে একটি মাত্র ধ্রুপদ চৌতাল জলদ একতালার ছন্দে গেয়েই ধরলেন সস্তা নাচুনি ছন্দের গান—প্রায় খেমটা তালে। তখন চোখের ঠুলি খ'সে পড়ল—দেখতে পেলাম স্পষ্ট কেন ইন্দোররাজ নাসিরউদ্দীনকে কেশব রাওয়ের তিনগুণ ভাতা দিয়ে সভাগায়ক বাহাল করেছেন। তবে কেশব রাও আমাকে একটি তুলসীদাসের ভজন সোহিনী রাগে শিখিয়েছিলেন—গানটি অপরূপ না হ'লেও সুশ্রাব্য ঃ

মাই মেরে নয়না বসে রঘুবীর
কর শর চাপ কমল দল লোচন
ঠাড় ভয়ে রাধীর······ইত্যাদি

* * *

শুনলাম অন্ধ দেবীদাস রাও অতি চমৎকার হার্মোনিয়ম বাজান। হার্মোনিয়ম সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি যা লিখবার লিখেছি। বেশি লিখতে ভয় করে পাছে অনেকে আমাকে ভুল বোঝেন, ভাবেন

হার্মোনিয়মের পুনঃ প্রবর্তনে আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে। আমি নিজে হার্মোনিয়মের কাছে গভীরভাবে ঋণী বটে, কিন্তু মানী যাঁরা বিনা হার্মোনিয়ম শুধু তানপুরা সঙ্গতে গান গেয়ে জমাতে পারেন তাঁরা অভিনন্দনীয়। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এরকম ওস্তাদ আমি মাত্র তিনটি দেখেছি: আল্লা বন্দে খাঁ, নাসিরউদ্দীন খাঁ ও আবদুল করিম। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আবদুল করিমের গান হার্মোনিয়মের সঙ্গে আরো বেশি জমত—কেননা তাঁর হার্মোনিয়মের সঙ্গে সঙ্গত করতেন তাঁর এক নিপুণ শিষ্য। তাছাড়া আবদুল করিম প্রাইভেট মজলিসে নিজে হার্মোনিয়ম বাজিয়েও আসর জমাতেন।

যাই হোক, আমার মনে হয় বাজাতে জানলে হার্মোনিয়মে মাধুর্যের ঝর্ণা বইয়ে দেওয়া যায়। দেবীদাস রাওয়ের হার্মোনিয়ম শুনে এ-সত্যটির সঙ্গে যেন নতুন ক'রে পরিচয় হ'ল আনন্দের এজাহারে। এঁর হার্মোনিয়মে মিষ্টত্বে মাধুর্য যেন ফুল কাটতে কাটতে চলে—অবিশ্বাস করার আর পথ থাকে না। এঁর চেয়ে ভালো হার্মোনিয়ম আমি জীবনে একবার মাত্র শুনেছি ও সে বাদকটি হচ্ছেন গয়ার বিখ্যাত হার্মোনিয়োমী সোনি। কিন্তু এক সোনি ছাড়া আর কারুর হার্মোনিয়মে এরূপ কৃতিত্ব দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ৺গণপৎ রাওয়ের বাজনা একবার অনেক বৎসর আগে শুনেছিলাম কিন্তু সে-স্মৃতি ঝাপসা হ'য়ে এসেছে ব'লে তাঁর প্রসঙ্গ তুলতে চাই না। দেবীদাস রাও তাঁর কড়ে আঙুলে অনেকটা চিকারির মতন দ্রুত কাজ করেন ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতে আশ্চর্য মধুর ঢঙে স্বরটি বাজান। তাঁর বাজানর ঢংটিও ভাল—যদিও সোনির মতন নয়। কিন্তু তবু তাঁর মুলতান, ভীমপলশ্রী, তিলক-কামোদ, কামোদ ও পূরবী খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি হার্মোনিয়ম অনন্যতন্ত্র রসসৃষ্টি ক'রে থাকেন। অর্থাৎ তবলার নানা জটিল বোলের অবিকল অনুরূপ সার্গম ঠিক্ সেই ছন্দে হার্মোনিয়ম বাজানো। এটা

তিনি পর-পর মুখে আওড়ে ও বাজনায় বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন—যেটা সেজন্য আরও বিশদ হ'য়ে উঠ্‌ল।

চ'লে আসবার সময় অন্ধ গুণী এত আদর ক'রে আমাদের তাঁর মাটির মেজেতে আসন পেতে বসিয়ে চা খাওয়ালেন যে মনটা ভারি তৃপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। একে জন্মান্ধ, তাই বোধ হয় তাঁর এ-সহৃদয় আপ্যায়ন আমাদের সকলকেই সেদিন এত স্পর্শ করেছিল। কেবল তাই নয়, অন্ধ দেবীদাস সেদিন তাঁর বাজনা শুনতে আসার জন্যে আমাদের এমন সোচ্ছ্বাসে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। যে-গুণী শ্রোতাকে, শুধু তাঁর শিল্পকলা দিয়ে সংবর্ধনা ক'রে ক্ষান্ত না হ'য়ে এ তৃপ্ত হতে আসার জন্যেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তাঁর হৃদয়ের সে-মনোজ্ঞ তারুণ্য ও নম্রতা বড় সুন্দর-শোভন। সেদিন তাঁর উচ্ছ্বাস দেখে মনে প'ড়ে গিয়েছিল Wordsworth-এর বিখ্যাত Simon Lee কবিতাটি ঃ

I have heard of hearts unkind, kind deeds
    With coldness still returning,
But alas! the gratitude of men
    Hath oftener left me mourning!

* * *

ইন্দোরের প্রধান রাজমন্ত্রী আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজসভার শ্রেষ্ঠ সারঙ্গিয়া বুন্দু খাঁকে। তাঁর সমকক্ষ গুণী আমি জীবনে মাত্র একবার শুনেছি—তাঁরই মাতুল মম্মন খাঁ যাঁর কথা ইতিপূর্বে লিখেছি। আপ্তবাক্যে বলে—নরানাং মাতুলক্রমঃ। কিন্তু পাশাপাশি বাজালে মাতুলক্রম ভাগনে হয়ত মাতুলকেও অতিক্রম করতে পারেন—মনে হ'ল বুন্দু খাঁর সারঙ্গি শুনে।

বাস্তবিক অপূর্ব বাজান এই আশ্চর্য গুণী! সারঙ্গির মিড় কার না মধুর লাগে? কিন্তু এ তো শুধু মধুর নয়—যেন মাধুর্যের নির্যাস! বীণার পরে অন্য কোনো যন্ত্র কানে বাজলেও প্রাণে বাজে না—আমি

নিজেই বলতাম একথা বুন্দু খাঁর সারঙ্গি শোনবার আগে। কিন্তু ১৯২৬ সালে আগষ্ট মাসে বুন্দু খাঁর সারঙ্গি শুনি লতিফ খাঁ ও মোরাদ খাঁর দুটি উৎকৃষ্ট বীণকারের বীণা শোনার পরে। মনে পড়ল শ্যাম নাম শুনে রাধা দেবীর কনফেশন: "কে বা শুনাইল শ্যাম নাম—কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" —বুন্দু খাঁর সারঙ্গি শুনে মনে হ'ল হা রাধা হিয়ায় এ-হেন উচ্ছলতা জেগেছিল বৃন্দাবনে যে সময়ে কৃষ্ণ ঠাকুর সারঙ্গি বাজিয়ে নিজের নাম কীর্তন করেছিলেন। তিনি না পারেন কী?

"যত হাসি তত কান্না"—আপ্তবাক্য। তাই সারঙ্গি উচ্ছলতার পরে তার দুঃখে কাঁদি একটু। আহা এমন যন্ত্র কি না আজ ভদ্র-সমাজে অনাদৃত! এস্রাজ দিলরুবার সঙ্গে অনেকে গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু সারঙ্গির সঙ্গতের সঙ্গে গান যেমন জমে এস্রাজের সঙ্গতে কি তেমন জমতে পারে কখনো? তবে মনে হয় যে সারঙ্গি হয়ত শুধু বাইজিদের যন্ত্র ব'লেই ভদ্রসমাজে অবজ্ঞাত নয়—হয়ত সারঙ্গির সঙ্গে ভদ্রসমাজে গানের সঙ্গত হয় না এই জন্যেই যে সারঙ্গি বাজানো অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কারণ-নির্দেশের পালা থাক, এহেন যন্ত্রের আদর হোক এই প্রার্থনাই করা যাক বীণাপাণির চরণে। আশা করা যাক তিনি নিজে বীণা ছেড়ে সারঙ্গি ধরতে রাজি না হ'লেও তাঁর ভক্তদের প্রাণে সারঙ্গির প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে তুলবেন —বিশেষ ক'রে শিক্ষিত সমাজে।

ইন্দোরে শুনলাম তিনজন বড় বাইজি আছেন। (১) শ্রীজান—গোয়ালিয়র থেকে এসেছেন, (২) উজীর জান—কাশী থেকে এসেছেন; ও (৩) কৃষ্ণা বাই—পর্টুগীজ গোয়া থেকে এসেছেন। ইন্দোরের প্রধানমন্ত্রী আমাদের শোনাবার জন্য এঁদের আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইন্দোর-রাজের নবমবর্ষীয়া একটি কন্যা বাজি পোড়াতে গিয়ে পুড়ে মারা যান ব'লে রাজ্যে হরতাল প্রভৃতি হ'তে আরম্ভ হ'ল। কাজেই তাঁদের গান শোনা ভবিষ্যৎ

বারের জন্যে রেখে দিয়ে উদয়পুর রওনা হ'লাম। যদি কোনো সঙ্গীতানুরাগী ইন্দোরে যান, তবে যেন এই তিন জন বাইজির গান শুনে আসেন।

*　　　*　　　*

ভূপালে কয়েকটি ভালো গায়ক আছেন খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশ হ'তে হল। কারণ সেখানে যে-মহা মহম্মদ খাঁর দর্শন মিলল তাঁর গান শুনে শুধু মনে হ'ল হা হতোস্মি। তাঁর নাম ডাক কিন্তু যথেষ্ট। হবে না? সাক্ষাৎ হদ্দু খাঁ নম্মু খাঁর ঘরোয়ানা! ব্রাহ্মণ যদি কুলীন হয় তার ভাগে সাক্ষাৎ মাতা ভবানীর অভ্যুদয় হ'লেও অন্ন মারে কে? মহম্মদ খাঁও বোধহয় গাইতে গাইতে মাঝে মাঝেই নিরীহ তবলচির নাকের ডগা ও পদাঙ্গুষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য করে উন্মত্তবৎ অঙ্গুলি নির্দেশ সহ তান দিচ্ছিলেন—শুধু নিজের এই অবিনশ্বর খানদানিত্বটিকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই। তা ছাড়া গাইতে গাইতে প্রায়ই তিনি নিজের তানের বাহবাতে নিজেই ভরপুর হ'য়ে উঠে সোৎসাহে সে সব তানের অকাট্য মৌলিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করছিলেন (খানদানী কি না!)। তাঁর এই শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যাতৎপরতায় আমার মনে হচ্ছিল বার্লিনে আমার সেই অভিজাতবংশোদ্ভবা গৃহকর্ত্রীর কথা—যিনি আমাকে প্রত্যহই রান্না কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা ক'রেই উত্তরের অপেক্ষা না রেখে আগেই নিজের মশলা-নৈপুণ্যের গুণ-গ্রাহিতায় মশগুল হয়ে যেতেন। (এ সত্য কথা, অতিরঞ্জিত নয়)।

মহম্মদ খাঁর মিড় ভাল, সুর দোলানর ভঙ্গিও সুষ্ঠু, তানও মাঝে মাঝে উপভোগ্য। গলাও মন্দ নয়—অন্ততঃ এককালে যে ভালো ছিল, সেটা অনুমান করতে বাধে না। বয়স চল্লিশের বেশি হবে না। কাজেই কণ্ঠস্বর তাঁর ইতিমধ্যেই প'ড়ে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু

তাকে খাটিয়ে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা দূরে থাকুক—বিধাতা যেটুকু মাধুর্য দিয়েছিলেন সেটুকুও তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। কারণ তিনি গানে কণ্ঠস্বরের মূল্য সম্বন্ধে সাধারণ ওস্তাদদেরই মতাবলম্বী। অর্থাৎ তাঁর মত এই যে গানে দরকার—মূলতঃ গলাবাজি ও অত্যধিক উচ্চস্বরে আর্তনাদ করা। ফলে তাঁর গলাটি বেশ জখম হয়ে এসেছে। ওস্তাদদের এই আক্ষেপজনক প্রবণতাটি সম্বন্ধে আমি একাধিকবার লিখেছি। কণ্ঠস্বর হচ্ছে গানের নিহিত ভাবটি ফুটিয়ে তোলার একটা শ্রেষ্ঠ উপাদান। যেমন তোৎলার পক্ষে বড় নট হওয়া অসম্ভব ভাব-গভীরতা সত্ত্বেও তেম্‌নি কর্কশকণ্ঠ গায়কের পক্ষে শিক্ষা ও শুদ্ধ-তান-লয় সত্ত্বেও গানের আর্টে সিদ্ধিলাভ করা দুরাশাই বলব। অথচ আমাদের দেশে ওস্তাদ ও ওস্তাদিপন্থীদের গান সম্বন্ধে ধারণা আজ এতই অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই সাদা কথাটিও তাঁদের বার বার বলবার দরকার হয়। মহম্মদ খাঁর এই আক্ষেপজনক প্রবণতাটি সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন তিনি তাঁর একটি তের চৌদ্দ বৎসরের ছাত্রীকে দিয়ে একটি জৌনপুরী ও একটি ভৈরবী গাওয়ালেন। মেয়েটির গলাটি মন্দ ছিল না। তাছাড়া নারী বলে নারীসুলভ কমনীয়তাও তার গানের মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মহম্মদ খাঁ কোথায় তাঁর ছাত্রীর এই নারীসুলভ কমনীয়তাটি তাঁর শিক্ষাগুণে আরও ফুটিয়ে তুল্‌বেন, না, তা না করে তিনি তাকে কুশ্রী তান, অসম্ভব চড়া পর্দায় গাওয়া ও গানের মধ্যে বার বার নিষ্ঠিবন ত্যাগ করতেই শিখিয়েছেন। কিন্তু বোধহয় আমাদের ওস্তাদদের গানের এসব কদশ্রী আনুষঙ্গিকের জন্য আক্ষেপ করা নিষ্ফল ও বাহুল্য। অন্ততঃ তাতে তাঁদের সংশোধন করা যাবে না। কারণ সব কিছু ম'ত সৌকুমার্যও বহু সাধনালভ্য—অশিক্ষিত, আত্মম্ভরী, সংকীর্ণচেতা ওস্তাদদের মধ্যে এ-গুণটির দেখা মিলবে কোত্থেকে?

* * *

ভূপাল থেকে উদয়পুর প্রয়াণ।

উদয়পুর অতি মনোরম শহর। পিতৃদেবের নাটকের প্রসাদে, তথা মীরাবাইয়ের কাহিনী শুনে শুনে উদয়পুরের প্রতি হৃদয়ে পূর্বরাগ জ'মে উঠেছিল দর্শনের আগেই। উদয়পুর গিয়ে তাই মুগ্ধ হয়েছিলাম বলাই বেশি। নীল হ্রদ, অপরূপ প্রাসাদ, শাদা ময়ুর—দূরে আরাবল্লী গিরিমালা! স্বপ্নময়ী নগরী বৈ কি। কিন্তু উদয়পুরের রূপের কথা রেখে গুণের—অর্থাৎ গুণীর—কথাই বলি।

উদয়পুরের মহারাণার দুটি খ্যাতনামা সভাগায়ক আছেন। একদিন তাঁদের গান শোনা গেল মহারাণার মন্ত্রীর প্রসাদে। মন্ত্রীমহাশয়ের স্বভাব অতি সরল। একদিন আমাকে বললেন: "মশাই, আপনার গান যতই শুনি ততই মুগ্ধ হই—এ আপনার দম ফুরোয় না তো!" ব্যস, আমার গানের অন্য কোনো গুণের সম্বন্ধে তিনি নীরব—শুধু দম আশ্চর্য! যাই হোক, তাঁর স্কন্ধে আমি ভর করেছিলাম আরো এই আশায় যে তাহ'লে রাজসভার রত্নগুলির গান শোনা যাবে। ভুল ভাবি নি। মন্ত্রী মহাশয় তলব করলেন সভাগায়কদের।

দুজন হাজিরি দিলেন তটস্থ হয়ে: জিয়াউদ্দীন খাঁ ও—মনে পড়েছে না নামটা—কি-একটা-খাঁ। এদের মধ্যে "কি-একটা-খাঁ" জিয়ার চেয়ে সুকণ্ঠ হ'লেও জিয়া তাঁকে হাঁ করতে দিলেন না বলাই চলে। কোনো কোনো বড় ওস্তাদ ছোট ওস্তাদদের হাত থেকে বেমালুম তানপুরো কেড়ে গান ধরেন—পিতৃদেব বলতেন প্রায়ই হেসে। বলতেন: "ওরে! সে রকম ওস্তাদ আজকাল মেলে না—যে 'তোম্ না তোম্ না হুম্ হুম্' করতে করতে শেষে বলে 'তোম্ তো কখনই না!" কিন্তু তিনি জিয়াউদ্দিনকে দেখেন নি তো, তাই জানতেন না যে "সে-রকম-ওস্তাদ" প্রাগৈতিহাসিক অতিকায়দের ম'ত নির্বংশ হয় নি আজো। হয়েছিল কি, কি-একটা-খাঁ ও জিয়া দুজনে ডুয়েট ধরেছিলেন—কোথাও কোথাও ওস্তাদকুলে ভ্রাতৃযুগল

এভাবে ডুয়েট গান বাজনা ক'রে থাকেন—(বহুদিন পরে আমি একবার আলাউদ্দিন খাঁ-কে এইভাবে স্বরোদ বাজাতে শুনেছিলাম তাঁর জামাতা রবিশঙ্করের সেতারের সঙ্গে। রবিশঙ্কর মহাশয়ের ঠিক এই অবস্থাই হয়েছিল—তাই এ-কাহিনী যদি তিনি পড়েন তবে হয়ত সন্দেহ করবেন যে জিয়াউদ্দিন কি-একটা-খাঁকে কন্যাদান করেছিলেন। আমি নিজে রবিশঙ্করের সেতারে মুগ্ধ হয়েছি তাই সেদিন দুঃখ পেয়েছিলাম শ্বশুর মহাশয় জামাতাকে কন্যাদান ক'রে ভাবেন: "এর পরে আর বাজাবার সুযোগ দেওয়া বাহুল্য। বেশি দান ভালো নয়।" আমার সৌভাগ্যক্রমে পরে একদিন রবিশঙ্কর দিল্লীতে তাঁর বাড়িতে ডেকে দুঘণ্টা তাঁর অপরূপ সেতার-ঝংকারে আমাকে আনন্দে টইটুম্বুর করে দিয়েছিলেন।) *

যাই হোক্, যা বলছিলাম। বিলেতে যখন দুজনে মিলে ডুয়েট গায় তখন সেটা ডুয়েট-ই হয়—মানে দুজনে গেয়ে থাকেন—এঁর পরে উনি। কিন্তু উদয়পুরের সভায় ডুয়েটের চাল অন্য—বিশেষ যদি জিয়াউদ্দিন খাঁর ডুয়েটের নেতা হন। নেতা ব'লে নেতা! গানে তিনি দাবি করলেন যাকে সাহেবি ভাষায় বলে: "সিংহের অংশ": কি-একটা-খাঁ একটা তান সুরু করতে না করতে জিয়া লুফে নিয়ে সহযোগীকে স্তম্ভিত ক'রে নিজে মন্দ্রিত হ'য়ে উঠলেন। ফলে সে-বঞ্চিত বেচারি এমনই কাতর নেত্রে আমাদের দিকে চাইছিল যে মনে হ'ল তাঁর কণ্ঠ ফুর্সৎ না পাওয়ার দরুন তাঁর ক্লিষ্ট চোখ দুটি অভিযোগ করছিল: "দেখুন তো! কি অন্যায়! আমি কি গায়ক, না ঘেসেড়া?"

জিয়াউদ্দিনের কণ্ঠস্বর একদম ভাঙা—কিন্তু তবু তিনি এক একটা তানকে যথাবিধি শোম্-এর গুদামে মহা আস্ফালনে গুদামজাত করতে ছাড়ছিলেন না। এক একবার মনে হচ্ছিল, এ-অসাধ্যসাধনে বুঝি তাঁর গলার মাংসপেশীগুলি ফুল্‌তে ফুল্‌তে ইস্তফা দেবে—কিন্তু

* বন্ধনীর মধ্যে এ-অংশটি ১৯৬০ সালে লেখা

আশ্চর্য তাদের জীবনীশক্তি! মনে বিদ্যুতের মতন চিকিয়ে উঠল—কৈ-মাছের উপমা।

* * *

উদয়পুরে এক শ্রেণীর গায়িকা আছে, তাঁদের বলে ঢুলুনি। এই জাতীয় গায়িকারা গান ক'রে অর্থোপার্জন করলেও গানই তাদের জীবিকার্জনের একমাত্র পন্থা নয়। সেই জন্যেই হোক্ বা না হোক্ তারা গান করবার সময় ঘোম্‌টা খোলে না। সেদিন দুজন ঢুলুনি গাইতে লাগল ও তাদের মধ্যেই একজন বাজাতে লাগল, উভয়েই অবগুণ্ঠিতা। সকলের সাম্‌নে কোনো মেয়েকে ঘোম্‌টার আড়ালে গাইতে দেখা যে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা, এ কথা সত্যনিষ্ঠ পাঠক স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই।

সে যাই হোক্, ঢুলুনি দুজনের কণ্ঠস্বর বেশ মিষ্ট—দেখা গেল। শুধু তাই নয়, তাঁদের কণ্ঠস্বর যে কী অসম্ভব রকমের জোরালো সেটা না শুনলে সম্যক্ ধারণা করা কঠিন। তাদের গলার প্রবলতা উপভোগ করলে মন বিহ্বল হ'য়ে শুধায় বৈ কি—অবলা নামটি এঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা? কারণ তাঁদের গলার দুর্দান্ত তেজের কাছে যে অনেক সবল মিঞাকেই নাক খৎ দিয়ে হার মানতে হবে, এটুকু বেশ জোর ক'রেই বলা যায়। কিন্তু বোধ হয় সর্বদা এত জোরে গাওয়ার দরুণই, তাদের গলার মধ্যে একটা নিটোল পূর্ণতার ভাব নষ্ট হ'য়ে গেছে। কেমন যেন একটা ভাঙা ভাঙা ভাব—যদিও সেজন্য স্বর তাদের অমিষ্ট হ'য়ে ওঠে না।

গান অবশ্য তাদের সাধারণ, যদিও তার মধ্যে একটু তাল-মানও আছে ও অল্প-স্বল্প সুরের হের-ফেরও আছে। কিন্তু তবু মোটের উপর একঘেয়েই বলব। কারণ যদিও তাদের গানকে ঠিক লোক-সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না, তবু লোকসঙ্গীতের চেয়ে বিশেষ উচ্চাঙ্গেরও নয়। কাজেই একঘেয়ে না হয়েই পারে না।

এ-কথায় একদল লোক হয়ত একটু আপত্তি ক'রে উঠবেন যে, লোকসঙ্গীতকে আমি ঠেশ দিয়ে কথা বলছি। এ রকম আপত্তি উঠবার আশঙ্কা করার কারণ আছে। বাংলাদেশের একজন গুণী ও জ্ঞানী শিল্পী আমাকে একদিন অম্লান বদনে বলেছিলেন যে, folk-musicকে classical music-এর চেয়ে কোনোও অংশেই হীন বলা যেতে পারে না। এ-ধরণের কথা বস্তুতঃ এতই অসার যে, প্রতিবাদ করতেও ইচ্ছা করে না। তবু লোকসঙ্গীত পন্থীদের উৎসাহ সম্প্রতি একটু বেশী দুর্দান্ত হ'য়ে উঠেছে ব'লে এ প্রসঙ্গে দুএকটা কথা বলি।

আসল কথা folk art-এর মধ্যে আর্ট হয়ত থাকতে পারে, কিন্তু বড় আর্টের দেখা মিলতে পারে না। কারণ খুবই সহজ—এমন কি স্বতঃসিদ্ধ বললেও চলে। কারণ এই যে, শিল্পজগতে সব বড় সৃষ্টিই গড়ে উঠেছে বহুদিনের সাধনার ফলে—হঠাৎ-গজানো ক্ষণোৎসাহ-বশে নয়। শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহ আবশ্যক হ'লেও আরো কিছু থাকা চাই। এর মধ্যে একটি অপরিহার্য।

আসল কথা, লোকশিল্পের (folk art) মধ্যে শিল্পকলা হয়ত কিছু কিঞ্চিৎ থাকতে পারে, কিন্তু বিকশিত অনবদ্য রূপসৃষ্টির দেখা মিলতেই পারে না। মানুষ রূপের জগতে অপরূপকে মূর্তি দিয়েছে কোনো আকস্মিক উৎসাহ বা আবেগ বশে নয়—বহুদিনের সাধনার ফলে। শিল্পকারুতে আবেগ উৎসাহ চাই বটেই তো, কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটি উপাদানও থাকা চাই—সাধনা। বহু সাধনার অন্তে তবেই মানুষ রাগসঙ্গীত বা সুরসম্পাত (হার্মনি) সৃষ্টি করেছে; চিত্রকলার বর্ণসম্পাতের নিয়ম আবিষ্কার করেছে; কাব্যে ছন্দোবন্ধ গ'ড়ে তুলেছে; ভাস্কর্যে সারল্যের সঙ্গে অলংকারের সুসমঞ্জস মিলনের প্রাণের কথাটি প্রাণে উপলব্ধি করেছে। এক কথায়, প্রকৃতি দেবী তাঁর আন্তর সৌন্দর্যের মর্মবাণীটি সহজে শোনাতে চান না। দীক্ষা চাইলেই দীক্ষা পাওয়া যায় না। দীক্ষা পাবার অধিকারী হয় কেবল সেই সাধক যে মন্ত্র পেলে পরম নিষ্ঠায় তাকে

জপ করবার শক্তি ধরে—নিষ্ঠা বিশ্বাস ও অধ্যবসায়কে বরণ ক'রে। সাধনা বিনা সিদ্ধি নেই, থাকতে পারে না। পুরাতনপন্থীরা বা অতিসারল্যপন্থীরা যতই কান্নাকাটি করুক না কেন, কালে কালে প্রগতির স্রোত পিছু হটে না*—ইংরাজিতে যাকে বলে thou shalt not put the clock back—মানুষ আর্টে সমৃদ্ধির স্বাদ একবার পেলে আর পারে না অতীতের নিরাভরণ সারল্যের মহিমাগান ক'রে কৃতকৃত্য হ'তে। লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য থেকে আধুনিক রূপকার বড়জোর নবসৃষ্টির কিছু মালমশলা আহরণ করতে পারেন, কিন্তু লোকশিল্পের আদিম আধ-আধ-ভাবে ফিরে গিয়ে, হাতের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলতে পারেন না। এ-লক্ষ্মীর নাম—সাধনালব্ধ সমৃদ্ধি।

* * *

আমার "ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা"র সঙ্গীতাধ্যায় শেষ হয়েছিল ১৯২৬ সালের শেষের দিকে। তার পরে আমার সঙ্গীতচর্চায় বৈরাগ্য আসে ধীরে ধীরে—কি ভাবে আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে প'ড়ে শেষে পণ্ডিচেরি প্রয়াণ করি, সে-কাহিনী আমার "স্মৃতিচারণ"-এর দ্বিতীয় পর্বের শেষে লিখেছি। পণ্ডিচেরিতে পুরো আট বৎসর অজ্ঞাতবাস ক'রে তিন মাসের জন্যে ফিরে আসি কলকাতায়। ফিরে এখানে-ওখানে নানা নবীন সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে দেখা হয়। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে "দিন-পঞ্জিকা" অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বলি। সব শেষে লিখব কীর্তন ও ভজনের কথা।

* * *

আমি লক্ষ্নৌ থেকে বম্বে হয়ে পণ্ডিচেরি পাড়ি দিই ১৯২৮ সনে

* ইতিহাসে রুচির অবনতি দেখা যায়—কিন্তু তার পরেই ফের আসে তার নবজন্ম—renaissance.

নভেম্বর মাসে। সেখানে অজ্ঞাতবাস করি ১৯৩৭ সনের মার্চ অবধি—আট বৎসরের উপর। তার পর কলকাতায় এসে তিন মাস ধ'রে নানা গায়ক-গায়িকার গান শুনি।

এ আট বৎসরে প্রথমেই চোখে পড়ল নবযুগের অভ্যাগমে নতুন অনেক কিছু অঘটন ঘ'টে গেছে। মনে পড়ত সে সময়ে বারীনদা'র (মহামতি ৺বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) একটি রসিকতার কথা। বারীনদা তখন পণ্ডিচেরিতে প্রায় মৌনী হয়ে একান্তে বাস করছেন। একদিন এলেন তাঁর এক আগেকার বন্ধু—১৯২৯ সনে হবে। বারীনদা তাঁকে শুধালেন: দাদা, বলো তো, কলকাতায় কি কি ঘটছে আজকাল? ছেলেরা দলে দলে সিগারেট খাচ্ছে?"

"খাচ্ছে।"

"মেয়েরা গান গাচ্ছে?"

"বিষম গাচ্ছে।"

"ট্রামে বাসে অকুতোভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

"তা আর বলতে!"

"ঘোমটা খুলে?"

"স-দাপটে।"

"নাচছে প্রাণের মায়া ছেড়ে?"

"অক্ষরে অক্ষরে।"

বারীনদা হাহাকার ক'রে ব'লে উঠলেন: "ঐ দেখ, আমি বার বার সেজদাকে (শ্রীঅরবিন্দকে) ব'লে এসেছি যে, ঐ সব ঘটবেই ঘটবে। ঘটলও। কেবল—" কপাল চাপড়ে—"আমি দেখতে পেলাম না।"

তার পর তিনি কলকত্তায় এসে এসবই চুটিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন—১৯৩০ সনে। কিন্তু আমার চোখে বাংলার নওজোয়ান ও প্রগতিশালিনীদের নবকীর্তি চোখে পড়ে ১৯৩৭ সনে। দেখি, সত্যিই মেয়েরা চমৎকার গান গাইছে—আর রীতিমত ওস্তাদি গান:

ঠুংরি ও খেয়াল। বিখ্যাত সঙ্গীতগুরু ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে শিখে তিন-চারটি মেয়ে গীতশ্রী উপাধি পায়। (তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি অল্প-স্বল্প গানও শিখিয়েছিলাম।) শ্রীগিরিজাশঙ্করের অসামান্য সঙ্গীতপ্রতিভার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল অনেকদিন আগে যৌবনে, যখন আমি বহুবারই মুগ্ধ হয়ে তাঁর খেয়াল-ঠুংরি শুনেছি। বিখ্যাত হার্মোনিয়মবাদক গণপৎরাওর শিষ্য শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়িতে বড়বাজারে গিরিজাবাবু আমাকে সানন্দেই আপ্যায়িত করতেন তাঁর সদাশয় গীতিকৌলীন্যে। "গীতিকৌলীন্য" কথাটি ব্যবহার করছি এই জন্যে যে সে-যুগে আমি আর কোনো বাঙালী গায়ককে খাস হিন্দুস্থানী চালে এমন মধুর ঠুংরি গাইতে শুনি নি। তাঁর মুখে কত অপরূপ ঠুংরিই যে শুনেছি—গাইতে গাইতে তাঁর ঈষৎ রক্তিম চক্ষুতারকা আধনিমীলিত হ'য়ে আসত—আজো মনে পড়ে।

কিন্তু গান গাওয়া এক—গান শেখানো আর। একথার ভাষ্য এই যে বড় গায়ক হ'লেই বড় শিক্ষক হওয়া যায় না, যেমন বড় সাধু হ'লেই বড় গুরু হওয়া যায় না। ইংরাজিতে বলে: "Leaders are born, not made." ঠিক তেমনি বলা যায়: "Gurus also are born, not made." গিরিজাবাবুর সাঙ্গীতিক গুরুশক্তি ছিল সহজাত। তাই তিনি তাঁর শেষ বয়সে বহু শিষ্য-শিষ্যাকে খাঁটি হিন্দুস্থানী চালে খেয়াল ও ঠুংরি শিখিয়েবাংলা দেশের সঙ্গীত-আবহকে সমৃদ্ধতর ক'রে রেখে যান। বাংলার উদার মহৎ সঙ্গীতসাধকদের ইতিহাস যদি কোনোদিন লেখা হয় তবে গিরিজাবাবুর নাম তাতে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকবে। কিন্তু যা বলছিলাম।

এই সময়ে একদিন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার রোডে আমাদের আসরে এসে গান করেন। আমি ভীষ্মদেবের গান একবার সঙ্গীতসমাজে শুনেছিলাম। তখন তিনি গেরুয়াধারী বালক। আমি খানিকক্ষণ তাঁর অদ্ভুত স্বরসাধনা ও কালোয়াতি কসরৎ শুনে

বিস্মিত তথা বিরক্ত হয় উঠে এলাম, ভাবলাম সদীর্ঘশ্বাসে : "এমন মেধাবী ছেলেটি এত অল্পবয়সেই পড়ল কি না ওস্তাদিয়ানার খপ্পরে! হায় রে, এর সমাধি হবে কোস্তাকুস্তির গহ্বরে!"

এ হেন ভীষ্মদেবের কী অদ্ভুত পরিবর্তন! গানে সুরের কী নিখুঁৎ শুদ্ধি! মিড়ের কি মনোহারিত্ব! তানের কী মাধুর্য! সর্বোপরি, এক সম্পূর্ণ অনন্যতন্ত্র ভঙ্গিতে সাধা অপূর্ব খেয়াল, ঠুংরি, সার্গম! বিলম্বিত আলাপের সে কি বাহার! আবার তার পরেই জলদ তানকর্তবের সে কি অদ্ভুত দীপ্তি! সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম তাঁর সার্গমে। সার্গমে এমন বিস্ময়কর প্রাণোচ্ছল কলাকারুর প্রবর্তন অভাবনীয় বৈকি! দক্ষিণী কালোয়াৎরা সার্গমের বিদ্যুৎগতিতে ভীষ্মদেবকেও হার মানাতে পারে মানি, কিন্তু কিছুক্ষণ সে-প্রাণহীন সানিধাপা সানিধাপা শুনতে শুনতে মন হাঁপিয়ে ওঠে—মনে হয় কেবল শরৎচন্দ্রের কথা : "সে-ওস্তাদ থামেন তো?" দক্ষিণীরা সত্যিই একবার গমক বা সার্গম সুরু করলে আর থামে না।

কিন্তু ভীষ্মদেবের ছিল আশ্চর্য সৌষ্ঠবজ্ঞান—sense of proportion : গাইতে গাইতে নানা তানালাপ ক'রে খানিকক্ষণ সার্গম ক'রেই তিনি পুনরায় গানের বুড়ি ছুঁয়ে চমৎকার সমাপ্তি টানতেন। কিন্তু শুধু এই থামতে জানাই নয়, তাঁর সার্গমের একটা গাঁথুনি ছিল—আর সে গ্রন্থনে ছিল প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পরিকল্পনা। অযথা সার্গমের চর্কিবাজি বহু ওস্তাদেই করতে পারে। কিন্তু ভীষ্মদেব স্তরে স্তরে সাজাতেন তাঁর প্রতিটি সার্গম-আলাপ, যার ফলে তাঁর স্বরালাপ হয়ে উঠত দীপ্যমান, জীবন্ত। সব রসগ্রহণেই চিনতে-পারার আনন্দ একটা গভীর তৃপ্তির পরিমণ্ডল গ'ড়ে তোলে যার উল্টো পিঠে থাকবে অচিনের আবির্ভাব। অর্থাৎ যা জানি তাকে উস্কে দিয়ে যা কখনো সম্ভব ভাবি নি তার প্রবর্তন—এ দুই-ই চাই। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন আমাদের প্রতি মনে বিরাজ করে যুগপৎ দ্বিবিধ স্ববিরোধী চাহিদা (demand):

"Novelty is difficult for the human mind, or ear, to accept, but novelty is asked for all the same in all human activities for their growth, amplitude and richer life". এক কথায়, মানুষ যুগপৎ অতীতের রক্ষণশীল দুর্গবাসীও বটে, আবার ভবিষ্যতের নব নব রাজ্যের পথিকৃৎও বটে।

ভীষ্মদেবের গানে মনের এ-দ্বিবিধ তৃষ্ণারই খোরাক মিলত। খেয়ালে তিনি রকমারি আরোহ অবরোহ মিড় মূর্ছনা সার্গমে প্রতি রাগের চলতি রূপটির ছবি এঁকেই সুরু করতেন নব নব সৃষ্টি: নতুন নতুন তানের বিদ্যুৎঝলক, নতুন নতুন মিড়ের মঞ্জুল ব্যঞ্জনা, জানা বোল তানের পথে ঘরে ফিরেই আবার নানারঙা অজানা আকাশে সুরবিহারে মনপ্রাণ মাতিয়ে তোলা। তাঁর গান যখনই শুনেছি তখনই মুগ্ধ হয়েছি আর মনে হয়েছে অমর কবি হাফেজের বিখ্যাত পার্সী গজলের দুটি চরণ:

মুৎরিবে খুশনভা বেগু তাজাবতাজা নও বনও।
বাদয়ে দিলকুষা বেজু তাজাবতাজা নও বনও॥

তোমার কলকণ্ঠে গুণী যেন শুনি
নিতুই নব গান।
নিতুই নব রঙিন সুধা ঢেলে ক্ষুধা
মিটাও, মাতাও প্রাণ।

* * *

এই সময়েই একদা হঠাৎ বিখ্যাত দরদী বন্ধু পাহাড়ী সান্যালের ওখানে একটি নম্র যুবকের সঙ্গে দেখা। পাহাড়ী বলল: "মণ্টুদা! এর নাম তারাপদ চক্রবর্তী, অদ্ভুত গায়ক…" ইত্যাদি। পাহাড়ী, স্বভাবে চির-উদার, উজিয়ে উঠতে তার কোনোদিনই বাধত না। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি নামজাদা ক্রিটিকই কারুর প্রশংসা করবার আগে সব প্রথম ভাবেন—"রয়ে সয়ে বাপু! রোসো,

অপরে তারিফ করছে কি না আগে খবর নিই। ক্রিটিক নাম বজায় রাখতে হবে তো!” পাহাড়ীর মধ্যে এ-ধরণের পরিণামদর্শিতা কেউ কোনোদিন দেখে নি। কোনো গান সত্যিই ভালো লাগলে কে কি বলবে না বলবে সে ভ্রূক্ষেপও করত না। সঙ্গীতজগতে এহেন উদার সর্বভুক্ সমজদার যে বড় বেশি মেলে না ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই ক্ষেত্রে তার সঙ্গে খ্যাতনামা সঙ্গীতকোবিদ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতিগতির গভীর স্বভাব সাদৃশ্য আছে। এদের দুজনকে তাই স্নেহ না ক'রে থাকতে পারা যায় না। মনের কথা বলতে বাধে না। বাউলের গানে আছে না?

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা,
দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে-জনা
(ও তার) নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দু'এক জনা।
ভাবে ভাসে রসে ডোবে,
(ও সে) উজান পথে করে আনাগোনা।

কিন্তু মনের মানুষের কথা থাক্, তারাপদ-রূপী গানের ফানুসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীকে গানের ফানুষ উপাধি দিয়েছি, না দিয়ে উপায় নেই ব'লে। কারণ তিনি যে-ধরণের তানের দীপ্তি, মিড়ের মাধুর্য, সুরের ব্যঞ্জনা তাঁর গানে ফুটিয়ে তোলেন সে-ধরণের তানালাপ মনের অন্তরীক্ষে দেখতে দেখতে ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে। তাঁর সুরে নানা স্ফুলিঙ্গের ফুল্‌ঝুরি ঝ'রে পড়ে। সার্গমও তাঁর আশ্চর্য, কিন্তু তাঁর গানে যে-রসটি আমাদের মনকে সবচেয়ে রসিয়ে তুলেছিল সে হ'ল তাঁর সুরের মাধুর্যের সাবলীলতা ও বৈচিত্র্য। নানা ওস্তাদের কাছ থেকেই তিনি নিয়েছেন নানা গ্রহণীয় সুরের অলঙ্কার। অনেকে এজন্যে তাঁকে দোষ দেন—বলেন, সাত নকলে আসল খাস্তা। কিন্তু

আমি এখানে তাঁর পূর্ণ সমর্থন করি। একরকম মন আছে চলে একটি ধারায়—যেমন ছিলেন আমার খেয়াল-ওস্তাদ শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে রক্ষণশীলতার আদর্শ। তাই তিনি একদিন আবদুল করিমের "তূজীনবোল্" দুর্গা রাগে ঠুংরির একটি মিষ্ট তান ব্যঞ্জনার ছোঁয়াচ লাগতে না লাগতে স্থানত্যাগ করেন। আমাকে বলেন ঃ "এ খেয়ালই নয় দিলীপ, এ খামখেয়াল।"

আমি তাঁর বক্তব্য বা বেদনা যে বুঝি না তা নয়। কাশীর ধ্রুপদী হরিনারায়ণবাবুও চন্দনচৌবের খেয়াল-ভঙ্গিম ধ্রুপদ শুনে এমনিই ব্যথিত হতেন। তাঁর মতে—তাঁর গুরু ৺রামদাস গোস্বামীর ঘরানা যদুভট্টী ধ্রুপদ ছাড়া আর সবই অ-ধ্রুপদ, সুতরাং অগ্রাহ্য। আমাদের বাংলা দেশেও এই শ্রেণীর শুচিবেয়ে সমালোচকের অভাব নেই। তাঁরা চান গতানুগতিকতা, বলেন শিষ্য শিখবে কেবল একটি মাত্র ওস্তাদের কাছে, হয়ে উঠবে তারই ঘরানা তানের উত্তরাধিকারী। তারাপদ এদের দলে নন। তিনি যে-ওস্তাদকেই ভালোবেসেছেন তার কাছেই নাড়া বেঁধে শিখতে প্রস্তুত। পাহাড়ী যে-সময়ে তারাপদর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয় সে-সময়ে গান শেখার সুযোগ ও সঙ্গতি তাঁর ছিল না—পাহাড়ীই আমাকে বলেছিল। কিন্তু তারাপদর ছিল প্রতিভা, তার উপর নিষ্ঠা—যাকে বলে মণিকাঞ্চন যোগ। উত্তরকালে তিনি গিরিজাবাবুর কাছে রীতিমত শেখেন অনেক কিছু। কিন্তু তার আগেই তিনি আবদুল করিমের ঢঙে দীক্ষা নিয়েছিলেন গ্রামোফোন থেকে। তাঁর সঙ্গীতসাধনার ইতিহাস আমার বর্ণনীয় নয়, আমি জানিও না। আমি তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করবার সুযোগ পাই নি, যেমন পেয়েছিলাম ভীষ্মদেবের, শচীন্দ্র দেব বর্মণের বা জ্ঞানপ্রকাশের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর ছিল সেই শ্রেণীর প্রতিভা যাকে প্রতিভা ব'লে চিনতে বেগ পেতে হয় না, এক আঁচড়েই চেনা যায়।

তাঁর শেষ গান শুনি কবে মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে,

তাঁর গুরুদেব ৺গিরিজাশঙ্করের জন্মোৎসবে তিনি আমাকে যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন আমি তাঁর গান শুনে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম! তাঁর গান শুনে আরো অনেক কিছু আনন্দ আহরণ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মানুষের সব সাধ পূর্ণ হয় না তো—তাই সুযোগ হয় নি। তবে আশা হয় আবার তাঁর কমনীয় মুখে স্নিগ্ধ নম্র হাসি দেখব ও শুনব তাঁর সুরেলা কণ্ঠের মধুর উচ্চসঙ্গীত।

এ বৎসর (১৯৬০) তাঁর জন্মদিনে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাঠাই। সেই অভিনন্দনটি উদ্ধৃত ক'রেই তাঁর প্রতিভার অঙ্গীকারের ইতি করব। আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম তাঁকে ঃ

চিরদিন যেন তুমি কলতান উৎসারি' জীবনে
সঙ্গীত-সুধায় তব আনন্দ বিলায়ে জনে জনে
কৃতকৃত্য হও, হে অক্লান্ত দীপ্ত সুরের পূজারী!
বাণীর মূর্ছনা তব কণ্ঠে নিত্য উঠুক ঝংকারি'
আরো দিনে দিনে—যেন সমাদর তব প্রতিভার
আমরা করিতে পারি কৃতজ্ঞ অন্তরে অনিবার।

*　　*　　*

১৯৩৭ সনে কলকাতায় গিয়ে আমার আর একটি মস্ত লাভ হয়, সঙ্গীতকোবিদ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়। লাভ বই কি! এ-চলচঞ্চল জগতে এমন সুশীল, সুকুমার, স্নেহশীল স্থায়ী বন্ধু পাওয়া সহজ নয়। আজ মানুষ সংসারে জীবন-সংগ্রামে নাস্তানাবুদ হয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, প্রীতি-স্নেহকে সে বেশি আমল দিতে বেগ পায়। তার জীবনের মূল মন্ত্র হল ঃ

সময় যে নাই, শুধু আগে চল্ ভাই!
কী বা আসে যায় দিশা যদি রে না পাই?

তবু চলতেই হবে—ছুটিও না চাই।
শুধু কাজ—যতিহীন ছন্দে সদাই।
বার্ণার্ড শ বলেন ঃ "ব্যস্ততা চাই।
ক্লান্তি এলেও ওরে, তুলিস নে হাই।
ঘুমহারা চোখে চল্ চল্ সবে ধাই,
অকূলপাথারে চল্—সুখী তো তারাই
ভাবে না ভুলেও যারা, দিয়ে তাই তাই।"

স্তান কিন্তু আজও ভাবতে ভুলে যায় নি—সাক্ষাৎ রেডিওতে সরকারী চাকরি ক'রেও স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস করে—কিমাশ্চর্যমতঃ-পরম্? ওর মধ্যে এই চিন্তাশীলতার পরিচয় পেয়েই আমি ওকে প্রথম ভালোবেসে ফেলি। তার পর দেখি ভালোবেসে বুদ্ধির কাজই করেছি, কারণ ওর শুধু যে নানা মানসগুণ আছে তাই নয়, আছে সেই সদা সজাগ হৃদয়বত্তা যার অভাবে কেউ শিল্পী হতে পারে না। কত রকম বাজনাই যে ও বাজাতে পারে ঃ গিটার, হার্মোনিয়ম, তবলা—আর যাই বাজাক তার সুরের আগুন নিরন্তর ফুল কাটে—তুবড়ির মতন। পরে তারাপদর সঙ্গে রাগসঙ্গীতও ও শিখেছিল গিরিজাবাবুর কাছে। আর ও কি কম ওস্তাদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছে! ফলে আজ ও রাগরাগিণীর নাড়ীনক্ষত্র জানে। একটি দৃষ্টান্ত মনে আছে—অবিস্মরণীয়। কেসর বাঈকে আমি অভ্যর্থনা করছি থিয়েটার রোডে—(তাঁর কথা পরে বলছি)—তিনি একটি অপ্রচলিত রাগ গাইলেন। আমি ধরতে পারলাম না। এক বাঙালি ওস্তাদকে শুধালাম জনান্তিকে ঃ "কি রাগ স্যর?" "স্যর" মুখে ঘোর গাম্ভীর্যের ঘনঘটা টেনে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন ঃ "কত রাগ আছে!" সমর্সেট ম'ম একবার লিখেছিলেন, বয়সের অনেক দোষ আছে কেবল এই একটি গুণ আছে যে সে "জানি না" বলতে বেগ পায় না। কিন্তু ওস্তাদ "স্যরে"র তখনো তেমন বয়স হয় নি তো,

তাই কেমন ক'রে স্বীকার করেন যে, কেসর বাঈ এমন রাগ গাইছে যা তাঁর অজানা? আমি তখন জ্ঞানকে শুধালাম। সে ব'লে দিল টুক ক'রে—কিন্তু সবিনয়েঃ "বোধ হয় অমুক রাগ" (রাগটির নাম মনে করতে পারছি নে।) গানের শেষে কেসর বাঈকে বললামঃ "অপূর্ব গাইলেন শেষ রাগটি। কিন্তু কী রাগ, বাঈ সাহেব!" তিনি বললেন হেসেঃ "আমি শুনেছি আপনার বন্ধুটির ফিশ ফিশ। তিনি ঠিকই ধরেছেন। কেবল আমি জানতাম না বাংলা দেশে এ-রাগটি কেউ চিনতে পারবে।"

এহেন জ্ঞানপ্রকাশের নামকে নাম না ব'লে উপাধি বলতেই সাধ যায়। কিন্তু এ-ও বাহ্য। জ্ঞানের গুণপনা নানামুখী। তার সবচেয়ে বড় গুণ কোন্‌টি বলা কঠিন, তবে একটি মহাগুণ নিশ্চয়ই এই যে, সে স্বভাবে বিনয়ী। আর একটি—যে সে উদার। আর একটি—যে সে গুণগ্রাহী—ওস্তাদ তথা ওস্তাদপন্থীদের মধ্যে যে-গুণটির দেখা পেলে বলতে ইচ্ছা হয় শুধু এই নয় "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে," —জুড়ে দিতে হয়ঃ "কে গো ক্ষণজন্মা, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ?"

ঠাট্টা নয়। মানুষ প্রায় সব শিল্পেই সচরাচর অনুদার—এবং সব দেশেই। ঈর্ষা বা মাৎসর্য তার মজ্জাগত। পরের একটু আধটু ভালো হোক সবাই চায় বটে, কিন্তু চেনাশোনা কারুর বেশি শ্রীবৃদ্ধি দেখলে সাড়ে পনের আনা মানুষের মনই খুঁৎ খুঁৎ করে। ঠিক যেমন রাজনীতিতে রাজনৈতিক দিক্‌পালরা চান সব দেশই বেঁচেবর্তে থাকুক, কিন্তু অত্যধিক প্রগতিশীল না হয় যেন। "ব্যালান্স অফ পাওয়ার" মূল সূত্রটিই তাঁদের জপমন্ত্র। ওস্তাদ ও ওস্তাদপন্থীদের মধ্যে এই সংকীর্ণতা রাজনৈতিকদের মতন ব্যাপক, এতটা বললে অত্যুক্তি হবে, কিন্তু আমার "ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা"য় আমি এত শত ওস্তাদের বোলচাল শুনেছি যে শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়েছিঃ নাঃ, এ-জাতের স্বভাব হ'ল—আত্মশ্লাঘা, আর স্বধর্ম—পরশ্রী-কাতরতা।

জ্ঞান ঠিক ওস্তাদ না হোক—ওস্তাদপন্থী ও খাঁটি গুণী—মানতেই হবে। তবু কেমন ক'রে ও মন খুলে সব গুণীরই গুণপনার প্রশংসা করে ভেবে আমি বারবারই আশ্চর্য হয়েছি। বিশেষ ক'রে ওস্তাদপন্থী হয়েও ভজন গানে ও সাড়া দেয় কেমন ক'রে— আজো ভেবে কূল-কিনারা পাই নি। বহুদিন ধ'রে ভজন কীর্তন গাইছি—ওস্তাদপন্থী কাউকে বড় একটা আমার ছায়া মাড়াতে দেখি নি। ভজন কীর্তন কি আর গান? গান তো ধ্রুপদী দুন চৌদুন, খেয়ালী কালোয়াতি, হলক তান, তেলানা, চতুরঙ্গ, সার্গমের চরকিবাজি, তালিয়ানার ধুমধড়াক্কা....ইত্যাদি।

এহেন পরিবেশে যে গ'ড়ে উঠেছে তার মনে ভক্তিমূলক সরল বাংলা বাউল কীর্তন বা হিন্দি স্তব ভজনে শ্রদ্ধা এল কোত্থেকে? তাই জ্ঞানকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ব'লে কি আমি ভুল করেছি?

শুধু তাই নয়—বাংলা লেখায়ও ওর হাত আছে। সাহিত্যসাধনায় হয়ত ও কোনোদিন মন দেবার সময় পাবে না, এ-সাধনায়ও সব সাধনার মত হাড়ভাঙা খাটতে হয়। কিন্তু লেখার সাধনা না ক'রেও জ্ঞান কেমন ক'রে ওর রুশদেশে সফরের কথা এমন চমৎকার ঝরঝরে বাংলায় লিখল আমি ভেবে পাই নে। ওর "এলেম নতুন দেশে" বইটির ছত্রে ছত্রে ওর নম্র অথচ ভাবুক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। রুশদের স্বভাবসহৃদয়তার যে-ছবিটি ও স্বল্প-পরিসরে এঁকে ফুটিয়ে তুলেছে—সে-ছবিটি সত্যিই মনোজ্ঞ, রসময় তথা তথ্যমূলক। এ-বইটি থেকে ওর চরিত্রের একটি চারুচিত্র রুশদেশের চিত্রের সঙ্গে পাশাপাশি ফুটে উঠেছে পদে পদে।

কিন্তু না—এ-ও বাহুই বলব। তাই এবার জ্ঞানের সাঙ্গীতিক প্রতিভার একটু তারিফ করি। ও গুণী বা চিন্তাশীল ওস্তাদপন্থী বা সমঝদার এসবই ওর ব্যক্তিরূপের এক-একটা দিক্‌। কিন্তু ও সব-আগে গানে সুন্দরের সাধক—যন্ত্রী, মৃদঙ্গী, গায়ক, হার্মোনিয়মবাদক, সুরকার, যন্ত্র-ঐক্যতান গঠক, সর্বোপরি সঙ্গীতে চিরজিজ্ঞাসু,

শিক্ষার্থী। এ সব গুণের জন্মেই ওকে গুণধাম উপাধি দেওয়া চলে, কিন্তু ও সব-আগে অভিনন্দনীয় এই জন্মে যে ওর মধ্যে দেখতে পাই আমরা একটি খাঁটি বাঙালি শিল্পিপ্রাণ সুরসাধককে ও সৃষ্টিকুশল গুণীকে। তাই আমি সর্বান্তঃকরণে চাই ও আরো বড় হয়ে ফুটে উঠুক। ওকে বলতে চাই—ব্যক্তিগত ভাবে নয়—বাংলার সুরসাধকদের প্রতিনিধি হিসেবেই :

বাণীর বরে পেয়েছ সুর-জ্ঞানের যে-প্রতিভা
প্রাণ সাধনা তোমার যেন প্রকাশে সেই বিভা।
রেডিওলোকে দোসর তব হয় ত আজ নাই,
সে-গণ্ডীর মধ্যে শুধু থেকো না হে সদাই।

* * *

১৯৩৭-৩৮-৩৯ সনে কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মণের সঙ্গে সংস্পর্শে আসি। সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকত—গান শিখত ভীষ্মদেবের কাছে —নানা সভায় গাইতে হ'ত—নানা শিষ্যকেও শেখাতে হ'ত—কাজেই আমার আসরে বড় একটা আসতে পারত না। তবু যখনই আসত আমার মন ভ'রে উঠত—শুধু আমার নয় সকলেরই। বড় বংশের কুলতিলক—আভিজাত্য ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ। যেমন মিষ্টি হাসি, তেমনি অনবদ্য শীলতা, তেমনি উদার গুণগ্রাহিতা—সর্বোপরি এমন মধুর সুরেলা কণ্ঠ বেশি শোনা যায় না। খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠ বলব না, ধ্রুপদ খেয়ালে সিদ্ধি লাভ করতে হলে কণ্ঠের যতখানি স্থিতিস্থাপকতা থাকা দরকার ততখানি স্থিতিস্থাপকতা হয়ত তার ছিল না, যেমন ছিল কিন্নরকণ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর। ভীষ্মদেবের মতন আশ্চর্য দীপ্তিও তার গানে ছিল না, তারাপদর সুরের জাদুও মিলত না তার গানে, কিন্তু একটি জিনিষ তার ছিল যার দাম সুররসিকের কাছে অমূল্য : সরল স্নিগ্ধ গান গেয়ে শ্রোতার হৃদয়ে একটি স্নিগ্ধ সুষমার পেলব পরিমণ্ডল গ'ড়ে তোলা। এ সবাই পারে না। বলতে কি,

যারা সবচেয়ে কম পারে তাদেরি নাম ওস্তাদ। তারা খুবই পারে চমকে দিতে, তাক লাগাতে, ঝড় বওয়াতে, কিন্তু মন গলাতে হলে ওস্তাদির 'পরেও আরো যে-বস্তুটি চাই তার নাম মন-গলান মাধুর্যের নির্ঝর। এই অমূল্য সম্পদটি ছিল শচীন্দ্রের সহজাত—বিশেষ ক'রে ওর ভাটিয়ালি গান শুনে মুগ্ধ হ'ত জনে জনে। নানা বাংলা গানেও ওর কলকণ্ঠ এমন সহজে প্রাণসঞ্চার করতে পারত যে বলতে ইচ্ছা হ'ত :

"যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।"

ওর আরো একটি মস্ত সম্পদ্ ছিল—বাংলা গানের সুরশৈলীতে ওর বিশিষ্ট মনোহর ঢং। ওর তান মিড় মূর্ছনা গমক কিছুই দুরূহ ছিল না, কিন্তু এমন সুকুমার ললিত গতিতে টুক টুক ক'রে ও চলাফেরা করত যে কান ও মন দুইই খুশি হয়ে উঠত দেখতে দেখতে। ওর এ-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অল্পদিনের মধ্যেই অনেক বাংলা গায়কের ঢংকে প্রভাবিত করেছিল। তাই এ-দুঃখ রাখার আমার জায়গা নেই যে, এমন গুণী ও সৃজনী প্রতিভা গানের রাজধানী "আসর" ছেড়ে গেল গানের শ্মশান সিনেমায়। আশা করা যাক, সিনেমা থেকে ও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে পুনরায় সত্যিকার সঙ্গীত সাধনায় মনোনিবেশ করবে। কারণ সিনেমায় সে কিছুতেই দিতে পারবে না যা তার দেওয়ার আছে। সে-আবহে গান হয় না—হয় শুধু গানের নামে সস্তা সুরের ফিরি ক'রে পাঁচজনের মনস্তুষ্টি-সাধন, যে-তুষ্টির না আছে স্থায়িত্ব, না গৌরব। শচীন্দ্র দেব বর্মণ স্বভাবশিল্পী, বিশেষ ক'রে বাংলা গানে সে একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েই ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল। লীলাময়ের লীলা বোঝা ভার—এহেন মানুষ গান ছেড়ে চ'লে গেল কি না গানের নামে সিনেমার হুকুমবরদার হ'তে। এ কাজ করুক তারা যারা গানে স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারে না। শচীন্দ্র এ-শ্রেণীর অশিল্পীর দলে যোগ দিল কি দুঃখে? কৈশোরে জন মর্লির একটি লেখা পড়েছিলাম, মনে পড়েছিল ও যখন সৃজন ছেড়ে সিনেমায় প্রয়াণ করে। তিনি বলেছিলেন, যে-মানুষ সাহিত্যে বড় হতে পারত,

সে যদি রাজনীতি আখড়ায় ঢোকে তবে তাকে কেবল একটি উপাধি দেওয়া যায়ঃ "পাগল"।

আমি বলছি না সিনেমার আবহাওয়া রাজনীতির আবহাওয়ার মতন মিথ্যাজীবী। সিনেমায় ভালো ছবি হয়, অন্ততঃ হতে পারে কালেভদ্রে—যে-সব ছবি দেখে মন উন্নত হয়, প্রাণে পুলক জাগে। নির্মল চিত্তরঞ্জন নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সিনেমায় বেশির ভাগ দর্শক চায় দেখতে—শুনতে নয়। কাজেই গান (বা আবহসঙ্গীত) সেখানে সস্তা শ্রুতিহিল্লোলের উর্ধ্বে উঠতে ভরসা পায় না—অর্থাৎ ভালো গান হয় না, যার জন্যে চাই যথাযথ পটভূমিকা ও সময়। আধুনিক সিনেমায় এ দুইয়েরই অভাব। দু'মিনিটের বেশি গাইলেই দর্শকেরা উসখুস করে। ইউরোপে আমেরিকায় যে-সব সঙ্গীতচিত্র (musical comedies) অভিনীত হয় সেখানেও কোনো গুণী উচ্চসঙ্গীতের প্রবর্তন করতে গেলেই রাতারাতি নোটিস পানঃ "ব্যস! এখানে নয়—অন্যত্র গোচারণ করো গে।" এ হেন পরিবেশে লাভ হতে পারে শুধু সরকারী মেডেল বা ভাতা কিন্তু বিশুদ্ধ গানের শিল্পী চির-প্রসাদার্থী শুধু বীণাপাণির ও সুকুমার মতিসঙ্গীতরসিকের—সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার নয়।

* * *

এই সময়ে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অকুণ্ঠেই বলব তাঁর সমকক্ষ কণ্ঠ বাংলা দেশে এ যুগে আমি আর শুনি নি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ত্রিবিধ সুরলোকেই তিনি অবাধে বিচরণ করতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠে তানেরও কি আশ্চর্য দীপ্তিই না ফুটে উঠত! গানে মিষ্টতা মাধুর্য ভঙ্গি-বৈশিষ্ট্য ও ওজস্, চারটি প্রধান গুণই প্রধানতঃ মনকে মুগ্ধ করে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানের সব চেয়ে বড় সম্পদ ছিল তাঁর ওজস্। মিষ্টতা বা মাধুর্য তাঁর ছিল না এমন কথা বলি না, কিন্তু ভীষ্মদেব

বা তারাপদর মতন তিনি ওস্তাদি গানে মাধুর্যের অফুরন্ত নির্ঝর বহাতে পারতেন না। কিন্তু কোনো গুণীরই প্রতি সুবিচার হয় না, তাঁর কাছে কি পেলাম না তার উপরে জোর দিলে। দেখতে হবে কি পেলাম তাঁর কাছে গানের রাজ্যে, কি কি রসের আমদানি হ'ল তাঁর প্রতিভার প্রসাদে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের অলোকসামান্য গীতিপ্রতিভা ও ওজঃশক্তি শ্রোতার মনকে পুলকিত ক'রে তুলত মুহূর্তে। গান সুরু করবার আগে উদাত্ত কণ্ঠে যখন তিনি সা-তে দাঁড়াতেন তখন মনের মধ্যে শিহরণ জাগত সত্যিই। বাংলা দেশ সুকণ্ঠের দেশ। আমার স্মৃতিচারণে আমি একথা বলেছি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে। কিন্তু এ যুগে সে সুকণ্ঠের উত্তরাধিকারী দেখতে পাই না যেমন মহৎপ্রাণের ও কুলতিলকের বড় একটা দেখা পাই না। এ হেন যুগে জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের পুরুষালী ওজস্বী কণ্ঠ শুনে আনন্দে অধীর হয়ে প্রার্থনা করতাম ঃ তিনি দীর্ঘজীবী হোন—বাংলার মুখ রাখুন—গানে ওজসের পাগলা ঝোরা বইয়ে। কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ?—এ-হেন অসামান্য কিন্নরের কণ্ঠও অকালেই নীরব হ'ল। আজ পর্যন্ত তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারে নি আর কেউ।

* * *

এবার আমি বলব একটি সুকুমারীর কথা। সে ছিল আমার গীতিশিষ্যা—কন্যাশিষ্যা। তাই তার প্রতি আমার পক্ষপাত হওয়া স্বাভাবিক। হোক। গুণীরা তার সম্বন্ধে আমার তারিফকে বাদ-সাদ দিয়ে গ্রহণ করবেন নিজের নিজের মর্জিমাফিক। আমি তার কথা এখানে বলতে চাই, কেননা ভদ্র শিক্ষিত সমাজে মেয়েদের মধ্যে তার মতন আশ্চর্য প্রতিভা আমি আর দেখি নি। আমার এ কথায় ভীষ্মদেব, জ্ঞানপ্রকাশ ও হিমাংশু দত্ত সায় দিতেন—আরও বহু সঙ্গীতকোবিদ সায় দিতেন—বিশেষ ক'রে তার মুখে ভীষ্মের শেখানো গান শুনে। স্বয়ং ফৈয়স খাঁও তার প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে তাকে

আশীর্বাদ করেছিলেন—জ্ঞানই বুঝি এ সুখবরটি আমাকে দিয়েছিল।

কিন্তু সার্টিফিকেটের বিড়ম্বনা কেন ?—যখন তার অপরূপ কণ্ঠের পরিচয় আজও পাওয়া যায় গ্রামোফোনে ?

তার নাম উমা বসু। অকালে কাল তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়, নইলে সে আজ হাজার হাজার সঙ্গীতরসিকদের তার কণ্ঠামৃত বিলিয়ে তৃপ্ত করত। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তারাপদও তাকে শেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন সে ভীষ্মের কাছে শিখছিল ব'লে ভীষ্ম রাজি হয় নি। আমার ইচ্ছা ছিল, সে বাংলার এই দুই শ্রেষ্ঠ গায়কের কাছেই শেখে।

আমি তাকে শিখিয়েছিলাম শতাধিক বাংলা গান—বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, ভক্তিসঙ্গীত, হিন্দি ভজন, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও আমার স্বরচিত গান ও দু'চারটি উর্দু গজল। তার অতুলনীয় ভাবকণ্ঠে সে প্রতি গানেরই রূপ দিত এমন আশ্চর্য মধুর সুরে যে, যে-ই শুনত সে-ই মুগ্ধ হ'ত। পরে ভীষ্মের কাছে বিলম্বিত চালে শংকরা, বসন্ত, জৌনপুরী প্রভৃতি রাগও সে শিখেছিল। ভীষ্ম তাকে প্রায় এক বৎসর গান শিখিয়ে হঠাৎ পণ্ডিচেরী চ'লে এসে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থাকে বছর দুই। উমা আকুল হয়ে লিখত আমাকে যে, রোজ তিন ঘণ্টা ক'রে তানপুরার সঙ্গে ভীষ্মের ও আমার শেখানো গানগুলি সাধে—কিন্তু আরও শিখবে কার কাছে ? ভীষ্মের সে ছিল বিষম ভক্ত।

তার গীতিপ্রতিভা সম্বন্ধে আমি আমার "ছায়ার আলো" উপন্যাসে লিখেছি যা আমার লিখবার ছিল। তাই সে-সবের পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য হবে। তবু ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকার দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে তার প্রতিভার একটু তর্পণ রেখে যেতে চাই এই জন্যে যে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত অভিজ্ঞতার যখন একটা এজাহার লিখে রাখতে যাচ্ছি, তখন তার সম্বন্ধে কিছু না লিখলে বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কিন্তু কীই বা লিখব তু'কথায় এ অসামান্য প্রতিভাময়ীর সম্বন্ধে—শুধু এইটুকু ছাড়া যে, তার তুলনা এক সে-ই; আর কেউ নয় ? তাকে আমি প্রায়ই বলতাম যে, মেয়েদের মধ্যে তার সমকক্ষ কণ্ঠ আমি কেবল একটিমাত্র শুনেছি, কাশীর মোতি বাঈ। সে আমার মুখ চেপে ধ'রে বলত : "কী যে বলো মণ্টু-দা ! কার সঙ্গে কার তুলনা ? কোথায় আমি—গানের ক খ শিখেছি মাত্র, আর কোথায় মোতি বাঈ ! লোক হাসিও না তুমি। যা-ও।" ইংরেজিতে unselfconscious রূপবতী ও গুণবতীর কথা পড়েছি। উমা ছিল এই শ্রেণীর মেয়ে—"নাত্মসচেতন-প্রতিভা"।

কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তার গান এত লোকের মন টানত। গর্বের লেশও ছিল না তার। শিশুর সারল্য ও নম্র লাজুকতা ছিল তার সহজাত কবচ-কুণ্ডল। এ সম্পর্কে মনে পড়ে কেসর বাঈয়ের একটি উক্তি। বলি-ই না কেন। এক ঢিলে তুই পাখী মারা হবে : কেসর বাঈয়ের কথাও ত বলাই চাই—তাই এইখানেই সুরু করি প্যারেন্থেসিসের ভঙ্গিতে। ফিরে খেই ধরব—উমার কথায়ই ফিরে এসে। মন্দ কি—স্মৃতিচারণে এ পদ্ধতি যখন বেমানান নয় ?

কেসর বাঈয়ের নাম আমি আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখ করেছি। বোম্বাইতে তিনি গায়িকাদের মুকুটমণি এ কথা সর্ববাদি-সম্মত। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমাকে বলেছিলেন বহুদিন আগে যে, কেসর বাঈ যে-ঢঙে খেয়ালের দীক্ষা নিয়েছেন সে-ধরণের খেয়ালে সিদ্ধিলাভ করতে হলে বহু বৎসরের সাধনা চাই। আলওয়ারের বিখ্যাত গায়ক আল্লাদিয়া খাঁ ছিলেন তাঁর গুরু। তাঁর গান আমি শুনেছি, তবে বোদ্ধাদের মুখে শুনেছি যে, তিনি খেয়ালে না কি আবদুল করিমের চেয়েও বড় ছিলেন। এ কথা সম্ভবতঃ সত্য, কারণ কয়েক বৎসর আগেও এ-অশীতিপর বৃদ্ধ বোম্বাইতে এক সঙ্গীতসভায় সবাইকে চমৎকৃত ক'রে দেন তাঁর আশ্চর্য রসোচ্ছল খেয়ালে। শুধু গুণী হিসেবেই নয়, ওস্তাদ হিসেবেও তিনি খেয়ালীদের নমস্য ছিলেন

—তাঁর কণ্ঠসাধনা না কি এমন অদ্ভুত ছিল যে, তিনি অসম্ভব অসম্ভব স্বরবিন্যাস অবলীলাক্রমে গেঁথে চলতেন—অর্থাৎ এমন সব দুর্ধর্ষ স্বরগ্রামের তান দিতেন যা কণ্ঠে পরিস্ফুট করতে পারে কেবল অঘটন-পটীয়সী প্রতিভা।

আমি নিজে এ শ্রেণীর কুস্তি-কসরতের বিরোধী। এতে মানুষকে অবাক্ করা যায় বটে কিন্তু মুগ্ধ করতে হলে চাই হৃদয়ের রসায়ন, শুধু দীর্ঘ কণ্ঠসাধনায় মেলে না মন-ভিজিয়ে প্রাণ কাড়বার শক্তি। আল্লাদিয়া খাঁর যে এ শক্তি ছিল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—তাঁর শিষ্যা কেসর বাঈয়ের গান। অনেকে বলেন কেসর বাঈ গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে গুরুকে ছাপিয়ে গেছেন মিষ্টত্বে। এহেন প্রতিভাময়ীর গান শুনতে আমি উৎসুক ছিলাম—বলাই বাহুল্য।

পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে ১৯৩৮ সনে যখন কলকাতার এক সঙ্গীত-সম্মিলনীতে প্রথম কেসর বাঈয়ের গান শুনি তখন গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। এমন আশ্চর্য শান্ত-সমাহিত অথচ বলিষ্ঠ খেয়াল ইতিপূর্বে কোনো বাঈজীর মুখেই শুনিনি, এক ভাওনগরের চন্দ্রপ্রভা ছাড়া। তবে চন্দ্রপ্রভারও এমন উদাত্ত কণ্ঠ ছিল না। জয়পুরের গহর বাঈ অপরূপ খেয়াল গাইতেন বটে কিন্তু কেসর বাঈয়ের ওজস্ তাঁর ছিল না। বলতে কি, গানে যে মেয়েরা ওজস্বিনী হতে পারে এ আমি কেসর বাঈকে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কেসর বাঈকে কিন্নরকণ্ঠী বলব না মোতি বাঈয়ের মতন। কিন্তু খেয়ালের রসদীপ্তিতে তিনি জ্যোতির্ময়ী। তাঁর একটি অপরূপ কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি স্তবকে দীর্ঘ তান নিতে নিতে যখন ধাপে ধাপে আরোহণ বা অবরোহণ করেন তখন সে-সব তানের মধ্যে একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য-পরিকল্পনার (architecture) দেখা মেলে ব'লে মনে শুধু পুলকই নয়, সম্ভ্রমও জাগে, ইংরেজিতে যাকে বলে catching one's breath—বাংলায় বলা চলে, ভাব-লাগা বা থম্‌কে যাওয়া।

তাঁর খেয়ালের বিস্তারিত বর্ণনা বাহুল্য, কেন না বহু সঙ্গীত-

সম্মিলনীতেই গান গেয়ে তিনি হাজার হাজার শ্রোতাকে চমৎকৃত করেছেন। তবে এই সূত্রে একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করব স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে।

তাঁর অপূর্ব খেয়াল শুনে মুগ্ধ হয়ে আমার সাধ হ'ল তাঁকে প্রকাশ্য অভিনন্দন করার। কিন্তু শুনলাম, তিনি পাঁচশ' টাকার কম দক্ষিণায় কোথাও গান না। দ'মে গেলাম, তবু গেলাম ম্যাজেষ্টিক হোটেলে, যেখানে তিনি উঠেছিলেন।

ঠিক দু'দিন আগেই অমৃত বাজারে আমার দীর্ঘ প্রশস্তি ছাপা হয়েছে। তাতে আমি লিখেছি, কেসর বাঈ খেয়ালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আবদুল করিমের পর এমন খেয়াল কলকাতায় কেউ গায় নি··· ইত্যাদি। কিন্তু সব শেষে লিখেছিলাম যে কেসর বাঈ খেয়ালের শেষে "দ্রৌপদী পুকারী" বলে একটি ভজন না গাইলেই ভালো করতেন। গানটির বিষয় ছিল দ্রৌপদী কাতর হয়ে ডাকছেন লজ্জানিবারণকে যখন দুঃশাসন তাঁর বস্ত্রহরণে উদ্যত। কেসর বাঈ এহেন করুণ গানটি গাইছিলেন সদর্পে হাসতে হাসতে। আমি তাই ব্যথিত হয়ে লিখেছিলাম, খেয়ালের নিটোল আনন্দ পরিবেষণ করার পরে ভজনের নামে এহেন অশোভন ওস্তাদি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনি রসভঙ্গ করেছেন।

আমি ভাবিও নি যে, কেসর বাঈ আমার লেখাটি পড়বেন কষ্ট ক'রে। কিন্তু তাঁর ওখানে উমার সঙ্গে পৌঁছিয়ে দেখি তাঁর মুখে ঘনঘটা। আন্দাজ করলাম কারণটা। আপশোস হ'ল বৈকি—না লিখলেই হ'ত তাঁর অ-ভজনের কথা।

যা ভয় করেছিলাম : কেসর বাঈ বিরস কণ্ঠে আমাকে বললেন, ৫০০৲ দক্ষিণা বিনা তিনি গান করেন না। আমি সবিনয়ে বললাম, "আমরা অত মোটা দক্ষিণা দিতে পারব না, তবে আমরা করব তাঁর যথোচিত সম্বর্ধনা—কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ও বোদ্ধারা আসবেন তাঁর অপূর্ব খেয়াল শুনতে।" তিনি বিরস কণ্ঠে বললেন, "আমার

অপমান ক'রে এখন সম্বর্ধনা ? গোড়া কেটে আগায় জল ?" আমি অবাক্ হয়ে বললাম, "অপমান ? সে কি বাঈ সাহেব ? আমি লিখি নি কি এ-যুগে এমন খেয়াল আবদুল করিমের পরে আর কেউ পরিবেষণ ক'রে নি কলকাতা শহরে ?" তিনি একটু নরম হয়ে বললেন, "তা লিখেছেন বটে—কিন্তু তার পরেই টিপ্পনি করেছেন যে, আমি ভজন গাইতে পারি না। লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট হ'ল না এতে ?" আমি বললাম, "কেমন ক'রে ? আপনার সিদ্ধি খেয়ালে, ভজনে নয়। যদি কেউ কোনো বড় কবিকে বলে—তিনি কবিতা লেখেন অপূর্ব, কিন্তু গদ্য তাঁর কাঁচা, তাতে কি তাঁর মাথা হেঁট হয় ?" বাঈ সাহেবের অপ্রসন্ন মুখের মেঘ আরো একটু ফিকে হয়ে এল। তিনি বললেন, "ভজন বলতে আপনি কি বোঝেন শুনি ? ভজনে আদৌ তানালাপ থাকবে না ?" আমি বললাম, "কেন থাকবে না ? তবে ভাব বজায় রেখে। করুণ ভজনে করুণ তান, উল্লাসের ভজনে উল্লাসের তান। জম্‌কালো ভজনে জম্‌কালো তান। কথাটা এই যে, ভাব ও সুরের বিরোধ না ঘটে। সর্বোপরি, ভজনে ভক্তিভাবের সুর আসা চাই—নইলে সে ভজন হয় না।"...ইত্যাদি নানা কথাই বললাম—খানিক তর্ক হ'ল এই নিয়ে—সব মনে নেই, বলাই বাহুল্য—আমি শুধু সারমর্মটুকু পেশ করছি।

শেষে কেসর বাঈ বললেন, "আচ্ছা, আপনি শোনান তো একটি ভজন!" আমি তখন আগে উমাকে একটি ভজন গাইতে ব'লে পরে নিজে একটি মীরা ভজন গাইলাম। শুনে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কেসর বাঈ আমার কাছে করজোড়ে বললেন, "আপনার আহূত সভায় আমি গাইব—কিন্তু দক্ষিণা নেব না। তবে আমাকে আপনি একটি লকেট মেডাল দেবেন আপনার নাম লিখে।"

বাইরে এসে উমার সে কি উল্লাস! "মেরে দিয়েছ মণ্টুদা! উঃ, কেসর বাঈ গাইবেন থিয়েটার রোডে। কী চমৎকার!" ব'লেই হাততালি। তার সে উচ্ছল সরল আনন্দ ভুলব কি কোনোদিনও!

একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমাদের ভজনের গানের পর উমা তাঁর কাছে "বুল বুল মন" গানটি গেয়েছিল। এ-গানটি গ্রামোফোনে গেয়ে ওর খুব নাম-ডাক হয়। এ-গানটির সুর একটি রুষ গান থেকে নেওয়া—অর্থাৎ একটি রুষ গানের সুরে গাওয়া জর্মন গান আমি শিখেছিলাম তারই সুরে বসান। জর্মন গানটির প্রথম ছু' লাইন—

Nachtigal O Nachtigal!
Suesse holde Nachtigal!

(এ গানটির আমি টেপ-রেকর্ড করিয়েছি সঙ্গীত-জিজ্ঞাসুদের জন্যে—হয়ত কোনোদিন কারুর কাজে আসবে।)

এ গানটির বাংলা রূপে আমি আস্থায়ীতে—মূল সুর (ইমন ঠাটে)—রেখে অন্তরার শেষে ষড়জ-সংক্রমণ ক'রে (অর্থাৎ সা বদ্‌লে)

চল দূর বন্ধুর উদ্দেশে
চিরচরণের শরণের রেশে

চরণ ছুটিতে ভৈরবী টেনে এনেছি—এ ষড়জ-সংক্রমণের সাহেবী নাম modulation, রক্ষণশীল রাগপন্থীরা এ গানটির রাগমিশ্রণকে বলবেন "গুরুচণ্ডালী"—আরও এইজন্যে যে, এতে ভৈরোঁরও আমেজ আছে। এ-গানটির মূল সুরকে ভেঙে আমি ঢেলে সাজিয়েছি। অনেকে খুব ভালোবাসতেন এ-গানটি বিশেষ করে উমার কলকণ্ঠে। বলতেন, "ও যখন গায় 'বুলবুল মন ফুল সুরে ভেসে চল নীল মঞ্জিল উদ্দেশে'—তখন সত্যিই মনে হয় যেন বুলবুল গাইছে।" মহাত্মা গান্ধিও একে সাদরে "বুলবুল" ব'লে ডাকতেন যে-কথা আমার "ভূস্বর্গ-চঞ্চল-"এ লিখেছি।

সত্যিই অপরূপ গাইত ও এ-গানটি—যাঁরা গ্রামোফোনে শুনেছেন তাঁরা মানবেনই মানবেন। নানা নিখুঁৎ তানের সঙ্গতে ওর মুখে এ-গানটি দশ গুণ মধুর শোনাত। কেসর বাঈ এ-গানটি শুনে মুগ্ধ

হয়ে ওর সুরের কান ও সুধা কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত তারিফ ক'রে আমাকে বল্লেন, "ওকে গান শেখাবেন ভালো ক'রে, ওর মধ্যে আছে সুরের আলো।" এই ধরণের তারিফ তিনি সত্যিই করেছিলেন তবে ঠিক কি ভাষায় মনে নেই।

যাই হোক, কেসর বাঈকে আমি একটি সোনার লকেট উপহার দিই—তার মধ্যে গুরুদেবের ছবি রেখে। কিন্তু লকেটে তাঁর গুণের পুরস্কার হবে কেমন ক'রে। কিনি থিয়েটার রোডে আশ্চর্য গেয়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। গানের আগে তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করল আমার মামাতো বোন ব্রজবালা। সে-আসরে কলকাতার শ্রেষ্ঠ গায়ক, গুণী ও সমজদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন —সঙ্গীতকোবিদ অমিয়নাথ সান্যাল ছিলেন তাঁদের পুরোধা তথা প্রতিনিধি।

এর পর কেসর বাঈয়ের অনুরোধে তাঁকে নিয়ে আমি বরানগরে গিয়েছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে—শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে। কবিগুরু প্রথমে আমাকে বলেন তিনি ক্লান্ত। কিন্তু কেসর বাঈ গান ধরতে না ধরতে তাঁর মুখের ক্লান্তি কেটে গেল। তিনি ব'সে ছিলেন একটি আরাম-কেদারায়, আমি মাটিতে তাঁর পদতলে। কি আনন্দই যে পেয়েছিলাম এভাবে ব'সে কবির নানা মৃদু বিস্ময়োক্তি শুনতে। তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে একজন প্রকৃত বোদ্ধা ছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম নতুন ক'রে যখন কেসর বাঈয়ের গান শুনে তিনি আমার অনুরোধে তার সঙ্গীত সম্বন্ধে তখনি তখনি এই উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি লিখে দিলেন এক আঁচড়ে (২৩-৪-১৯৩৮)

"I consider myself fortunate in securing a chance for listening to Kesar Bai's singing which is an artistic phenomenon of exquisite perfection. The magic of her voice with the mystery of its varied modulations has repeatedly proved its true significance not in any

pedantic display of technical subtleties mechanically accurate, but in the revelation of the miracle of music only possible for a born genius. Let me offer my thanks and my blessings to Kesar Bai for allowing me this evening a precious opportunity of experience.

Rabindranath Tagore"

এর পরে কেসর বাঈয়ের প্রতিভা সম্বন্ধে আর কি বলার থাকতে পারে? তাই উমার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

* * *

উমার সম্বন্ধে শুধু কেসর বাঈ নয়, কাশীর মোতি বাঈয়ের প্রশস্তিও ভুলবার নয়। মোতি বাঈয়ের কথা আমি আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে লিখেছি। তবু রেকর্ড রাখার জন্যে এখানে সংক্ষেপে ফের বলি তাঁর কথা উমার প্রসঙ্গে।

১৯৩৮ সনে উমা, আমার বোন মায়া ও ভাগিনী এষাকে নিয়ে আমি কাশ্মীরে যাই। সেখানে উমাকে গান শেখাতাম শিকারায় বসে শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে। সে কাহিনী লিখেছি আমার "ভূস্বর্গ চঞ্চল"-এ। তাই এখানে শুধু বলি—দিনের পর দিন তাকে আমার নিত্য নতুন গান শেখানর অভিজ্ঞতা আজও আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় সম্পদ হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—লাহোরে লালা লাজপৎ রায় হাসপাতালের জন্য আমাদের একটি চ্যারিটি কন্সার্ট দেওয়া। শুধু উমা ও আমি গাইলাম—শেষে এষা নাচল উমার গানের সঙ্গতে। উমা সে আসরে দুই সারঙ্গিয়ার মাঝে ব'সে যখন ধরল আমার শেখানো উর্দু গজল: "নিভা উলফৎকা ইন দো নাজুকোঁমে সখ্‌ত মুস্কিল হয়" তখন সারঙ্গিয়া দু'জনের মধ্যে একজন ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে সঙ্গীকে শুধাল: য়ে কৌন বাঈ হৈ ভাই?" দ্বিতীয়

সারঙ্গিয়া জবাব দিল: "আরে, বাঈ নহীঁ—বঙালিন্ হয়।" প্রথম সারঙ্গিয়া জবাব দিল: "ঝুট! বঙালিন-কি আওয়াজ কভি ঐসী সুরীলী হো সকৃতী?"

এহেন সুরেলা কলকণ্ঠীকে নিয়ে গেলাম কাশী। সেখানে উমা ধরল, মোতি বাঈয়ের গান শোনাতেই হবে। কি করি? খোঁজ ক'রে গেলাম মোতি বাঈয়ের রমণীয় সুরনিলয়ে। তিনি সাদরে আমাদের জলযোগ করিয়ে তাঁর কিন্নরকণ্ঠের গান শোনালেন। গানের শেষে উমা তো আনন্দে অধীর! বলে, "মণ্টুদা, এ যে সাক্ষাৎ পাপিয়া!" মোতি বাঈকে বলতে তিনিও ওকে ধরলেন গান শোনাতে। উমা ভয়েই সারা: মোতি বাঈয়ের কাছে সে গাইবে কি? মোতি বাঈ তাকে অনেক তুতিয়ে-পাতিয়ে গাওয়ালেন দু'তিনটি শেষ গানটি ছিল "বুলবুল মন"। গানের শেষে মোতি বাঈ সস্নেহে ওর চিবুক ধ'রে বললেন: বুলবুল কভি পপীহাসে ডরতী হয় ক্যা?" (বুলবুল কি পাপিয়াকে দেখে ভয় খায়?) ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ গায়িকার প্রশংসার পর উমার সঙ্গীত-প্রতিভার সম্বন্ধে আর না লিখলেও চলে। তবু শুধু আর একটি কথা বলব এখানে যেহেতু আমার এ-প্রশস্তি অপ্রাসঙ্গিক নয়।

উমার কণ্ঠের সম্পদ্ ছিল অসামান্য বটে, কিন্তু আরো অসামান্য ছিল ওর চরিত্রের অবিশ্বাস্য পবিত্রতা। ও কুমারী ছিল শুধু দেহে নয়—মনেও। ইংরেজীতে যাকে বলে vestal virgin, তাই এ একটুও অত্যুক্তি নয়। যাঁরাই ওর সংস্পর্শে আসতেন, মুগ্ধ হতেন শুধু ওর কণ্ঠসুধা পান ক'রে নয়—সেই সঙ্গে ওর কুমারী-হৃদয়ের পবিত্রতার স্পর্শ পেয়েও বটে। ওর মুখে তিনটি গান শুনে মুগ্ধ হ'ত সবাই: "তব চিরচরণে চাই শরণাগতি", "বুলবুল মন",* "আধফোটা ছোট

---

*"তব চিরচরণে" ও "বুলবুল" গান দুটি আমার "অনামী"তে ছাপা হয়েছে "আধফোটা ছোট তারা" গানখানি লতিকা দেবীর লেখা—কোনো বইয়ে ছাপা হয়েছে কি না জানি না।

তারা।" ভক্তি বলতে যা বোঝায় তা ওর ছিল না—তবে ওর হৃদয়ের নিটোল পবিত্রতা ভক্তির রূপ নিয়েই ওর কণ্ঠে জেগে উঠত ও গান ধরতে-না-ধরতে। "আধফোটা ছোট তারা" গানটি আমি ভৈরবী সুরে বসিয়ে গ্রামোফোনে গাওয়াই ওকে দিয়ে; সে সময়ে এ গানটি খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। একদিন ওদের বাড়িতে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর অভ্যুদয় হয়। আমি ওকে বলতে ও ধরল:

ঐ তারার মালার কুঞ্জে
আমি আধফোটা ছোট তারা
ঐ চাঁদের আলোর পুঞ্জে
হই আবেশে আপনহারা।

তারাপদবাবু মুগ্ধ হয়ে "আহা আহা" ক'রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওকে গান শেখাতে চাইলেন—যে-কথার উল্লেখ করেছি। এখানে এ-ঘটনাটির পুনরুল্লেখ করলাম শুধু এইজন্যে যে, এ-গানটি ওর কণ্ঠে যেমন মানাত তেমন আর কারুর কণ্ঠেই নয়, কারণ এই শুভ্র আধফোটা ছোট তারার ভাবানুষঙ্গে ওর শুচিস্নিগ্ধ কুমারী-রূপশ্রীকে ঘিরে সত্যিই গড়ে উঠত যেন একটি বিকচ তারার আধফোটা সুষমা। মনে পড়ে একদিন এক ভক্ত সভায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ওর মুখে "মন তুমি কৃষিকাজ জান না" গানটি শুনে সাশ্রুনেত্রে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: "এ পুরানো রামপ্রসাদীটিকে তোমার পবিত্র হৃদয়রসে যেন তুমি ফের রসিয়ে জাগিয়ে তুললে মা—তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

অদৃষ্টের পরিহাস: ও পরপারে প্রয়াণ করল মাত্র একুশ বৎসর বয়সে, আর ওর জন্মদিনে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪২ সনে।

খবর পেয়েছিলাম আমি মান্দ্রাজে—যে কথা বিশদ ক'রে লিখেছি আমার "ছায়ার আলো" উপন্যাসে।

সেদিন ওর তর্পণে লিখেছিলাম:

ব্যথারে আড়ালে রাখি' আনন্দ যে বিলাত উচ্ছলি' ;
সুন্দরের মন্ত্র যার প্রাণে নিত্য তুলিত ঝংকার ;
বসন্তের মন্দাকিনী ছিল যার হাসির উৎসার ;
সুখ সে বাসে নি ভালো, সুধা ভালোবেসেছিল বলি' :
টুটিল বীণার তন্ত্রী কেন তার সুর না বাঁধিতে ?
অকালে ঝরিল কেন অবিকচ আলোক-কলিকা ?
আধফোটা ছোট তারা চিত্তে যার জ্বালিত দীপিকা
অবেলায় নিভিল সে কোন্ নব দিগন্তে জ্বলিতে ?
জানি না। কেবল জানি—শুভ্র দ্যুতি ব্যর্থ কভু নয় ঃ
অন্ধকারে অবসান কোথা তার যে চির চিন্ময় ?

* * *

এবার এ-পরিশিষ্টের ইতি করি কীর্তন-ভজনের প্রসঙ্গে। বলি কী ভাবে, কোন্ পথে ভক্তিসঙ্গীতে আমার মন পূর্ণ দীক্ষা নেয়।

"স্মৃতিচারণ"-এর প্রথম পর্বে আমি লিখেছি, কীর্তনের সাঙ্গীতিক মূল্য নিয়ে পিতৃদেবের সঙ্গে আমি কিরকম বাচাল তর্ক করতাম, বলতাম প্রায়ই যে, কীর্তন কানে শুনতে মিষ্টি হলেও সঙ্গীত হিসেবে রাগসঙ্গীতের মতন অপরূপ সৃষ্টি নয়। তিনি হেসে আমার কপালে টোকা মেরে বলতেন ঃ "ওরে বাবা! আগে বড় হ, তবে বুঝবি কীর্তন কী বস্তু! জানিস্, তোর মস্ত ওস্তাদ ঠাকুর্দা শেষ বয়সে কীর্তন শুনে চোখের জল ফেলে এক মস্ত কীর্তনীয়াকে বলেছিলেন ঃ 'গোঁসাইজি, বৃথাই খেয়াল শিখে সময় নষ্ট করেছি, যদি কীর্তন শিখতাম!" একথা শুনে আমি কানে আঙুল দিতাম না বটে, কিন্তু ঘা খেতাম বৈকি! অবশ্য কীর্তন যে শ্রুতিমধুর আমিও মানতাম, তর্ক করার সময়েও ঠাট্টা ক'রে বলতাম ঃ "যে-কান বলে যে, কীর্তন শ্রুতিকটু সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের কোনো অশ্রাব্যশ্রবণের অপরাধে অভিশপ্ত।" আমি তর্কের ঝোঁকে কীর্তনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ

জানতাম তার মোদ্দা কথা এই যে, কীর্তনের শ্রুতিমধুরতা সস্তা লাবণ্য রাগসঙ্গীতের শ্রুতিমধুরতা মহার্ঘ সম্পদ্।

এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন বুঝতে পারি ক্রমশঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের মধ্যে নব নব গভীরতর রসের রসগ্রহণ করার অনুপাতে। কথায় বলে, চাখতে চাখতেই চাখনদার হয়। আমারও ভাবতে ভাবতেই ধীরে ধীরে বোধোদয় হ'ল, আর অমনি আমি দেখতে পেলাম যে, কীর্তন সস্তা শ্রুতিমাধুর্যের বেসাতি করে একথা বলতে পারেন শুধু তাঁরাই যাঁরা কীর্তনের মধ্যে শ্রুতিমাধুর্য ছাড়া আর কোনো গভীরতর মাধুর্যের স্বাদ পান নি। এই স্বাদই হ'ল ভক্তি। তাই কীর্তনের গভীরতম রসের রসিক হতে হলে ভক্তির গ্রাহক হতে হবে, শুধু তার শ্রুতিমধুরতার দর দিলে চলবে না, কারণ কীর্তনের উদ্ভব ভক্তিতে, ভরণ ভক্তিতে, অবসান ভক্তিতে। একটি বিখ্যাত সংস্কৃত স্তব আমি গাই কীর্তনের সুরে ঃ

সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং
দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যম্
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥

সুখের দিন ফুরালে জপি তোমারি বঁধু, নাম ঃ
দুখের নিশি পোহালে গাই তোমারি মধু নাম ঃ
শেষের শ্বাস মিলালে জপি তোমারি শুধু নাম ঃ
হে গোবিন্দ, হে দামোদর, মাধব অবিরাম।

কীর্তনের সম্বন্ধেও এই কথা ঃ তাকে সুখে-দুঃখে, বাদলে-কিরণে, জীবনে-মরণে পেলে তবেই সে হবে পরম পাওয়া। কিন্তু এ-প্রাপ্তির চাবি শুধু ভক্তির হাতে, সুরতালের কি আঙ্গিকের হাতে নয়। সঙ্গীতলোকে এ-ধরণের ভক্তিবাদে নাস্তিক আর্ট্-ফর-আর্ট্স্-সেক বাদীরা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলে আমি নিরুপায়—আমার জীবনের একটি গভীরতম উপলব্ধি কীর্তন—তার কথা বলতে হলে ভক্তির আস্তিক্যকে

পাশ কাটিয়ে সঙ্গীত-শৌখিনতার চাটুকার হব কিসের লোভে? তাই বলবই বলব যে, কীর্তন (তথা ভক্তজনের) বুকের নিশ্বাস, চোখের আলো, হৃদয়ের রক্ত হ'ল ভক্তি—ভক্তিকে বাদ দিয়ে কীর্তনের প্রকৃত মূল্যায়ন খানিকটা সোনার পাথরবাটির স্বরূপ নির্ণয়ের মতনই অসম্ভব—কিম্বা সাহেবী উপমায় বলা যায়ঃ ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়। আমার এ-প্রতিপাদ্যটি প্রাঞ্জল করতে আর একটি উপমা দেব।

১৯২২ সনে বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের রুষ নট-নটীরা বার্লিনে কয়েকটি রুষ নাটক অভিনয় করেন। আমি আমার রুষভাষী বন্ধু শাহেদের সঙ্গে যাই ডস্টয়েভ্স্কির বিখ্যাত "ব্রাদার্স কারামাজভ" উপন্যাসটির নাট্যরূপ উপভোগ করতে। উপভোগ করেছিলাম সত্যিই, কিন্তু তাই ব'লে কি বলব যে, শাহেদ এ নাটকটি থেকে যে নিটোল রসের স্বাদ পেয়েছিল আমি সে-স্বাদের নাগাল পেয়েছিলাম রুষভাষা না জানা সত্ত্বেও? ঠিক তেমনি কীর্তনের প্রাণের কথাটি হ'ল ভক্তির ভাষা, তারি হাজারো ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে কীর্তন নিজেকে জানান দেয়ঃ ভক্তির বীজেই তার উন্মেষ, ভক্তির রসধারায়ই তার পুষ্টি, ভক্তির আলো-হাওয়া আশীর্বাদেই তার উর্ধ্ব-বিকাশ। পিতৃদেব পরিণত বয়সে তাঁর স্বভাব-ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন ব'লেই আমাকে বলেছিলেন যে, বড় না হলে বোঝা যায় না কীর্তন কী বস্তু—কেননা, ভক্তির পূর্ণ বিকাশ বয়সের ভাব ও রুচির পরিপক্কতার অপেক্ষা রাখে।

বড় হলাম বৈ কি শনৈঃ শনৈঃ। কীর্তনের সুরলাবণ্যও কানে ঢুকল, কিন্তু মরমের নাগাল পেল কই? অত্র দোষটা ঠিক বেচারি দিলীপকুমারের নয় যে, বড় হওয়া সত্ত্বেও কীর্তন শুনে মজল না। হয়েছিল কি, আবাল্য পিতৃদেবের নানা কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গ গান আমার ভালো লাগলেও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করার আগে কীর্তনের পালাগান—ভক্তির নাট্যসঙ্গীত শোনার সুযোগ হয় নি। ফিরে এসে

প্রথম মাথুর কীর্তন শুনলাম বিখ্যাত কীর্তনী গণেশ দাসের মুখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে। মনে আছে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কারণ গণেশ দাস ছিলেন ভক্ত তথা সুকণ্ঠ তথা পালাগানে রসস্রষ্টা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যারা দোয়ার দিচ্ছিল তারা থেকে থেকে এমন বেখাপ্পা চেঁচাল ও খোলীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোল বাজাতে বাজাতে এমন কুশ্রী নাচানাচি সুরু করল যে, ক্রমাগতই রসভঙ্গ হওয়ার ফলে শেষটায় আমি বিরক্ত হয়েই স্থান ত্যাগ করি। কাজেই কীর্তনের সঙ্গে এই সূত্রে আমার শুভদৃষ্টি হলেও কীর্তনের ভাষায়

"দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম—
দারিদ্র্য লভিল যেন ঘটভরা হেম।"

এ প্রথম প্রেমের—first love-এর—অভিজ্ঞতাটি হয় নি। আমার ওস্তাদি-রসবিহ্বল মনকে ভক্তিরসোচ্ছল কীর্তনের নীল মোহানার মুখে যিনি রওনা ক'রে দিয়েছিলেন তিনি সে-সময়ে আমার দৃষ্টিচক্রবালের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন আমাকে কীর্তনের প্রাণ—অর্থাৎ ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে। তিনি ছিলেন একটি আশ্চর্য মানুষ—একাধারে মহাকীর্তনী তথা মহাভক্ত তথা মহাগুরুর বালব্রহ্মচারীর শিষ্য ও সেবক। তাঁর নাম "কোকিলকণ্ঠ" রেবতীমোহন সেন।

রেবতীবাবুর খ্যাতি শুনেছিলাম শ্রীখগেন্দ্র মিত্র প্রমুখ পিতৃবন্ধুদের কাছে, কিন্তু তাঁর কীর্তন শোনবার সুযোগ জোটে নি, কৈশোরে ও যৌবনে কীর্তনে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না ব'লেই। চাই নি তাই পাই নি, আর কি! মাঝে মাঝে মনে হ'ত: রেবতীবাবুর সঙ্গে সটাং গিয়ে আলাপ করলে কেমন হয়? কিন্তু ঐ মনে হওয়া পর্যন্তই। তখন সারা ভারত চ'ষে বেড়াচ্ছি ওস্তাদি গানের আবাদ করতে। ভক্ত কীর্তনীর সন্ধানী হবার ফুর্সৎ কই? বেদব্যাস মুনি মহাভারতে উচ্চারণ করেছেন একটি বেদবাক্য: "কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা, পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যঃ"—সব কিছুরই একটা

সময় আছে, মানুষের পরম প্রাপ্তি হয় যথাপর্যায়ে—অর্থাৎ কি না, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না।

এহেন ওস্তাদিমুগ্ধ অবস্থায় কাশীতে এক আসরে গাইছি অতুলপ্রসাদের বাংলা ঠুংরি, এমন সময়ে দেখি ঘরের কোণে একটি গেরুয়া-পরা মূর্তি আর একটি সৌম্যমূর্তির পাশে আসীন। আমার গান শেষ হতে গৃহকর্তা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গেরুয়াধারী কিরণচাঁদ দরবেশের ও রেবতীবাবুর সঙ্গে। এহেন তুই পরম ভাগবতকে আমার গানের শ্রোতা পেয়ে আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম—সমঝদার শ্রোতা যদি 'লাখে না মিলল এক' হয়, তবে ভক্তিমন্ত শ্রোতা মেলে কোটিকে গোটিকই বলব।

বুকের রক্তে ডমরু বেজে উঠল আনন্দে—বিশেষতঃ, চাক্ষুষ ক'রে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য কোকিলকণ্ঠ রেবতীমোহনকে—আমার বহুদিনের অম্বিষ্ট ধন! রেবতীবাবুকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "আহা! এমন ভগবদ্দত্তকণ্ঠ, বাবা! ঠুংরি রেখে কীর্তন গাইবে কবে?" আমি হেসে টুপ ক'রে কায়দাদুরস্ত বিনয়ে বললাম: "যেদিন আপনি শেখাবেন, ঠাকুর!" তিনি হাত জোড় ক'রে বললেন: "আমি ঠাকুর-ঠাকুর নই বাবা, ঠাকুরের ভক্তের দাস।" আমিও সোজা বান্দা নই, পিঠ পিঠ হাত জোড় ক'রে বললাম: "তবে ভক্তের দাসেরও দাসকে একটি কীর্তন শেখান।" তিনি হেসে বললেন: "সে তো হবার জো নেই বাবা! আমি কোনো আসরে মজলিসে কি ড্রয়িংরুমে গাই না, আমি গাই শুধু ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে। তুমি সামনের জন্মাষ্টমীতে যদি কলকাতায় থাক তবে এসো পদ্মপুকুরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের বাড়ী। সেখানে জন্মাষ্টমীর উৎসবে আমি গাইব তিন ঘণ্টা পালাগান।"

নিরাশ হলাম বৈ কি তিনি গান গাইবেন না বলায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু চমকেও উঠলাম শুনে যে, ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে ছাড়া

তিনি আর কোথাও গান না। কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বাবা! কীর্তন ত শ্রুতিবিলাসের জন্যে নয়—কীর্তন হ'ল প্রভুর ভোগ। তাঁকে নিবেদন না ক'রে কোনো কিছুই গ্রহণ করা চলে না। আর ভোগ তাঁকে নিবেদন করলে তবেই হয় প্রসাদ। কীর্তন-সাধনার লক্ষ্য কানকে খুশী করা নয় বাবা, খাঁটি-কীর্তনী কীর্তন গায় ঠাকুরের লীলা-কাহিনীর প্রসাদ নিজে পেতে ও আর পাঁচজনকে পরিবেশন করতে।"

তাঁর কথাগুলি যে অবিকল এইই ছিল তা বলছি না, তবে এইই ছিল তাঁর মোট বক্তব্য। আমি আরও বিস্মিত হ'লাম এ কথা শুনে। গানও যে প্রসাদ হয় কস্মিন্‌কালেও শুনি নি। তাই হয়ত শুনেই গায়ে কাঁটা দিল: এ হেন কীর্তনের দৃষ্টিভঙ্গির—থুড়ি শ্রুতিভঙ্গির—বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবে কে?

তার পর কাশীতে রেবতীবাবুর কাছে কীর্তন শেখা সুরু করলাম। তবে মাত্র দু'খানি কীর্তন তাঁর কাছে শিখেছিলাম: চণ্ডীদাসের—"বিনোদ গলে বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ দোলে" ও "বঁধু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।" এ গানটি আমার খুবই ভাল লাগত কেবল ঐ "পিরিতি" কথাটি ছাড়া। ব্রাহ্মসমাজের তথা আধুনিক সাংস্কৃতিক—বৈদেশিক আবহাওয়ায় মানুষ ত—পিরিতি নাগর বর্গীয় কথা উচ্চারণ করতে বাধত। তাই করতাম কি, "পিরিতি"কে "প্রণয়"রূপ নিষ্কলঙ্ক ব্লাউস পরিয়ে সভ্যভব্য ক'রে গানটির মধুর রসটির আত্মশ্রাদ্ধ করতাম। সুধীগণ কল্পনা করুন ও গানটিতে পিরিতিকে প্রণয়-রূপ বহির্বাস পরিয়ে পেশ করলে দিদিমাকে গাউন পরানর মতন কাণ্ড হয় কি না! মনে পড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ব্রাহ্মসমাজের 'এই শুচিবাই' নিয়ে হাসাহাসি করা। যা হোক গানটি এই:

বঁধু কি আর বলিব তোরে!
অলপ বয়সে পিরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে॥

কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখন জানিবা—পিরিতি কেমন জ্বালা॥

গানটি আমার কী যে ভাল লেগেছিল ভাষার বর্ণনায় ফোটাব কেমন ক'রে? প্রেমের অভিমানের এমন অপূর্ব রূপ কি বৈষ্ণব কবিরা ছাড়া আর কেউ দিতে পেরেছে? ইংরাজি কাব্য অতি উৎকৃষ্ট মানি, কিন্তু সে ভাষাতে কি এমন অভিমান ফোটান যায়? সে ভাষায় অভিমান-শব্দটিরই যে প্রতিরূপ নেই! বহু বৎসর বাদে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে শুনি এ-গানটি শ্রীঅরবিন্দেরও একটি প্রিয় গান। কিন্তু পিরিতির জ্বালার সঙ্গে অভিমানের রস যে ইংরাজি ভাষায় তাঁর মতন অদ্বিতীয় অনুবাদকের হাতেও ফোটে নি তাঁর অনুবাদের শেষ স্তবক দুটি পড়তে না পড়তে প্রতীয়মান হয় না কি?

Then I will love thee and then leave ;
 Under the codome's boughs when thou goest by
Bound to the water morn or eve,
 Lean on that tree, fluting melodiously.
Thou shalt hear me and fall at sight
 Under my charm ; my voice shall wholly move
Thy simple girl's heart to delight ;
 Then shalt thou know the bitterness of love.

পিরিতি ও জ্বালা এই দুটি শব্দের অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দকে করতে হয়েছে love ও bitterness দিয়ে।—"সহজ কুলের বালা" অনূদিত

হয়ে রূপ নিয়েছে "the simple girl"; ফল কি হয়েছে রসিকরা মর্মে মর্মে অনুভব করবেনই করবেন।

কিন্তু আমি এ-গানটির সম্পর্কে এত বাগ্‌জাল বিস্তার করেছি শুধু এ-গানটির মধ্যে প্রেমের অভিমান-রসের তারিফ করতেই নয়—শুধু এইটুকু বোঝাতেই নয় যে, এ-গানে তর্জমা শিবেরও অসাধ্য—আমার কাছে এ-গানটি কীর্তন সঙ্গীতের একটি মর্মবাণী হয়ে আমার কানের মধ্যে দিয়ে প্রাণে পৌঁছেছিল—এই কথাটি বলতেই এত ভনিতা। আমাদের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও এ-গানটির অভিমান-রসের জুড়ি মিলবে না।

আমাকে রেবতীবাবু খাঁটি পদাবলীর কীর্তনে দীক্ষা দিয়েছিলেন এই গানটিরই জাদুমন্ত্রে। মানুষের জীবনে এমন অঘটন কখনো কখনো ঘটে—একটি ছোট্ট ঘটনায় তার যেন চোখ খুলে যায়, কান শুনতে পায় এমন ডাক যা শোনবার কথা সে কোনোদিন কল্পনাও করে নি। তাই রেবতীবাবুকে যদি আমার কীর্তনের আদিগুরু উপাধি দিই তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

এর পরে আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়া সুরু করি। পদাবলী কৈশোরেও পড়েছিলাম একটু-আধটু, কিন্তু তার রসকোষে প্রবেশের পথ তখন খুঁজে পাই নি। রেবতীবাবুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা নতুন জগৎ খুলে গেল: এ কি কাণ্ড! প্রেমের অন্তঃপুরের সুগোপনতম রহস্য পূর্বরাগে, অনুরাগে, আলাপে, অনুযোগে, অভিমানে, বেদনায়, আনন্দে, হাসি-অশ্রুর রামধনু-রঙে এমন ক'রে কোন্ দেশের কাব্যে ফুটে উঠেছে অবিস্মরণীয় ছবির পর ছবি এঁকে, যার পরম সমাপ্তি হয়েছে মধুর রসের চরম আত্মসমর্পণে যে লজ্জা, মান, ভয়, উদ্বেগ পিছুডাক এমনকি পাপ-পুণ্যের সংস্কারও কাটিয়ে চেয়েছে শুধু বলতে:

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভালো মন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস: পাপ পুণ্য মম তুহারি চরণখানি॥

কিন্তু তখনও রেবতীবাবুর মুখে শুনি নি তো পালা গান—তাই চোখের ঠুলি খ'সে পড়লেও যা দেখলাম তার রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে গহন মর্মকোষে নবস্থধার রসলোক গ'ড়ে তোলে নি। পূর্বরাগ এসেছে, কিন্তু সে অনুরাগ আসে নি যার কানে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ডাক পৌঁছে সব কিছু তছনছ ক'রে দেয় ব'লেই সে বলতে পারে, আর কিছু চাই না শুধু :

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া নয়নে লুকায়ে থোব।
চিন্তামণির শোভাতে গাঁথিয়া হিয়ার মাঝারে লব।
এই নিবেদন গলায় বসন দিয়া কহি শ্যামরায়।
চণ্ডীদাস কয় : জীবনে মরণে না ঠেলিহ রাঙা পায়।

তাই তো রেবতীবাবুর কাছে কীর্তন শেখার ছেদ পড়ল অতুলদা'র ডাকে লক্ষ্ণৌ গিয়ে অচ্ছন বাঈয়ের কাছে ঠুংরিতে তালিম দেওয়া স্থরু করলাম।

মানুষের মন স্বভাব-চঞ্চল—আমার মন তো আবাল্য চঞ্চলতায় নিত্যসিদ্ধ। ফলে অচ্ছন বাঈয়ের অপরূপ সূক্ষ্ম স্থরে মনমাকু একেবারে হুশ ক'রে ফের ওস্তাদি সঙ্গীতের রংমহলে লাফ দিল কীর্তনের বৃন্দাবন ছেড়ে।

কিন্তু আমিই একটি কবিতায় পরে লিখেছিলাম একটি চরণ, শ্রীঅরবিন্দ যার উচ্চ-প্রশংসা করেছিলেন পণ্ডিচেরিতে : "A sigh that wakes can sleep no more". রেবতীবাবুর সাঙ্গীতিক গুরুশক্তিতে আমার মনে ছেলেবেলার 'দীর্ঘনিশ্বাস, ব্যাকুলতা ফের জেগে উঠেছিল—নিছক শ্রুতিমধুরতার মায়া তাকে ঘুম পাড়াতে পারবে কোত্থেকে ? আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে ফের রেবতীবাবুর খোঁজ করলাম। শুনলাম তিনি মফঃস্বলে, তবে জন্মাষ্টমীতে হেমেন্দ্র-বাবুর বাড়ীতে গাইবেন ঠিকই।

পদ্মপুকুরে জন্মাষ্টমীর দিন সকালে উপস্থিত হলাম ; বিগ্রহের সামনে রেবতীবাবুকে খোল ধরতে দেখেই বুকের রক্ত উচ্ছল হয়ে

উঠল। এক ঘর লোক—দু'দিকে চিকের আড়ালে মেয়েরা। আমি একদৃষ্টে রেবতীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। কি অপরূপ ভাবতন্ময়তা! বিগ্রহের দিকে ঠায় চেয়ে তন্ময় হয়ে তিনি গেয়ে চলেছেন কৃষ্ণলীলা!

সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল বুকের মধ্যে—কেমন ক'রে যে কি হ'ল তার বর্ণনা দেব কোন্ ভাষায়? রবীন্দ্রনাথের একটি চরণ মনে পড়েঃ "যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" উর্ধ্বমুখে খোল বাজিয়ে এ-ভক্ত কোকিলকণ্ঠ বালব্রহ্মচারী আঁখরের পর আঁখর দিয়ে নিবেদন ক'রে চলেছেন তাঁর প্রাণঢালা প্রেমভক্তি যার ডাকে তিনি সংসারে থেকেও চিরদিন বৈরাগী-জীবনই যাপন করেছিলেন গুরুপদাশ্রয়ে। নইলে কি তাঁর সুধাকণ্ঠে উচ্ছলিত হ'ত সুধাময়ের ডাক, যে যুগে যুগে প্রতি রাধা হিয়াকে ঘরছাড়া ক'রে নিজেই শোনে নিজের প্রেম-নিবেদন রাধার হৃদয়ে তার প্রতিধ্বনি জাগিয়েঃ

ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে কে আর আমার আছে?
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে?

তাই তো তার শুধু একটি গতি আছেঃ

এ-কুলে ও-কুলে দু-কুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ ও-দুটি কমল পায়।

চণ্ডীদাসের এই অপরূপ আত্মনিবেদনের গানটি গেয়ে যখন তিনি শেষ করলেন, আমি বিহ্বল হয়ে শুধু বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে। কানে ভেসে আসছিল শুধু চিকের আড়ালে মেয়েদের চাপা কান্নার স্বর!

সেদিন বুঝলাম কীর্তন কি বস্তু—কেন পিতৃদেব বলেছিলেনঃ "ওরে, কীর্তন কী বস্তু বুঝবি বড় হলে"; কেন ঠাকুরদা ওস্তাদ হয়েও কীর্তন না শিখে খেয়াল শেখাকে নাম দিয়েছিলেন "সময় নষ্ট"।

হার মানলাম। তার পর কয়েকদিন থেকে থেকে কেবলই কানে বেজে উঠতে থাকে রেবতীবাবুর নানা আঁখর, চোখে ভেসে ওঠে তাঁর

অশ্রুসিক্ত প্রেমতন্ময় মুখ আর মনে হয় এর পরে সঙ্গীতের আর কীই বা দেবার থাকতে পারে ?

* * *

এ-আশ্চর্য অনুভূতির পরে আমার মধ্যে সে যে কি এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে গেল ভাষায় তার বর্ণনা অসম্ভব। কিন্তু এমনি মানুষের মন যে,শ্রেষ্ঠ কীর্তন ওস্তাদি গানের চেয়ে অনেক বড় স্বীকার করতে কোথায় ব্যথা বাজত। কারণ ওস্তাদি গান ছিল আমার—যাকে বলে first love : আমার কৈশোরে ওস্তাদি গানের বহুবিচিত্র আবেদন আমি আমার উন্মুখ মনের প্রতি তন্তু দিয়েই গ্রহণ করেছিলাম, শুধু গ্রহণ করা নয়, আমার বালক মনের পরম অভীপ্সা ছিল আমাকে হতে হবে একাধারে আবদুল করিম ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সে সময়ে যদি কেউ বলত : "একাধারে গণেশ দাস ও রেবতীমোহন হলে কেমন হয় ?" তা হলে আমি নিশ্চয়ই বিজ্ঞ হেসে বলতাম ঃ "পাগল না ক্ষ্যাপা ! কোথায় মুড়ি আর কোথায় মিছরি !"

তাছাড়া আমার মধ্যে অহমিকা ছিল প্রবল : তাই ওস্তাদি সঙ্গীতকে কীর্তনের চেয়ে বড় বলায় আমার দিক্-ভ্রম হয়েছে একথা স্বীকার করতে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু আমার একটা বাঁচোয়া ছিল, আমি আশৈশব আত্মাভিমানের চেয়েও সত্যকে ভালোবেসে এসেছি। তাই যখনই কোনো কিছুকে সত্য ব'লে বুঝেছি তখন সে-নব উপলব্ধি যদি আমার আগেকার কোনো প্রিয় ধারণাকে খণ্ডন করত, খানিকক্ষণ আত্মাভিমানকে বাঁচাতে আপ্রাণ তর্ক করলেও তার পরেই চিত্তগ্লানি আসত। মনে পড়ত পিতৃদেবের বাল্য দীক্ষা ঃ

"ন চ সত্যাৎ পরো ধর্ম স্তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব।)

এবার আমি উঠে-প'ড়ে কীর্তন শিখতে আরম্ভ করলাম বিখ্যাত

কীর্তনশিক্ষক শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে। তিনি সুগায়ক ছিলেন না, কিন্তু শেখাতে পারতেন চমৎকার। তা ছাড়া খোল বাজাতেন এত সুন্দর যে, তাঁর খোলের সঙ্গে তাঁর কাছে সবে-শেখা কীর্তন গাইতে গাইতে আমার রোমে রোমে পুলক জেগে উঠত।

এই সঙ্গে আর একটি আন্তর পরিবর্তন হ'ল : হিন্দুস্থানী ভজন আমি কিছু শিখেছিলাম আমার প্রথম ভজনগুরু শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে—যাঁর কথা বলেছি এর আগে আমার "স্মৃতিচারণ"-এর দ্বিতীয় পর্বের শেষে। কিন্তু দু'চারটে ভজন আর কতকাল গাওয়া যায়? অথচ হিন্দুস্থানী গান গাইতেও আর তেমন প্রেরণা পাই না—অর্থহীন ভাবহীন "ননদিয়া পান খায়ে মুখ লাল" বা "বাজু বন্দা খুলি খুলি যায়" গাওয়া কেমন যেন বিড়ম্বনা বোধ হয়। অগত্যা ভজন সংগ্রহে মন দিলাম। আমি যা-ই করতাম চুটিয়ে না ক'রে থাকতে পারতাম না। যা-ই ধরতাম জাপটে ধরতাম—যাকে বলে বজ্র আঁটুনি। এক কথায়, উচ্ছ্বাস এসে তুলত আমার উৎসাহকে ফাঁপিয়ে। তার উপর আমার ছিল অটুট স্বাস্থ্য ও উচ্ছল প্রাণশক্তি—ক্লান্ত হতাম না সহজে। ফলে নানা লোকের কাছেই ধর্ণা দেওয়া সুরু করলাম ভজন শিখতে। সবচেয়ে লাভ হ'ল ৺ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে গিয়ে কয়েকটি মীরা বাঈয়ের ভজন পেয়ে। তিনি সরল সুরে গাইতেন, আমি তাদের ঢেলে সাজিয়ে নানা তান দিয়ে গাইতাম : "চাকর রাখোজী, সুনি ময় হরি আওন কি আওয়াজ, মেরে গিরধর গোপাল, চিতনন্দন বিলমাঈ", ইত্যাদি। (পরে ইন্দিরার কাছে তার সমাধিতে শোনা ছ' সাতশো মীরা-ভজন আহরণ ক'রে ভজনের পুঁজি আমার টইটুম্বুর হয়ে ওঠে কিন্তু সে অনেক পরের কথা।) কিন্তু ভজনের প্রেরণা পেতে হলে শুধুই ভজন সংগ্রহ করে চললে কি হবে—ভজন-গায়কের গানও তো শোনা চাই, নইলে আদর্শ ফুটে উঠবে কি ক'রে? কিন্তু হায় রে, আমার ভজন-উন্মুখ জীবন-নাট্যের এই অঙ্কে আমি একটিও এমন কোনো ভজন-গায়কের দেখা পাই নি যাকে

বলা যায় মহীয়ান্। কাজেই শেষটায় স্থির করলাম যে, হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীতের আওতায় ভজনের চারাগাছ বেশি বাড়তে পারে না, দক্ষিণে ত্যাগরাজের ভজন শেখা যাক। কিন্তু দক্ষিণে ত্যাগরাজের ভজন শুনতে গিয়েই চক্ষুস্থির ঃ ওমা! ওরা সে-সব তেলেগু ভজনে ঠিক তেমনিই ওস্তাদি চর্‌কিবাজি আরোপ করে যেমন পরে কেসর বাঈ করেছিলেন "দ্রৌপদী পুকারী" ভজনে।

এমন সময় আমার ডাক এল পণ্ডিচেরি থেকে—একেবারে আচম্‌কা। তখন থাকল কোথায় বা রাগসঙ্গীত, কোথায় বা কীর্তন, কোথায় বা ভজন! আমি ১৯২৮ সনের ১৫ই তারিখে পনের মিনিটের মধ্যে মনস্থির ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে 'তার' ক'রে পাড়ি দিলাম "অচিনের অভিসারে"। যে কথা আমার "স্মৃতিচারণ"-এর দ্বিতীয় পর্বে বলেছি। শ্রীঅরবিন্দকে উদ্দেশ ক'রে গান বাঁধলাম ঃ

যবে অচিনের পথ চেয়ে এ-জীবন তরী বেয়ে
দিলাম পাড়ি এ-অকূলে,
তুমি হে দিশারি ধ্রুবতারা, দেখা দিলে পথহারা
এ-পাথার মরু বিপুলে।

বাকি লাইনগুলি মনে নেই। কিন্তু যা বলছিলাম—ভজনের কথা।

লক্ষ্ণৌ থেকে সোজা বোম্বাই গিয়ে উঠলাম আমার এক প্রিয় চিরসদয় বন্ধুর ওখানে, যিনি আজো আমার প্রতি তেমনি সদয় আছেন ঃ মনীষী তথা দরদী ক্ষিতিশচন্দ্র সেন। এমন প্রফুল্ল, সংস্কৃত, তীক্ষ্ণধী অথচ শ্রদ্ধালু মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি ভূ-ভারতে। তিনি আমাকে সাদরে বরণ করলেন চিরপরিচিত দিলীপ ব'লে, যে ছিল ওস্তাদি-গান-পাগল। তাঁকে বলি নি তো আমার বৈরাগ্যের কথা, তিনি জানবেন কী ক'রে? তাই তিনি পরদিন বললেন (আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের 'তারে'র আশায় অপেক্ষা করছি) যে, আবদুল করিম গাইছেন তাঁর এক মারাঠী বন্ধুর বাড়ী। মারাঠীরা আবদুল করিমের দারুণ ভক্ত—তাই সে অনুকূল পরিবেশে

করিম সাহেব চার ঘণ্টা ধ'রে গাইলেন—রাত দুটো পর্যন্ত। অপূর্ব গান বটেই তো! কিন্তু যে-মন আবদুল করিমের গানে এক সময়ে উজিয়ে উঠত সে তখন গা-ঢাকা দিয়েছে, কাজেই আবদুল করিমের গান শুনে আমার হৃদয়তন্ত্রী আর তেমন বেজে উঠল না। কেবল মনে পড়তে লাগল রেবতীবাবুর নানা চণ্ডীদাসী পদ—একটি পদে আজও আমার বুকের রক্ত দুলে ওঠে—রাধার অপরূপ সর্বাঙ্গীকার:

কলঙ্কিনী বলি ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ,
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

বাড়ী ফিরে বিষাদে মন ছেয়ে গেল—শ্রীঅরবিন্দের 'তার' তো কই এলো না "স্বাগত" জানিয়ে! এমন সময়ে বন্ধুবর বললেন, এক মন্দিরে বিষ্ণু দিগম্বরের গান হচ্ছে।

বিষ্ণু দিগম্বরের গান আমি মাত্র একটিবার শুনেছিলাম, দিল্লী কংগ্রেসে যে-বচনসভায় দেশবন্ধু ও সুভাষের টানে আমি ডেলিগেট হয়ে দেশ উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম—রাজনীতির আম দরবারে সেই প্রথম ও শেষ ফর্ফরায়ন। (সত্যই সেখানে বহু বক্তার মধ্যে নগণ্য গায়ক হয়ে কেবলই মনে হ'ত "সফরী ফর্ফরায়তে" উপমাটি!) একমাত্র বিষ্ণু দিগম্বরের গানে আনন্দ পেয়েছিলাম, নইলে দিল্লী যাওয়া আমার ব্যর্থ হ'ত।

কিন্তু সে-গান তো ভজন নয়—কি একটা স্বদেশী গান গেয়েছিলেন তিনি মনে পড়ছে না—বন্দেমাতরম্-ই হবে। কেবল সে উদাত্ত কণ্ঠের আশ্চর্য শিহরণ অবিস্মরণীয়। অবাঙালী কোনো ওস্তাদের কণ্ঠে এমন প্রবল মাধুর্যের দেখা পাই নি—অর্থাৎ ওজস ও লাবণ্যের রাজযোটক। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় নেচে উঠল শুনে যে, বিষ্ণু দিগম্বর ওস্তাদি সঙ্গীত ছেড়ে দিয়েছেন—শুধু ভজন গেয়ে বেড়ান মন্দিরে মন্দিরে। বিদ্যুৎ-ঝলকে মনের মধ্যে খেলে গেল খৃষ্টের বাণী—তিনি তো মিথ্যা বলতে পারেন না: "Who seeketh

findeth—" খুঁজলে পাওয়া যায়ই যায়। আমি তো খুঁজছিলাম আদর্শ ভজন-গায়ককে : মিলিয়ে দিলেন বাঞ্ছাকল্পতরু। মন্দিরে গাইবেন ভারতের হিন্দু ওস্তাদদের মুকুটমণি বিষ্ণু দিগম্বর—গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কোনো হিন্দু ওস্তাদেরই এত গায়ক-শিষ্য হয় নি আজ পর্যন্ত। এহেন বিষ্ণু দিগম্বর ওস্তাদি-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে ভজনে তাঁর অদ্ভুত কণ্ঠ ও সাধনার্জিত ওস্তাদি-নৈপুণ্য নিয়োগ করেছেন—এইই তো চাই। মনে পড়ল রেবতীবাবুর একটি কথা : "বাবা! এমন কণ্ঠ, এত সাধনা—এ-সব ঠাকুরের সেবায় নিয়োগ না ক'রে কেন মিথ্যে পাঁচজনের চিত্তরঞ্জন ক'রে বেড়াচ্ছ? ও-পথে কোনো গোলোকধামে পৌঁছানো যায় না।"

গেলাম মন্দিরে—মন-প্রাণ উজিয়ে উঠেছে পরমানন্দে।

বেশি আশা করলে নিরাশ হতে হয় অনেক সময়েই, যে-জন্যে বার্ণার্ড শ' বলেছেন, আশা না করাই ভালো : He who has never hoped can never despair. ভাগবতেও আছে বিলাসিনী পিঙ্গলা আশাকে দুঃখময় জেনে বিসর্জন দিয়ে তবেই শান্তি পেয়েছিলেন—জপ ক'রে : "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

কিন্তু বিধাতা লীলাময়, তাই এমন অঘটনও ঘটে বৈ কি যখন বাস্তব রঙিনতম আশাকল্পনাকেও হার মানায় : যথা সমুদ্র, হিমালয়, কাশ্মীর, তাজমহল। বিষ্ণু দিগম্বরের ভজন আমার কাছে এই শ্রেণীর অঘটন হয়েই এসেছিল। যা শুনলাম, কল্পনার শিখরকেও ছাড়িয়ে গেল!

সে-মন্দিরটি আমি ভুলব না। সেখানে ছিল না ওস্তাদিপন্থী শ্রোতা—সার সার ব'সে শুধু নম্র ভক্ত, জিজ্ঞাসু সাধক, শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রী ও ভক্তিমতী। বিষ্ণু দিগম্বর দাঁড়িয়ে ভজন করছেন একদল দোয়ার নিয়ে—খানিকটা বাংলা কীর্তনের ভঙ্গিতে। তাঁর কিন্নরকণ্ঠে তিনি যেই সুরু করলেন, বিখ্যাত তুলসীদাসী ভজন :

ভজ মন রামচরণ সুখদায়ী
জিঁহি চরণনসে নিকসী সুরসারি শঙ্কর জটা সমাঈ···

আমার মনের সব বিষাদ কেটে গেল। এ-গানটি আমি লক্ষ্ণৌয়ে বালক চন্দ্রশেখরের কাছে শিখেছিলাম, বিশুদ্ধ ভৈরবী-ত্রিতাল। কিন্তু সে কী ভৈরবী! সবে শুনে এসেছি আবদুল করিমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভৈরবী "বাজুবন্দা খুলি খুলি জায়—" তান-কর্তবে তিনি বিষ্ণু দিগম্বরের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না, কিন্তু সে সুরের ইন্দ্রজালে তো ভক্তির মন-মাতানো, প্রাণ-জানানো আলো পড়ে নি তাই সে-সুরের মাধুর্যে আমার ভক্তি-উন্মুখ মন উজিয়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। কারণ তখন আমি তো আর গানে চাইছিলাম না যা আগে চাইতাম। আমি যা চাইছিলাম, দিলেন বিষ্ণু দিগম্বর উজাড় ক'রে দু'হাতে ঢেলে—কিন্তু ওস্তাদ দিগম্বর নন—সাধক দিগম্বর, পুজারী দিগম্বর। সত্যিই তো দিগম্বর—ভক্তির পরমানন্দে সর্বহারা আনন্দের দিগম্বর, এ-রিক্ত শ্রীহীন শোকতাপগ্লানিভরা জগতে অশোক অব্যয় অমল আনন্দের জয়ধ্বনিতে উচ্ছল দিগম্বর—দু' চোখে ধারা বইছে আর ভক্তবৃন্দ দোয়ার দিচ্ছে :

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম···

আরো কত ভজনই যে গাইলেন তিনি মনে নেই। শুধু মনে আছে যে, আমার মনের গভীর অবসাদ এক মুহূর্তে উল্লাসের জয়গানে রূপ নিল, মনে হ'ল এইই তো পরমানন্দের আলোক-আরোহিণী —নিয়ে যায় তাঁর কাছে যিনি জীবনে :

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

তাঁকে জীবনের যুগসঞ্চিত আবেগ-আকূতি-উচ্ছ্বাস-স্পন্দিত সঙ্গীতে নিবেদন করা—লক্ষ মানবিক অপূর্ণতাকে সেই পরমপূর্ণের

স্পর্শমণি-স্পর্শে স্বর্ণায়িত করা—অধরার আশীর্বাদে এই ধূলিধরণীকে অমৃতায়িত করা—সর্বোপরি পরম তন্ময়তায় নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে বিষ্ণু দিগম্বরের মতন তুলসীদাসী ভজনে গাইতে পারা :

নাথ তূ অনাথকো, অনাথ কৌন মোসোঁ ?
মো সমান আরত নহী, আরতিহর তোসো।
পালক তূ—জীব হুঁ, তূ ঠাকুর—ময় চেরো
তাত মাত গুরু সখা তূ—সব বিধি হিত মেরো।

অনাথের নাথ তুমি—কে অনাথ সংসারে নাথ, আমার মতন ?
আর্ত আমার মতন কে আছে ? তোমার ম'ত কে আর্তিহরণ ?
পালক ঠাকুর—তুমি, আমি—জীব, শিষ্য, চরণদাস, পূজারী :
পিতা, মাতা, গুরু, সখা এলে তরিতে আমারে হে কাণ্ডারী !

শুধু তাঁর ভজনে ত্রিতাপতপ্ত মানবজীবন সার্থক হতে পারে—শুধু সেই অমলের ঝংকৃত আবাহনে যিনি কেবল "রসানাং রসতমঃ" নন—যাঁর পাবক-স্পর্শে ধূলিম্লান জীব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত শিব হয়, যাঁর প্রেমের আশীষে মর্ত্য জলধারা হয় "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা," যাঁর জলদজটা বুকে ধ'রে প্রাণচিহ্নহীন হিমমৌলি হয় কনকোজ্জ্বল কৈলাস, যাঁর করুণার প্রতি স্পন্দনে আমাদের ধূমল-জীবনযজ্ঞে জেগে ওঠে জ্যোতিরুজ্জ্বল সর্বাঙ্গীকারের হোমশিখা মন্ত্রমান্ হয়ে—ঋষি কবি শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় :

All music is only the sound of His laughter ;
All beauty the smile of His passionate bliss ;
Our lives are His heart-beats ; our rapture
the bridal
Of Radha and Krishna ; our love is their kiss.

শুনি যেথায় যত গান—ধ্বনি তার উছল সুহাস্যের ;
যত মাধুরী—তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ ;
মানব জীবন—বুকের স্পন্দন তার ; পুলক আমাদের
বাসর রাধাশ্যামের ; প্রেম আমাদের—তাদেরি চুম্বন

* * *

এর পরেই এল শ্রীঅরবিন্দের 'তার' ঃ "Welcome. Blessings ...Sri Aurobindo."

বাঙ্গালোর ও মান্দ্রাজ হয়ে পৌঁছলাম ঋষিগুরুপদাশ্রয়ে—২২শে নভেম্বর, ১৯২৮।

তার পর গানে ছেদ পড়ে নি—বহু গান গেয়েছি, বেঁধেছি, শিখিয়েছি...আজো সে-প্রেরণা ম্লান হয় নি—তবে ধারা বদলে গেছে ঃ আগে গাইতাম খেয়াল, ঠুংরি, গজল, আজ গাই ভজন, কীর্তন, স্তোত্র।

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

[এ-অংশটুকু স্মৃতিচারণের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় পর্ব থেকে তুলে দিলাম ও দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দিলাম, কারণ এ-অংশ প্রকৃতপক্ষে "ভ্রাম্যমাণ"-এই শোভন। পুনর্ভ্রাম্যমাণে ভ্রমণ শেষ হ'ল—অন্ততঃ এ যাত্রা।]

ভ্রাম্যমাণ-এর দ্বিতীয় সংস্করণে অবান্তর অনেক কিছু বাদ দিতে দিতে হঠাৎ মনে হ'ল—যখন ভারতের নানা ওস্তাদ ও বাইজির কাহিনী লিখেই ফেলেছি, তখন সঙ্গীতে কার কার কাছে কী পেয়েছি, কী শিখেছি, তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখে যাওয়া মন্দ কি? ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে যে তথ্য লাভ হয়, তা থেকে কিছু হয়ত তত্ত্বেরও ছিটেফোঁটা মিলতে পারে। আর যদি নাও মেলে তবে কাহিনী সরস হ'লে রসের দিক দিয়েও কিঞ্চিৎ মুনফা হ'তে পারে তো। তাই সংক্ষেপে বলি আমার গীতি-শিক্ষার তথা ভজনদীক্ষার ইতিহাস।

ছেলেবেলায় আমার গানের প্রথম গুরু ছিলেন অবশ্যই পিতৃদেব। তিনি গান অত্যন্ত ভালোবাসতেন—বিশেষ কীর্তন ও হিন্দুস্থানি গান। তাই যেখানেই তিনি যান না কেন, ডাকতেন হিন্দুস্থানি ওস্তাদকে বা বাঙালি গায়ককে। আমাদের গয়ার বাড়িতে মনে পড়ে হনুমান দাশের ওস্তাদি গান, তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোনির হার্মোনিয়ম বাজনা। অমন হার্মোনিয়াম বাজানো আমি আর শুনিনি। এমন কি ঠাকুর নবাবালির বাজনাও সোনির বাজনার সমকক্ষ নয়। সেখানে আর এক মস্ত এস্রাজির এস্রাজ শুনি, যাঁর নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না। হয়ত অমিয় সান্যাল মহাশয় বলতে পারবেন। ইনি পরে থিয়েটার রোডেও বাজিয়েছিলেন এস্রাজ। সোনিও বাজিয়েছিলেন হার্মোনিয়াম থিয়েটার রোডে—আমার বহু বন্ধু এসে শুনেছিলেন। বিখ্যাত গায়ক অঘোর চক্রবর্তীর ধ্রুপদ গানও হ'ত—তাঁর অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠ আজও কানে বাজে। বিশ্বনাথ রাওয়ের ধ্রুপদ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের খেয়াল, অন্ধ শরৎ-এর টপ্পা, দেবেন্দ্রলাল মজুমদারের শ্যামা-সঙ্গীত, আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা গায়কের গান নিরন্তরই আমার চারদিকে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করত। তার ফলে আমি গানে খানিকটা শ্রুতিধর মতনই হ'য়ে উঠি। মানে, অনেক সুরই কিছু কিছু মনে রাখতে পারতাম কিছুদিন ধ'রে। থিয়েটারের

নানা নাটকেও যত সুর শুনতাম, বাড়ি এসে পিতৃদেবকে শোনাতাম—নানা গানের ধুয়াটুকু। পিতৃদেব আশ্চর্য হ'য়ে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শোনাতেন, 'দেখ হে আমার কুলতিলকের কীর্তি!'

এর পরে যাঁর কাছ থেকে স্থায়ী ভাবে শিক্ষা লাভ করি, তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। নাড়া বেঁধে তাঁর কাছে গান না শিখলেও আমার গানের দ্বিতীয় গুরু ছিলেন তিনিই। আমার রাঙা জ্যাঠা-মহাশয় হরেন্দ্রলালের শ্যালক ব'লে তাঁকে আমি সুরেনমামা ব'লে ডাকতাম আমার জ্যেঠতুত ভাই-বোনদের সুরে সুর মিলিয়ে। পিতৃদেব বলতেন প্রায়ই: 'আহা এমন ঢং সুরেনের—ও একেবারে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা। শিখে এ-ঢং গড়ে তোলেনি সুরেন—নিজে থেকেই ও ফুটে উঠেছে—আশপাশের জল-হাওয়া থেকে প্রাণের খোরাক টেনে—ফুলের মতন।'

সত্যি, এমন অপরূপ ঢং আমি জীবনে আর শুনিনি। কি হিন্দুস্থানি খেয়াল টপ্পা, কি ধ্রুপদ (যদিও ধ্রুপদ তিনি বেশি গাইতেন না শ্রোতারা তানকর্তবই বেশি চাইত ব'লে) কি কীর্তন কি বাংলা ভক্তি-সঙ্গীত যা গাইতেন তারি উপর তিনি রেখে যেতেন নিজের প্রতিভার আশ্চর্য ছাপ। সে-ঢঙে আর কাউকে আজ পর্যন্ত গাইতে শুনলাম না। কিন্তু তাঁর ঢং থেকে আমি পেয়েছিলাম অনেক সুষমার ইঙ্গিত, বিস্তারের সঙ্কেত। তাঁর অনেক হিন্দি তথা বাংলা গানই আমি গাইতাম নিজের ঢঙে বসিয়ে। কারণ তিনি বলতে পিতৃদেবকে: 'দেখবেন দ্বিজুবাবু, মণ্টু যেন কারুর নকল করতে না ছোটে, যেন নিজের পথ কেটে চলে—অপরের কাছে থেকে নেবে বই কি, কিন্তু নকল করতে নয়, হজম করতে। ওর বেশি শেখার দরকার নেই। শুনতে শুনতে শেখাই ভালো।' আশ্চর্য: অনেক বৎসর বাদে অবিকল এই কথাগুলিই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে একদিন বলেছিলেন ধূর্জটিকে। কিন্তু একথায় আনন্দ বা গৌরব নিতান্তই সস্তা, মাত্র অহমিকারই এতে শ্রীবৃদ্ধি, বিকাশের দুর্গতি। বেশি প্রশংসা পেয়ে

আমার ক্ষতিও হয়েছিল খুবই প্রথম দিকে। তাই না ঠাকুরকে ভুলতে বসেছিলাম গানে যশস্বী হ'তে না হ'তে। তাঁর অপার করুণা তাই গানের নোঙরও ছাড়িয়ে আমাকে ঠেলে দিল সোজা অকূল পাথারে—তাঁর চরণ-বন্দরের ধ্রুবদিশা দিতে। কিন্তু সে অন্য কথা।

সুরেনমামার কাছে উৎসাহ পেয়ে আমি খুব গলাবাজি আরম্ভ করলাম—বিশেষ করে তাঁর শেখানো কয়েকটি গানে: যথা, রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো—সিন্ধু কাফি; রাঙা কমল রাঙা করে—মালকোষ; জাউঁ জাউঁ ঘন গরজে—দেশ; নিবিড় আঁধারে মাগো—বাগেশ্রী; বিফল জনম—ভৈরবী; আমার মন ভুলালো যে—ভৈরবী; শ্যাম-প্রেম-রসসায়রে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম—কীর্তন; এই তো কানন গো—কীর্তন। আরো অনেক গান শিখেছিলাম। অবশ্য তাঁর মতন গাইব কেমন ক'রে? (মণিমামার পরিহাস স্মরণীয়: 'ভালো গান গাওয়া কি সোজা?') কিন্তু বাংলা গানে সুরবিহার-এর এই ইঙ্গিতটি আমি প্রথম তাঁর কাছেই পাই যে, বাংলা গানে ভাব বজায় রাখতে হ'লে কথার সঙ্গে মিশিয়ে তান দিতে হবে। অর্থাৎ 'রাঙা জবা কে দিলো' ব'সে আ আ ক'রে তান দেওয়া নয়, দিলো-র ও-কে টেনেই তান দিতে হবে। আকারান্ত তান দিতে হ'লে দিতে হবে জবা-র শেষে কিম্বা মা-র শেষে। কিন্তু ঐ যে বললাম, এসব ক'রে দেখানোর জিনিস, ব'লে বোঝাবার নয় তাই এ-খুঁটিনাটি আঙ্গিকের বর্ণনা থাক্।

সুরেনমামার কাছে আর একটি সত্যের দীক্ষা পেয়েছিলাম যে, ওস্তাদি গানেও কণ্ঠলাবণ্যের দাম খুব বেশি। তাই অত্যধিক সেধে কণ্ঠকে ভেঙে ফেলা আত্মহত্যারই সামিল। তানের সৌকর্য-সাধনার্থে এ-ভুল অনেক ওস্তাদেই ক'রে থাকেন—বলতেন তিনি প্রায়ই। আমার উত্তরজীবনে দেখেছিলাম আমার এক প্রিয় গায়ক এই ভুলই করেন লখ্‌নৌয়ে বিপর্যয় সেধে। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব মধুর, কিন্তু লখ্‌নৌ থেকে তিনি যখন ফিরলেন—হা হতোস্মি—দেখলাম তাঁর

কণ্ঠের সে-মাধুর্য লুপ্ত হয়েছে অত্যধিক সাধনায়। অর্থাৎ কোকিলকণ্ঠ ম'রে ভূত হ'য়ে নবজন্ম নিয়েছে কালোয়াৎরূপে। আমি এ-ভুল করিনি সুরেনমামারই উপদেশে। তাঁর কাছে আরো আমি শিখি যে, কণ্ঠলাবণ্য বজায় রাখলে আট আনা শ্রম ক'রে যে সুরের আনন্দ বিলানো যায়, কণ্ঠ অমধুর হ'লে সে আনন্দের সিকিও সৃষ্টি করা যায় না ষোলো আনা পরিশ্রম ক'রেও। একথা বলছি গায়ের জোরে নয়—কণ্ঠ-লাবণ্যের অপরিসীম জাদু-শক্তি স্বচক্ষে দেখে তবে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতেই লিখি যা মনে আসে। মনে পড়ে সুকণ্ঠের নানা স্মৃতি। কী ভাবে—বলি।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কলকণ্ঠীদের কথা বলতে প্রায়ই বলতেন তিনটি বাইজির কথা: আগ্রার জোহরা বাই, বম্বের কেশর বাই ও কাশীর মোতি বাই। কেশর বাইয়ের গান সে-সময়ে শোনার সৌভাগ্য আমার হয় নি—তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ধর্না দেওয়া সত্বেও। জোহরা বাইয়ের গান গ্রামোফোনে বাজিয়ে বাজিয়ে কত রেকর্ড যে ক্ষইয়ে ফেলেছিলাম তার হিসেব দেওয়াও অসম্ভব। কী যে ইচ্ছা হ'ত সামনে ব'সে তাঁর গান শোনবার!—কিন্তু হা অদৃষ্ট, তিনি তখন ইহলোকে নেই। সুতরাং মাঝে মাঝেই ভাবতাম—কাশী গিয়ে মোতি বাইকে ধরি না কেন? এমন সময়ে হঠাৎ শ্রীদামোদর দাস খান্না আমাকে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করলেন জানিয়ে যে কলকাতার দমদমে কোন্ এক বাগানে কাশীর মোতিবাই গাইবেন অমুক দিন সন্ধ্যায়।

পুলকিত হয়ে বোদ্ধা বন্ধুবান্ধব কয়েকজনকে খবর দিলাম—তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সুরজ্ঞ শ্রীঅমিয়নাথ সান্ন্যাল। আর কে কে ছিলেন মনে নেই। যাই হোক আমরা সদলবলে তো গেলাম মোতি বাইয়ের গান শুনতে দমদমের ঠিকানায়।

এমন মধুর কণ্ঠ জীবনে বেশি শুনিনি। বলতে কি ৺উমা বসু ছাড়া আর কোনো নারীকণ্ঠের অবিমিশ্র মাধুর্যে আজ পর্যন্ত আমি এত গভীর আনন্দ পাই নি। শুধু একটি সুরে দাঁড়ানো—আর মনে

হয় যেন বাতাসও থম্‌কে গিয়ে মুগ্ধ হ'য়ে কান পেতে শুনছে। আমি আশৈশব মিষ্ট কণ্ঠের অনুরাগী—আবাল্য শুনে এসেছি সে কত যে অপরূপ কণ্ঠ!—আজকের দিনে সেরকম কণ্ঠ কই তো শুনতে পাই নে। এখানে একটু থেমে নাম করি কয়েকজনের যাঁদের কণ্ঠ আজো আমার কানে বাজে। প্রথম শুনি শ্রীঅঘোর চক্রবর্তীর আশ্চর্য ধ্রুপদী কণ্ঠঃ যেমন প্রবল তেমনি ব্যঞ্জনাপূর্ণ আর তেমনি মধুর! সুকিয়া স্ট্রীটে শ্রীকৈলাস বসুর বাড়িতে তাঁর প্রায়ই গান হ'ত, পিতৃদেবের সঙ্গে শুনতে যেতাম। তখন আমি বালক কিন্তু মিষ্ট কণ্ঠে সাড়া দিতে শিখেছি সর্বান্তঃকরণে। একদিন ঘটল এক অঘটন। অঘোরবাবু রাশভারি লোক ছিলেন। পছন্দ করতেন না তাঁর পরে কেউ গায়। তাছাড়া তাঁর পরে গাইবার মতন বুকের পাটাও খুব কম গায়কেরই ছিল। তিনি ধ্রুপদ ধামারে অদ্ভুত বাঁট দূন চৌদূন করে যখন শোমে ফিরে আসতেন শ্রোতারা রুদ্ধনিশ্বাসে শুনত, আমার বুকের মধ্যেও বিস্ময়ানন্দের ডমরু বেজে উঠত—তারপর যেই শোমে তারাবাজি ফাটত অম্‌নি বইত উল্লাসের ফুলঝুরি "আ হা—হা—হা!" আজো মনে পড়ে পিতৃদেবের সেই হাত তুলে ধুম্‌ ক'রে তাকিয়ায় শোমের তাল দেওয়া—আরো অনেক শ্রোতাই সে-সময়ে ছিলেন ধ্রুপদী শোমের সুরের রাগের সমজদার। রেডিওতে আজকাল বোতাম টিপে গান শোনা হয়—এতে গানের সুরতালের খবর অনেক কিছুই হয়ত পাওয়া যায় কিন্তু সেই গায়ক ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে গ'ড়ে-ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত দরদ ও প্রতীক্ষার আবহ মিলতেই পারে না—যার যোগাযোগ বিনা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতানন্দ ফুটে উঠতেই পারে না। গায়ক বলেন সানন্দেঃ "আমি দিচ্ছি—দদামি। শ্রোতা বলেন সকৃতজ্ঞেঃ "আমরা নিচ্ছি—গৃহ্ণামি।"

এম্‌নি আসরে অঘোরবাবু আমাদের সবাইকে তো মাতিয়ে তুললেন। তারপর ডাক্তার কৈলাসবাবু ভদ্রতার খাতিরে আরো কয়েকজন নামজাদা ওস্তাদ গায়ককে বললেনঃ "একটা ধরুন না।"

কিন্তু যাকে বলেন সে-ই শিউরে ওঠে : "ক্ষেপেছেন কৈলাস বাবু? এর পরে?" এখন, পিতৃদেবের পাশে বসেছিলেন সুরেনমামা—রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—খ্যাতনামা সঙ্গীতকোবিদ রবীন্দ্রলাল রায়ের মামা। রবি আমার জ্যেঠতুত ভাই, সেই সুবাদে সুরেনমামাকে আমি মামা ডাকতাম। সুরেনমামার গাইবার ইচ্ছা ছিল প্রবল, তাই উৎসাহ পেতেই প্রাণের মায়া ছেড়ে ধ'রে দিলেন ধ্রুপদের পরে একেবারে খাস মাথুর কীর্তন—"এই তো কানন গো"। শুনতে শুনতে শ্রোতারা ভুলে গেলেন দূন চৌদূন আড়ি কুআড়ি তাল বাঁট—কেউ কেউ চোখ মুছতে শুরু করলেন অভিসারিকা "অভাগিনী রাধার" বেদনায়। গান শেষ হ'লে অঘোরবাবু যে অঘোরবাবু তিনিও মুগ্ধ হ'লেন। শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়—তরুণ সুরেনমামার চিবুক ধ'রে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন : "এমন গলা কোথায় পেলে বাবা?"

কণ্ঠের এম্‌নিই জাদু। সুরেনমামা তাই প্রায়ই বলতেন আমাকে যে অত্যধিক কসরতে কণ্ঠলাবণ্য নষ্ট ক'রে ওস্তাদি নৈপুণ্যে রসসৃষ্টি করার মূল্য থাকলেও কণ্ঠলাবণ্য থাকলে সিকি পরিশ্রমে শ্রোতাদের যে-আনন্দ পরিবেশন করা যায়, কণ্ঠলাবণ্য অভাবে সে-রসসৃষ্টি করতে চতুর্গুণ মেনহৎ করতে হয়। এখানে কালোয়াতি কলাকারু নিয়ে তর্ক উঠতে পারে অবশ্য—কোন্ প্রতিপাদ্যকে নিয়ে তর্ক না করা যায়—কেবল ওস্তাদি নৈপুণ্যের জয়গান ক'রেও একথা মানতেই হবে যে সুরেনমামার উক্তিকে নামঞ্জুর করা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি—যেহেতু যেখানেই বিধাতা লাবণ্য সৃষ্টি করেছেন সেখানেই তাঁর একটি পরম বিভূতির প্রকাশ হয়েছে—আর বিভূতির কাজই হ'ল অপরের চিত্ত জয় করা তার নিজস্ব শক্তিতে। রূপের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ আমরা প্রত্যহই পাই, বলি : "সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র"। সুরেনমামার কথাটাই যেন অন্যভাবে কালিদাস পেশ করেছেন তাঁর শকুন্তলায় "কিং পুনর্ভূষণানাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্?" অর্থাৎ সুন্দর যে তার আর অলঙ্কারের প্রয়োজন কি?

বাংলাদেশে এম্‌নি আরো অনেক আশ্চর্য কণ্ঠ শুনেছিলাম আমার বাল্যকালে, যথা অন্ধ শরৎ, দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, লালচাঁদ বড়াল, বিজয় লাহিড়ী, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, গণেশ দাস, রেবতী মোহন সেন, মন্মথনাথ দত্ত, বকুবাবু, আরো কত খ্যাত ও অখ্যাতনামা কলকণ্ঠ গায়কের দেখা পেতাম আমাদের মজলিশে। কিন্তু আধুনিক গায়কদের মধ্যে দেখি প্রায় কেউই চার পাঁচশো লোকের মধ্যেও মাইক্রোফোন বিনা গান গেয়ে জমাতে পারেন না। শেষ উদাত্ত কণ্ঠ শুনেছিলাম বছর পনের আগে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর। তাঁর পরে দরাজ কণ্ঠে বোলন্দ আওয়াজ বাংলাদেশে আর শুনিনি। কিন্তু এবারে ফিরে আসি মোতি বাইয়ের প্রসঙ্গে।

মোতি বাইয়ের গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তাঁকে ধরি আমাকে দু-একটি ভজন শেখাতে। সে সময়ে তিনি থাকতেন চিত্তরঞ্জন আভেনিউ-এ। সেখানে আমি যেতাম রোজ সকালে ও শিখেছিলাম তাঁর কাছে কয়েকটি ভজন ও দু-একটি রাগ—একটির নাম হংসকামিনী। আহা, কী গানই গাইতেন বাইসাহেবা! যখন গুন গুন ক'রে শেখাতেন আর আমি হার্মোনিয়মে তুলতাম, তখনও মন তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে রসিয়ে উঠে যেন আবিষ্ট হ'য়ে পড়ত। আজো মনে পড়ে অমিয়দার (অমিয় সান্যালের) সেইভাবে ঢুলু ঢুলু চাহনি ও উচ্ছ্বসিত সাবাস। কিন্তু বাহবা দিয়ে সে-কণ্ঠকে কতটুকুই বা পুরস্কার দেওয়া যায়! মনে হ'ত আমার যে, যদি আকবর বাদশা আজ থাকতেন তবে মোতি বাই পেতেন রাতারাতি মোতির মালা তাঁর পিককণ্ঠের জন্যে।

এহেন কণ্ঠে বাংলা গান শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। আমিই তাঁকে শেখাই দুটি বাংলা গান—পিতৃদেবের "এ জগতে আমি বড়ই একা"—খেয়াল—ভীমপলশ্রীতে ও অতুলপ্রসাদ সেনের "বাদল ঝুম ঝুম বোলে"—বাংলা ঠুংরি—পিলুখাম্বাজে। মনে আছে শেষ

দিন তাঁরই ওখানে তাঁর গানের আসর—বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ফের সদলবলে, সঙ্গে ছিলেন খ্যাতনামা লেখক হিরণকুমার সান্ন্যাল—ব্রাহ্ম যুবক। কিন্তু মোতিবাইয়ের কণ্ঠে বাংলা সুরের মাধুর্যে তিনিও আহা আহা ক'রে উঠেছিলেন। এর পরেও কি কেউ কণ্ঠলাবণ্যের অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তির কথা অস্বীকার করিতে পারে?

এই মোতি বাইয়ের সঙ্গেই দশ-বারো বৎসর বাদে আমার দেখা হয়—১৯৩৮ সালে। আমি কাশী গিয়েছিলাম আমার গীতিশিষ্যা ৺উমা বসুকে নিয়ে। উমাকে আমি বলতাম প্রায়ই: "তোমার কণ্ঠের সমকক্ষ মাত্র একটি কণ্ঠ আমি শুনেছি মেয়েদের মধ্যে—সে মোতি বাই।" উমার গানে প্রতিভা অসামান্যা হ'লেও আত্মপ্রত্যয়ে সে ছিল সামান্যাদের চেয়েও নিচে। তাই আমার মুখ চেপে ধরত এ-ধরনের কথা বললেই, বলত: "কার সঙ্গে কার তুলনা ভাই, তুমি যে কী!" সে কীর-র উপর তার আশ্চর্য কণ্ঠের আশ্চর্য মিড় আজো কানে বাজে। যাই হোক এ-হেন উমা কাশী পৌঁছতেই আবদার ধরল মোতি বাইয়ের গান শোনাতেই হবে। কী করি? খুঁজে খুঁজে গেলাম বাইজি মহলে কুলবালাকে নিয়ে—কুলীনদের আপত্তি সত্ত্বেও। মোতি বাই সাদরে আমাদের গান শোনালেন—শুধু হিন্দি গান নয়; আমার শেখানো বাংলা গান দুটিও গাইলেন। তারপর আমি তাঁকে উমার কলকণ্ঠের কথা বলতেই তিনিও ধরলেন ওকে: "এক গানা তো সুনানা।" উমা ভয়ে ভয়ে আমায় কাছে শেখা "বুলবুল মন ফুল সুরে ভেসে" গানটি শোনালো। এ গানটি আমি "সোলাভে ও সোলাভে" ব'লে একটি রুষ গানের জর্মন সংস্করণের সুর ভেঙে রচনা করেছিলাম। সে-যুগে হিংমাশু দত্ত বর্গীয় সুরকারেরা এ-গানটির বন্দেশ খুব ভালো বাসতেন, বলতেন বাংলা গানে নব সুরভঙ্গি। এমন কি কোনো কোনো উন্নাসিক ক্রিটিকও এ গানটি শুনে সাবধানে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। ভাবটা:

"এ কী ? দিলীপকুমার তো ভজন কীর্তন গায়, সুরের কী জানে ? তবু এহেন সুর রচনা করল কী ক'রে ?"

মোতি বাই গানটি শুনে উচ্ছ্বসিত—কী অপরূপ সুরভঙ্গি। কী সুন্দর বন্দেশ!—সর্বোপরি, "কী অপরূপ কণ্ঠ!" উমা তার নিজের কণ্ঠের অজস্র সুখ্যাতি শুনে কুণ্ঠায় অধোবদন হ'তে মোতি বাই মিষ্ট হেসে একটি কথা বলেছিলেন ভুলব না। বলতে ভুলে গেছি, উমা তাঁর সামনে গাইতে কিছুতেই রাজি হয় নি, আমাকে ফিস ফিস ক'রে বলেছিল: "তুমি যে কী মণ্টুদা, মোতি বাইয়ের সামনে আমাকে গাইতে বলা! ভয়ে মরি!" মোতি বাই জিজ্ঞাসা করায় আমি হেসে বলেছিলাম: "ভয় পাচ্ছে আপনার সাম্‌নে গাইতে।" মোতি বাই আগে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর ভয় ভাঙাতে তবে উমা "বুলবুল" গানটি গায়। গানের শেষে মোতি বাই উমার কাঁধে হাত রেখে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: "বুলবুল কভি পপীহাকো ডরতি হয় ?"

জহুরীই জহর চেনে—বলে না ? পাশাপাশি মনে পড়ে অঘোর চক্রবর্তীর মতন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্রুপদীর সুরেনমামাকে প্রশংসা। সাহেব পুরাণে বলে না—"History repeats itself ?"

কণ্ঠলাবণ্যের প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্ত হঠাৎ মনে এল। যদিও এ পুরা কাহিনী—আমার দিদিমার কাছে শোনা—তবু ঘটনাটি খানিকটা অঘটনের পর্যায়ে পড়ে ব'লেই বলতে আরো সাধ যায়। আমার দিদিমার ভাষায়ই বলি—একটু সাজিয়ে অবিশ্যি, নৈলে এ-যুগের পাঠকের মনঃপূত হবে না হয়ত।

(সাজিয়ে বলা মানে কিন্তু কল্পিত বর্ণনা নয়—দিদিমার মূল বক্তব্যটি ভুলবার নয় তো, তাই ভুল হবে কেমন ক'রে ?)

"আমার দাদামশায় রামদাস গোস্বামী ছিলেন শ্রীরামপুরের এক ডাকসাইটে ধ্রুপদী জানিস্ ? তোরা কীই বা গাস আজকাল—কেউ ভয় পায় না। দাদামশায়ের গান শুনে ঘুমন্ত ছেলেরা আঁৎকে উঠে মা-র বুক চেপে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে দুধ খেত। আমরা

চিকের মধ্যে থেকে শুনতাম তো—তবু বুক কেঁপে উঠত তাঁর দূন চৌদূন বাঁট শুনে। এমন বাজখাঁই আওয়াজ—যে সে কী বলব? কিন্তু আর একটা জিনিস আমাদের চোখে দেখা রে মণ্টু—চাক্ষুষ করা—আর একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, বিশ্বাস কর। দাদামহাশয়ের একটি রক্ষিতা ছিল, নাম গুণমণি। সে-যুগে জমিদারদের রক্ষিতা রাখাই দস্তুর ছিল। আমরা প্রায়ই শুনতাম: 'তা পুরুষ মানুষ—মরদ—তার উপর জমিদার—রক্ষিতা না রাখলে মান থাকে কখনো?' সত্যি বলছি।

"কিন্তু হ'লে হবে কি, গিন্নি দিদিমার সে কী মনঃকষ্ট। দাদামশায়ের মুখে গুণমণির গুণগান শুনলে দিদিমা রাগ ক'রে গোসা-ঘরে চলে যেতেন। গুণমণি ছিল তাঁর চক্ষুশূল। সে থাকত দাদমেশায়ের পাশের একটি মহলে তিন-চারটি ঘর নিয়ে। আমরা গেলে খুব আদর ক'রে গান শোনাতো আর আমরা মুগ্ধ হ'য়ে শুনতাম। আহা সে কী গলা রে মণ্টু! কী তোদের বেদানা দাসী, মানদাসুন্দরী, গহরজান—গুণমণির গান শুনলে পাখিরাও ঘাড় নাড়তে ভুলে যেত। যেন মধু জমাট হয়ে গলায় দাঁড়িয়েছে রে।

আমি (হেসে): নানি! তুমি নাটক লিখলে বাবা বসে পড়তেন। ভাগ্যে লেখো নি!

দিদিমা: ভাবছিস বাড়িয়ে বলছি? না রে না। তবে শোন্ বলি তাঁর গলায় জাদু। আমার দিদিমা না? বলেছি তিনি হিংসেয় জ্ব'লেপুড়ে মরতেন। কিন্তু গুণমণি কীর্তন ধরলে তিনি গুটি গুটি এসে পাশে ব'সে শুনতেন আর চোখ মুছতেন। একেই বলি গলা রে, একেই বলি গলা। অমুক জান, তমুক বাই—ঝাঁটা মার্!'

সুরেনমামাও ছিলেন এমনি গাইয়ে। গুণমণিকে যদি উপাধি দেওয়া যায় কিন্নরী, তবে সুরেনমামাকে উপাধি দিতে হয় কিন্নর। তিনি নিজেও কণ্ঠস্বরের লাবণ্যে আত্মহারা হ'তেন। তাই পরীক্ষার সময়ে রাত্রে পালিয়ে, বাইজিদের গান শুনতেন। রাঙা জ্যাঠামশায়ের

মুখে শুনেছি—ফলে তিনি পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করতে তাঁর পিতৃদেব তাঁকে খড়ম দিয়ে বেদম মারেন। পরের বার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষায় প্রথম হন।

বড় বেশি হালকা গালগল্প হ'য়ে যাচ্ছে। গম্ভীর হই ঢের।

সুরেনমামার গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ভুলতে পারবেন না তাঁর কণ্ঠলাবণ্যের জাদু। ভাগলপুরে ও অন্যত্র আমি দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি তাঁর গান—তাঁর সঙ্গে হার্মোনিয়মে সঙ্গত ক'রে। আমার কান অত্যন্ত তৎপর ছিল ব'লে আমার সঙ্গতে সুরেনমামা খুব তুষ্ট হতেন—তিনি কোনো পর্দা গলায় তুলতে না তুলতে আমি বাজনায় সেটি টিপেছি। এইভাবে বাজনায় সঙ্গত করার ফলে তাঁর অনেক মনোহর সুরভঙ্গিই আমার কণ্ঠায়ত্ত হয়—যদিও তাঁর সে অনুপম ঢং আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। তবে তিনি বলতেন: "তোমার এ ঢং তোমার নিজস্ব—একেই খাটিয়ে বাড়িয়ে তোলো মণ্টু—আমার ঢং নকল করতে যাবে কেন? আমি মিশ্রদের ঘরানা খেয়াল শিখতাম কিন্তু তাদের ঢং নকল করেছি কোনোদিন? কক্ষনো না—সাধ্যমত নিজের পথেই চলেছি—কারুর অনুকরণ না করে। তুমি বাপকা বেটা হও, বাবা—নিজের পথেই চোলো নিজের পায়ে নিজের কদমে।"

এর পরে আমি বিখ্যাত ওস্তাদ তথা বীণকার লছমীনারায়ণ মিশ্রের কাছে কিছুদিন শিখি—মিশ্রদের ঘরে সুরেনমামার ঢঙে তালিম পাব ব'লে। কিন্তু শিখতে গিয়ে দেখি মিশ্রদের মধ্যে বড় বড় ওস্তাদ থাকলেও তাদের গানের ঢং স্বতন্ত্র। দেখে তখন মানতে বাধ্য হই যে, সুরেনমামার ঢং তাঁর প্রতিভার নিজস্ব অবদান—কোনো ধারে-পাওয়া সম্পদ নয়।

বলা হয় নি—বরোদায় গিয়ে রাজঅতিথি হয়ে ফৈয়স খাঁর কাছে কয়েকটি খেয়াল শিখি ও মথুরায় গিয়ে চন্দন চৌবের কাছে কয়েকটি ধ্রুপদাঙ্গ ভজন।

কিন্তু সুরেনমামার কাছে বহুদিন ধ'রে গান শিখলেও গানে রীতিমত তালিম নেওয়া বলতে যা বোঝায় তা নেওয়া হয়নি—যদিও উপদেশ নিতাম নানা গায়ক-গায়িকার শৈলী তথা আঙ্গিক সম্বন্ধে। বাল্যস্মৃতিতে লিখেছি, গ্রামোফোন থেকে আমি অনেক গায়ক-গায়িকার গানই গলায় তুলেছিলাম। সুরেনমামা ও পিতৃদেব ভালোবাসতেন বিনোদিনীর, কৃষ্ণভামিনীর ও লালচাঁদ বড়ালের গান। লালচাঁদ বড়ালের একটি দেশ রাগে গান—"এ হো রাজা"—আমি অবিকল তুলি গলায়। এতে পিতৃদেবের গর্বের সীমা ছিল না, বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে শোনাতেন আমার তান: "দেখো হে আমার শিশু কালোয়াতের কাণ্ড! সাক্ষাৎ লালচাঁদ বড়ালের তান গলায় তোলা……" ইত্যাদি। গ্রামোফোনের আরো অনেক গালগল্প করতে পারি, কিন্তু দরকার নেই। শুধু কয়েকজনের নাম করি যাঁদের গান ও তান থেকে আমি লাভ করেছিলাম:

লালচাঁদ বড়াল, বিনোদিনী, জোহরা বাই, জানকী বাই, মমতাজ জান, গহরজান, দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধ শরৎ, অন্ধ নিকুঞ্জ-বিহারী দত্ত, বেদানা দাসী, মানদাসুন্দরী, মুকুলচন্দ্র নন্দন, বিজয় লাহিড়ী, টপ্পাগায়ক রমজান খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, আবদুল করিম, মৈজুদ্দীন খাঁ, রাধিকা গোস্বামী, বকুবাবু, নগেন্দ্রবালা, অমলা দাশ (দেশবন্ধুর ভগ্নী), পান্না দাসী (কীর্তনী) ইত্যাদি।

গ্রামোফোন ছিল আমার শুধু নিত্যসহচর নয়—ফ্রেণ্ড ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড, যাকে বলে—অক্ষরে অক্ষরে। এক-একটা রেকর্ড এত বাজাতাম যে কয়েক মাস পরেই আর বাজত না, তখন আবার কিনতে হ'ত—এমনই ছিল আমার উৎসাহ। গানেই আমার বার আনা সময় কাটত—নৈলে ক্লাসের পরীক্ষায় ঢের বেশি নাম করতে পারতাম। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন বসত না—বিশেষ নতুন কোনো রেকর্ড এলে। আমি কোনোমতে ক্লাসের পড়া সেরেই ফিরতাম আসল কাজে —গ্রামোফোন চর্চায়। তাসত্ত্বেও আমি পড়াশুনোয় যে 'ভালো ছেলে'ই

ছিলাম, এতে আমি ধরাকে সরা জ্ঞান করতাম। ভাবটা "যদি গানে গল্পে এত সময় না দিয়ে ভালো ছেলে হয়ে পড়াশুনো করতাম, তবে ভাবো—কী হতাম !" স্বভাবে যে-মানুষ অহঙ্কারী, তার আত্মপ্রসাদকে মারে কে ? এই অহঙ্কার চূর্ণ হয়, প্রথম যখন বি-এস-সিতে ফেল হই রসায়নের ব্যবহারিক পরীক্ষায়। ঠাকুরের করুণা বলে তখন একে চিনতে পারিনি বটে, কিন্তু পরে বারবারই দেখেছি যে, যখনই মাথা গরম হয়েছে, তাঁর করুণা এসে আমার আত্মাভিমানকে ধূলিসাৎ করেছে, আর গাইতে হয়েছে—সত্যিই চোখের জলে :

আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

ম্যাট্রিকে প্রথম কুড়িজনের মধ্যে হয়ে দশ টাকার স্কলারশিপ পেয়ে খুশি হয়েই শুরু করলাম বকুবাবুর কাছে গান শিখতে। বকুবাবুর কথা বলেছি—বিখ্যাত অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল উপেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতুষ্পুত্র।

আমার বকুবাবুর গান যে কী ভালো লাগত, কী বলব। গ্রামোফোন থেকে তাঁর ইয়াদ আতি হ্যায়—খাম্বাজ ; পরের কথা শুনে—সিন্ধু ; কোন্ ছেলে তোর আমার মতন—রজনীকান্তের গান ; পতিত-পাবনী তারা গঙ্গে—কাফি ; আরো অনেক গান গলায় তুলি, এমন কি তাঁর খাঁচার পাখি গেল উড়ে থুয়ে ছুটো লম্বা ঠ্যাং-ও গাইতাম। উৎসাহ আমার উজিয়ে উঠলে কি আর রক্ষে আছে ? আমি গানে ছিলাম সর্বভুক, বাছ-বিচার করতাম না—তাই নিম্নশ্রেণীর আদি-রসাত্মক গানও গাইতাম মানে না বুঝে। যথা লালচাঁদ বড়ালের—

আমারে আসতে ব'লে এত অপমান করা !
মনে কি পড়ে না জাদু দুহাত দিয়ে পায়ে ধরা ?

বা, তুমি কাদের কুলের বউ ?

যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ—নেই কো সঙ্গে কেউ ?

কি বেদানা দাসীর—

তুমি যে পরের সোনা আগে তো ছিল না জানা,
জানলে পরে পরের সোনা দিতাম নাক কর্ণমূলে।
ভালোবেসে ভালো কাঁদালে!

গানে সর্বভুক হওয়ার ফলে আমার ক্ষতি হয়েছিল সমূহ—বিশেষ রুচির দিক থেকে। নইলে নিশ্চয়ই বাল্যকালে পিতৃদেবের ভালো ভালো গান আরও শিখে রাখতাম। আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারতাম ব'লেই তাঁর শতাধিক গানের সুর মনে রেখেছিলাম। এ একটা কীর্তিই বলব, কেননা আমি লোকের কাছে গাইতাম এই সব বাজে গানই বেশি—ওস্তাদি তান হলেই আমি উৎফুল্ল—কথা যেমনই হোক। সুরুচিতে নব দীক্ষা হয় পরে সুভাষের সংস্পর্শে এসে। তখনই এসব বাজে গান গাওয়া ছাড়ি তার 'ছি-ছি' শুনে। সে বলত : "আমার অবাক লাগে ভাবতে—ডি. এল. রায়ের ছেলে হয়েও তুমি তাঁর চমৎকার চমৎকার গান ছেড়ে কি ক'রে এই সব বাজে গ্রামোফোনের গান নিয়ে মেতে থাকো!" তার ভৎসনায় আমার চৈতন্য হয়—আমি এসব গান ছেড়ে ফিরি পিতৃদেবের গানের দিকে। ভাগ্যক্রমে আমার স্মরণশক্তির জোর ছিল, তাই তাঁর শতাধিক গান শুনে শুনেই শেখা হয়ে গিয়েছিল, নিজে বেশি না গাওয়া সত্বেও। বিধাতার আর-এক করুণার দান—আমার এই স্মৃতিশক্তি। আমার শত্রুরাও আমাকে পরীক্ষা করতে এসে সদীর্ঘশ্বাসে বলতেন, "দ্বিজবাবু নাই দিয়ে এমন ছেলেটার মাথা খেলেন! পড়াশুনোর নাম নেই—কেবল গান আর তর্ক আর ডেঁপোমি"...... ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদ্বৎসমাজে স্মরণশক্তির মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমি নিজের জীবনে দু শ্রেণীর মনীষী দেখেছি: এক, লোকেন কাকা (পালিত)—কী যে অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি—কত কবিতা যে তিনি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করতে পারতেন—নানা ভাষায় দ্রুত কথা বলতে পারতেন—"নজিরের জন্যে ওকে বই খুলতে হয় না তো, নিজের মাথায় টোকা দিলেই হয়—" পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন হেসে। অন্য দিকে বিরাট প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ, যিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি আদৌ প্রখর নয়। বেশ মনে আছে, তিনি হেসে বলতেন: "বলব কি দিলীপ, সময়ে সময়ে এমন লজ্জায়ও পড়তে হয়েছে যে, দিনুর মুখে আমার নিজের গান শুনে চমকে উঠে বলেছি—কার গান দিনু? বেশ লিখেছে তো!" (ব'লেই তাঁর সে কী স্নিগ্ধ ঈষৎ সলজ্জ হাসি—আহা, সে-হাসি কি ভুলবার?) কোনো কোনো মনীষীর লেখায় পড়েছি যে, স্মৃতিশক্তি হল স্বধর্মে কেরানী-ধর্মী—সস্তা ওর কৃতিত্ব—মনের শ্রেষ্ঠ শক্তিদের কোঠায় পড়ে না। অভিযোগটির মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও আমার মনে হয়, স্মরণশক্তির প্রাখর্য অনেক মনীষীর প্রতিভার বিকাশেও প্রচুর সহায়তা করেছে, যথা: শ্রীঅরবিন্দ, অলডাস হাক্সলি, বার্টরাণ্ড রাসেল। তবে জীবন বিচিত্র, তাই এ বিষয়ে কোনো সাধারণ সূত্র দেওয়া চলে না।

মরুকগে, আমি নিজে ভেবেচিন্তে স্থির করেছি যে, ঠাকুর আমাকে যতগুলি মূল্যবান সম্পদ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আমার স্মৃতিশক্তি প্রধানদের মধ্যেই পড়ে। অন্তত আমি নিজে আমার স্মৃতিশক্তির কাছে চিরদিনই ঋণী থাকব—বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, নানা সময়ে নানা মহাজনের উক্তি টুকে রেখে শুধু যে নিজেই গভীর আনন্দ পেয়েছি তা নয়, বহু মহাজন-পন্থীকেই আনন্দ পরিবেষণ করেছি। তাই তো আমি না মেনে পারি না যে, সর্বভুক হওয়ার ফলে আমার শুধু ক্ষতিই হয়নি—লাভও হয়েছিল সমূহ—কেননা বহু

গান ও বহু সুর মনে রাখার নিত্য-সাধনার ফলে আমার স্মৃতিশক্তির আরো উন্নতি হয়েছিল। সবাই জানেন—কোনো বৃত্তির অনুশীলন করলে তার তেজ বাড়ে। স্মরণশক্তির বেলায়ও একথা খাটে। আমি খুব চেষ্টা করতাম নানা গান ও সুর মনে রাখতে। বোধ হয় অত্যুক্তি হবেনা যদি বলি যে হিন্দী উর্দু বাংলা মিলিয়ে আমি চার-পাঁচশো গান খাতা না দেখে গাইতে পারতাম যখন তখন—অতুলদা আমার স্মরণ-শক্তির এ-দৌড় দেখে খুশি হয়ে আমাকে 'শ্রুতিধর' ব'লে ডাকতেন সময়ে সময়ে। য়ুরোপে যখন প্রথম রোলাঁর সঙ্গে কথালাপের রিপোর্ট লিখতে বসি তখন আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে উঠি লক্ষ্য ক'রে যে তাঁর বার আনা কথা আমার মনে গেঁথে গেছে। কেম্ব্রিজে দাবা খেলায় নাম করি। খেলার পরে বাড়ি ফিরে বাজিটা ফের খেলে দেখতাম—কোথায় কোন্ চালে ভুল হয়েছিল। তারপর শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে তাঁর মহাভারতপ্রমাণ গ্রন্থগুলি পড়বার সময়েও ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতাম যে, গুরুদেবের কোন্ স্মরণীয় উক্তি কোন্ বইয়ে পড়েছিলাম, অবলীলাক্রমেই রেফারেন্স দিতে পারতাম বন্ধুবান্ধবকে—যদিও এর একটি কুফল ফলেছিল এই যে, আমি বড় বড় উদ্ধৃতি দিয়ে মুরুব্বিয়ানা করতাম। এর পরে এ-মোহ কাটে বিষম আঘাত পেয়ে, যখন দেখি, এমনকি, ঋষি-কল্প গুরুবাক্য আওড়ালেও মনে শান্তি নামে না। তখনই লিখি অনামীতে আমার কবিতা: "কথা কথা কথা"—যে কবিতাটির অনেকেই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করেছিলেন, ওর মধ্যে আমার মধ্যেকার দুটি সদ্‌বৃত্তি ফুটে-ছিল বলে: দীনতা ও জিজ্ঞাসুতা। কিন্তু বকুবাবুর কথায় ফিরে আসি।

বকুবাবুই গানে আমাকে প্রথম তালিম দেন নাড়া বেঁধে। এতে আমার আনন্দের অবধি ছিল না—এই প্রথম ওস্তাদ বনতে চললাম—শুঁয়োপোকার গায়ে প্রজাপতির পাখা উঠতে শুরু করল বুঝি! মহা উৎসাহে আমি তাঁর কাছে একের পর এক আদ্যন্ত ভুল হিন্দি গান

শিখতে শুরু করলাম মানে না জেনে। একটি গান শুনে পরে সুরেশদা হেসে অস্থির—তাঁর কথা বলছি পরে—বললেন: "তন মন তু পয়দারুআ—এ কী রে!" এ-গানের অন্তরায় ছিল:

বিন দেখ নাহি পরত চায়েনু কও কায়সে কাটি হা দিনু আর বিনু

সুরেশদা বললেন: "দিনু আর বিনু, দু ভাই বেশ বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কেটে ফেলবার জন্যে বকুবাবুর এ নিদারুণ রোখ চেপে গেল কেন রে?" ব'লে বললেন: "শোন্, এ-গানটির শুধু বাণী হবে:

তন মন তো পে ডারিয়াঁ।

বিন দেখ নহি পরত চয়েন কহো কয়সে কটেঙ্গে দিন ঔর রয়েন। অর্থাৎ তনু মন তোমাকে সঁপলাম—তোমার অদর্শনে আসে না শান্তি, কাটিতে চায় না দিন ও রাত······" ইত্যাদি।

কিন্তু তখনো হিন্দিতে সুরেশদার অভ্যুদয় হয়নি তো—তাই আমি বকুবাবুর কাছে সানিধাপা সানিধাপা করে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ভুল হিন্দি বাণীর গানগুলি পরম ভক্তিভরে মনের আনন্দ-মন্দিরে সাজিয়ে পূজা ক'রে চলেছি। বকুবাবুর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট ছিল—তাই তিনি দেখতে দেখতে আমার মনের মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আজো আমি ভুলতে পারি নি কোমল গান্ধার খরজে তাঁর তারসপ্তকে পঞ্চমে স্থিতি। তাঁর টপ্পার দানাও ছিল চমৎকার। "ননদিনী বোলো নগরে ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ কলঙ্কসাগরে"—দাশুরায়ের এ-গানটি তিনি চমৎকার গাইতেন—আমি এখনো গাই সময়ে সময়ে। বড় সুন্দর খাম্বাজ টপ্পাও শিখেছিলাম। তবে তিনি খেয়াল বেশি জানতেন না, তাই মাসকয়েক তাঁর কাছে শিখে যাই দৌলতরামের কাছে।

এ-পালোয়ানটি আমাকে শেখালেন দুর্ধর্ষ সার্গম। একটি ভৈরোঁ খেয়ালও শিখিয়েছিলেন। সুরটি ছিল ভালো—কিন্তু সার্গমের চর্কিবাজিতে গানটি দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। এত বেশি সার্গম ভালো লাগল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন বড় কটুভাষী ও বিশ্ব-নিন্দুক; কোনো ওস্তাদই কিচ্ছু জানে না। ত্রিলোকে সবজান্তা

কেবল ত্রিলোকী দৌলতরাম। তাই কিছুদিন পরেই বিরক্ত হয়ে বিদায় নিই। তবু মানতে হবে, সার্গম শিখে আমার কিছু উপকার হয়েছিল।

তারপর শিখি একজন সত্যিকার বড় গায়কের কাছে শোরীর টপ্পা। তিনি চন্দননগরের রাম কথক। বড় মধুর গাইতেন শোরীর টপ্পা। তাঁর কাছে ত্রিশ-চল্লিশটি টপ্পা শিখে আমি বিশেষ লাভ করি—আরো এইজন্যে যে, তানপুরার সঙ্গে প্রথম গাওয়া শুরু করি আমি তাঁর কাছেই। বলতে ভুলেছি—বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে আমার বোন মায়া গান শিখেছিল কিছুদিন। ঐ সঙ্গে আমিও শুনে শুনে শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ। একটি রাগ—মধুমাদ সারং—"ধর্ম সংবর্ধিনী দনুজ সংমর্দিনী···" আরো কয়েকটি ধ্রুপদ তথা তেলানা শিখেছিলাম মনে নেই। তবে লাভ হল এই যে ধ্রুপদে প্রথম রস পাই তাঁর গান শুনে। গ্রামোফোনেও তাঁর রেকর্ড থেকে শিখেছিলাম কয়েকটি গান ও কিছু সার্গম।

এর পরে আমি কখন কার কাছে কী পর্যায়ে গান শিখি ঠিক মনে করতে পারছি না, তবে মনে আছে, জমীরুদ্দিন খাঁর কাছে কিছুদিন শিখেছিলাম খেয়াল ও গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে ঠুংরি। মিশ্রজী ছিলেন বিখ্যাত সারঙ্গিয়া—সঙ্গত করতেন গহরজানের সঙ্গে। সুরেন মামার কাছে প্রায়ই শুনতাম যে, সারঙ্গিয়ারা সুরের অন্ধিসন্ধি জানে ও বাইজিদের শেখায়। এই কথা শুনে মহা উৎসাহে তাঁর শরণাপন্ন হই ও শিখি পর পর পনের কুড়িটি খেয়াল ও ঠুংরি—ঠুংরিই বেশি। লছমিপ্রসাদ মিশ্রের কাছেই কিছুদিন খেয়াল ও ঠুংরি শিখি।

কিন্তু এ-সব শিক্ষা খানিকটা গৌণই বলব। কারণ এঁদের কাছে গান শিখে কমবেশি লাভ করলেও এঁরা কেউই আমার কিশোর মনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেন নি। আমার জীবনের একটি ল্যাণ্ডমার্ক হয়ে এসেছিলেন এক অবিস্মরণীয় সন্ন্যাসী, একটু আগে যাঁর নামোল্লেখ

করেছি—সুরেশ-দা। তাই এঁর কথা একটু ফলিয়েই বলতে হবে।

ইনি ছিলেন সন্ন্যাসী—বলেছি। কিন্তু এমন সন্ন্যাসী আমি আর দেখি নি—বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেশার পরেও। যেমন সুপুরুষ তেমনি সুগায়ক, তেমনি মিশুক, তেমনি ফিটফাট সাজসজ্জা। গৈরিক রঙে রাঙানো চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবি পাগড়ি পরে যখন তিনি আসরে বসতেন তখন সভা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। রূপেই তিনি অর্ধেক যুদ্ধ জয় ক'রে ফেলতেন। সত্যিকার পার্সনালিটি যাকে বলে। তার পর যখন কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে ভজন ধরতেন অপরূপ হার্মোনিয়ম সঙ্গতে—মনে হ'ত যেন আকাশ থেকে গন্ধর্বরা প্রসন্ন হয়ে পুষ্পবৃষ্টি শুরু করেছেন। তাঁর স্নেহ পেয়ে আমি সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে ক'রে এসেছি চিরদিনই। তিনি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। তবে বছর কুড়ি আগে আকবর হায়দারির এক মেয়ের বাড়িতে যখন আমি গান করি—বম্বে শহরে—তখন সেখানে এক মুসলমান ভদ্রলোক আমার মুখে সুরেশ-দার শেখানো "তুনে ক্যা কিয়া মুঝে বতা তো সহি" গজলটি শুনে চমকে উঠে বলেন আমাকে যে; বৃন্দাবনের কাছে কোন্ এক জঙ্গলে একদিন তিনি এক সুপুরুষ সন্ন্যাসীকে এ-গানটি গাইতে শুনেছিলেন। তিনি একলা গাছতলায় ব'সে গাইছিলেন গানটি—শুনে মুসলমান শ্রোতাটি মুগ্ধ হয়ে আলাপ করেন ও শোনেন তাঁর নাম—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী। আমি বলি—তিনিই আমার গুরু—ভজনের।

আমি যখন বি. এস-সি পড়ি তখন এই অপরূপ ব্রহ্মচারী কলকাতায় এসে থাকতেন এণ্টালিতে ও নানা মারোয়াড়ী বাড়িতে দিনের পর দিন আসর জমাতেন। শান্তিপুরের ব্রাহ্মণ—সুরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম। কিন্তু বাঙালি শ্রোতারা তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, সুরেশ-দা ব'লেই ডাকতেন।

ইনি শুধু যে গানে গন্ধর্ব ছিলেন তাই নয়—তাঁর হিন্দি ও উর্দু

গানের বাণীও ছিল নিখুঁৎ অনবদ্য। বহু বৎসর বৃন্দাবনে থেকে হিন্দি উর্দু তিনি বলতে পারতেন মাতৃভাষার মতোই স্বচ্ছন্দে। ভাষা শিক্ষায় তাঁর একটা সহজপটুতা ছিল মনে হয়, কারণ গুজরাতি ভাষাও তিনি চমৎকার বলতে পারতেন। বাঙালীর মুখে এমন অনর্গল চোস্ত হিন্দি বা উর্দু খুব কমই শুনেছি। তাই তাঁর কাছে গানের তালিম নিয়ে আমার একটি মস্ত লাভ হয় এই যে, আমি শুদ্ধ বাণীতে হিন্দি ও উর্দু গান গাইতে শিখি। তিনি প্রায়ই ঠাট্টা করতেন বাঙালীদের হিন্দি উচ্চারণ ও হিন্দুস্থানীদের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে। তাঁর কাছ থেকেই আমি শিখি বাইজিদের বাংলা গানের ক্যারিকেচার করতে :

নিমিসের দেখা জোদি (আরে হাঁ) পাই হে তুম্‌হারি
আঁখেতে মছাই জোতো (আরে হাঁ) বালাই তুম্‌হারি

…সুরেশদার ঠোঁট বেঁকিয়ে বাইজিদের নকলে এই ধরনের গান গাওয়া শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম—"গুণেমণি! দাসি তোবো পোয়" ছিল তাঁর একটি প্রিয় গান। কিন্তু এবার প্রগলভতা রেখে তাঁর গুণকীর্তনের কোঠায় আসি।

সুরেশ-দা যাই গাইতেন চমৎকার আসর জমিয়ে গাইতেন—নিখুঁৎ সুরে তালে হার্মোনিয়ম-সঙ্গতে—একেবারে দিগ্বিজয়ী ভঙ্গিতে। তাঁর উর্দু হিন্দি ও বাংলা গান শুনে আমার মনে হ'ত যেন দেবদূত সশরীরে নেমে এসেছেন দেবতার খবর দিতে। দেখতে দেখতে তিনি আমাকে তাঁর ভজনে ও কীর্তনে আবিষ্ট ক'রে তুললেন, আর অমনি মনে মনে ফিরে এল আমার শৈশবের ভক্তি উচ্ছ্বাস যাকে মিথ্যে খেয়ালটপ্পার মোহে ভুলতে বসেছিলাম। তাঁর কাছে গিয়ে যখনই গান শিখতাম পুলকে আমার রোমাঞ্চ হ'ত। চোখে জল ভ'রে আসত তাঁর অপরূপ গজলভাঙা সুরে গাইতে :

কী গুণ বলো কী গুণ জানে হরি হে, তোমার বাঁশের বাঁশি।
এ কি সাধনা তার, কি মহিমা তোমার কেমনে ঢালে সে অমিয়রাশি!

আহা, এ গানটি যে কী অপূর্ব গাইতেন তিনি!—যখন তিনি গাইতেন শেষ অন্তরা :

হাসে বাঁশি নাথ তব সহচর হরিতে সরলা অবলা অন্তর,
অবোধ পরাণ বোঝে না কো তাই সকলি ত্যজিয়া ছুটিয়া আসি—

তখন সত্যিই বুকের মধ্যে আমার অশ্রুসাগর উঠত দুলে, মন হয়ে যেত উদাস—তখনকার মতন। কিন্তু সে অন্যকথা। গানের কথাই বলি, নৈলে শেষ করা দুর্ঘট হবে।

এ-গানটি তিনি বেঁধেছিলেন একটি উর্দু গজলের সুরে—যেটি পরে গ্রামোফোনে আমার হিন্দুস্থানি গানের মধ্যে সবচেয়ে লোকপ্রিয় গান হয়ে ওঠে। এ-গানটির বাণী শুদ্ধ ছিল ব'লে যেখানে সেখানে গেয়ে উর্দু-হিন্দিভাষীদের মন গলিয়েছি। গানটি গ্রামোফোনে অনেকেই শুনেছেন :

তুনে ক্যা কিয়া মুঝে বতাতো সহি
মেরা চৈন গয়া মেরি নিদ গঈ।

তাঁর কাছে আরো উর্দু গজল শিখেছিলাম কিন্তু সেগুলির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব ছিল না। এছাড়া, তাঁর কাছে অনেকগুলি চমৎকার ভজন শিখি যদিও ইন্দিরার অতুলনীয় ভজনের পরে সে-সব ভজন গাইতে আর মন চায় না। বলে না : "ভালোর সবচেয়ে বড় শত্রু মন্দ নয়, সে হ'ল—আরো ভালো।"

কিন্তু তবু বলবই বলব যে, আমার জীবন ভজনের দিকে মোড় নেয় প্রথম সুরেশ-দার গান শুনেই। এখানেও আজ দেখতে পাই বিধাতার সেই করুণার অভ্যাগম—যে ওস্তাদি গানের সার্গম পর্বের মোহলগ্নে এসে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল :

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসংগঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

অর্থাৎ

নয়নের শেষ লক্ষ্য—তোমার দরশন,
তনুর স্বপ্ন—তোমার অঙ্গ-পরশন,
রসনা গাহিতে চায়—নামগুণকীর্তন,
দুর্লভ ভবে হেন ভাগবত মহাজন।

মনে করিয়ে দিয়েছিল বড় সময়েই, বলব। নৈলে হয়ত গানের সন্ধানে ঠিক পথটি খুঁজে পেতে আমার আরো দেরি হ'ত। দেরি হ'ত বলছি এই জন্যে যে, আমার জীবনে ভজন-লগ্ন আসতই আসত, কারণ আমি মুখে ওস্তাদিপন্থী হ'লেও অন্তরে ছিলাম তো ভজনপন্থীই বটে—কেবল তখনো আত্মপরিচয় হয় নি ব'লে রসনার শেষ লক্ষ্য যে হরিনামকীর্তন এই সত্যের সত্যটিকেই ভুলতে বসেছিলাম। কিন্তু ঠাকুর যাকে কৃপা করেন সে ঠাকুরকে ভুললেও তিনি তো আর তাকে ভোলেন না—তাই নানা সময়ে অপ্রত্যাশিত লগ্নে দুর্বাসা মুনির মতনই হানা দিয়ে চমকে ডাক দিয়ে বলেন: "অয়মহং ভোঃ।" দুর্বাসার সঙ্গে ঠাকুরের তফাৎ কেবল এইখানে যে, আনমনা শকুন্তলা অতিথি-সৎকার না করলেও তিনি শাপ দেন না—মৃদু হেসে অদৃশ্য হন—ব'লে যে পরে আসবেন আবার—সময় হ'লে। আমার গানের বিকাশে এই সময়ে তিনি ঠিক এমনি ভাবে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিলেন—আমার তখনো ওস্তাদি গানের মোহ কাটেনি ব'লে। কিন্তু সুরেশ-দার মাধ্যমে ঠাকুর এ-সময়ে এসেছিলেন শুধু ভজন শেখাতেই নয়—মনে আর একটি ইঙ্গিত অঙ্কুর-রূপে বুনে রেখে যেতে যে, হিন্দি ভজনের সুরে বাংলা গান বাঁধলে বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের সম্পদ বাড়বে। উত্তরজীবনে আমি ইন্দিরার প্রায় পাঁচশ হিন্দি ভজনের অনুবাদ করি খানিকটা এই পরম ইঙ্গিতকে স্মরণ ক'রেই বলব। মনে পড়ে তাঁর একটি গজলের সুর—(গজলটি আমি আজো গাইতে পারি—যদিও গাই না)—কী সুন্দর সুরটি, আহা। যখন তিনি গাইতেন তাঁর বিশুদ্ধ উর্দু'তে—কান ও প্রাণ দুই-ই জুড়িয়ে

যেত যেন। তবু বাঙালীদের মন খুঁৎ খুঁৎ করত এর সস্তা ভাবে। তাই একটি শ্লোক (শের) মাত্র উদ্ধৃত করি :

জফাজু বেমরোবৎ বেবফা না আশনা তুম হো
মগর ই তনী বুরায়ী পর ভী কিৎনী খোষনুমা তুম হো

অর্থাৎ

প্রেমিক তুমি নও, তুমি নও একান্ত হে নটবর !
ছলের দোষের নেই সীমা হায়, তবু তুমি কী সুন্দর !

কিন্তু এই সুরে বসিয়ে যখন তিনি গাইতেন :

নীলসলিলা লহরীলালা যমুনা তটিনী !
(ও তার) শ্যাম তটে শ্যামের বাঁশরী বাজিত দিবাযামিনী।
(ও তার) নীল গায়
ছুলিত শ্যামের নীল ছায়,
(আর) নীলে নীলে নিখিল ধরণী হ'ত গো নীলবরণী !

তখন আমার মন উচ্ছল হয়ে উঠত যমুনার তটে সেই চিরন্তন মুরলীধরের ছবি কল্পনা ক'রে ! শুধু আমার নয়, অনেক ভক্তের প্রাণই রসিয়ে উঠত, চোখ ঝাপসা হয়ে আসত অশ্রু-আভাসে।

সুরেশ-দার কাছে গান শিখতে গিয়ে যেন নতুন ক'রে দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার শৈশবের প্রায় ভুলে-যাওয়া মুরলীমন্ত্রে—যে-বাঁশি আমার সরল শিশুহৃদয় শুনেছিল কিন্তু তার পরে আবার ভুলে গিয়েছিল কৈশোরে। কিন্তু ভুলতে কি কেউ পারে কিছু—বিশেষ করে নীল যমুনার বাঁশি ? সে-বাঁশির রঙে যে-মন একটিবারও রঙিয়ে উঠেছে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে—কেন না, সে যে-মোহের টানেই বিপথে পা বাড়াক না কেন, মোহের আঁধার তার একদিন না একদিন কাটবেই কাটবে সেই হারিয়ে-যাওয়া বাঁশির আলোয়। এই ই বুঝি ঠাকুরের লীলা—তাই ভাগবতে বার বার গোপীহিয়া কেঁদে বলেছে :

পত্তিসুখান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলংঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

অর্থাৎ

প্রিয়-পরিজন-লাজকুলভয়-মান-অভিমান-বাধা
সব ভেসে যায় যবে বাঁশি তব শোনে নাথ, হিয়া রাধা!
শুধু হায় লীলা নিঠুর তোমার এ কী!
সব ছেড়ে যবে ধাই যমুনায়—দেখি ঃ
মুরলীমোহন নাই নাই—হয় সার শুধু বৃথা কাঁদা ঃ
বাজে কানে বাজে প্রাণে মুরলীর "আয় আয়" সুর সাধা।

সুরেশদার কাছে শিখেছিলাম অনেকগুলি হিন্দি ভজন, কয়েকটি উর্দু গজল ও চার পাঁচটি বাংলা কীর্তন। উর্দু গজলগুলির মধ্যে একটিই (তুনে ক্যা কিয়া) আমার উত্তরজীবনে কাজে এসেছিল যখন আমি (শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পরে) ভক্তিসঙ্গীত ছাড়া আর কোনো গানই গাইতাম না। পণ্ডিচেরিতে আট বছর কাটিয়ে ১৯৩৭-এ যখন কলকাতায় আসি তখন আমাকে অনেকেই গাইতে বলতেন আমার সাবেক কালের প্রাক্-যোগজীবনের—গজল ঠুংরি। কিন্তু আমি গাইতাম না বলে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হতেন। এ নিয়ে একবার পণ্ডিচেরিতেও তর্ক উঠেছিল—আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু 'আর্ট ফর আর্টস সেক' নীতিকে সমর্থন করে আমাকে বলেন যে, প্রেমের গান গাইতে না চাওয়া চেতনার অবনতিরই সূচনা করে। আমি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর এ-অভিযোগের কথা জানালে গুরুদেব ২৭-৮-৩৩ তারিখে একটি চিঠিতে আমাকে লেখেন (অনুবাদ দিলাম) ঃ 'ম—যদি বলে থাকে যে আদি বা শৃঙ্গার রসের গান গাওয়া ছেড়ে দেওয়াটা তোমার সঙ্কীর্ণতা বা অধোগতির সূচনা করে, তাহলে আমাকে একটু ফাঁপরেহ পড়তে হয় বৈকি। যদি কারুর রুচি বদল হওয়ার ফলে তার আর জ্যাজ সঙ্গীত ভালো না লাগে ও সে শুধু

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারদের সঙ্গীতশৈলীই উপভোগ করে তা হ'লে বলবে কি—তার অধঃপতন হয়েছে? নিচের স্তরের থেকে উপরের স্তরের চিন্তা ভাব ও কলা কারুর আত্মপ্রকাশে উত্তীর্ণ হওয়াকে অধোগতি বলি কী ক'রে? আমি নিজে এক সময়ে প্রাণিক (vital) স্তরের প্রেমের-কবিতা লিখতাম, কিন্তু এখন আমি কেবল আত্মিক প্রেমের সম্বন্ধেই কবিতা লিখতে পারি—এ থেকে কি প্রমাণ হয় আমি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছি, না বলব—আমি উচ্চতর চেতনায় অধিরূঢ় হয়েছি ব'লেই নিম্নতর প্রাণশক্তির প্রকাশে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে পারি না? যারই চেতনার স্তর বদলায় তারই সম্বন্ধে একথা খাটে। যদি কেউ বয়স্ক হবার পরে তার ছেলেমানুষি খেলনায় আর আনন্দ না পায় তাহলে বলবে কি এর জন্যে দায়ী তার সঙ্কীর্ণতা বা অধঃপতন?" (মূল ইংরাজি চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দের পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে।)

শ্রীঅরবিন্দের এ-চিঠিটি থেকে আমি কম আলো পাইনি, কেন-না তাঁর নির্দেশে আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল একটি সনাতন উপলব্ধি: বৃন্দাবনের বাঁশির ডাক শুনে যে-মানুষ রাতারাতি সাবালক বনে গেছে তার আনন্দ সে নাবালক বুঝতে পারে না যে সে-বাঁশি আদৌ শোনেইনি। এজন্যেই অধ্যাত্ম সাধকের ও গড়পড়তা সংসারীর মধ্যে দেখতে দেখতে দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে এবং সংসারীরা বৈরাগীকে বেদরদী মনে ক'রে ভুল বোঝেন। গানের ক্ষেত্রেও এই কথা, অর্থাৎ ভজন কীর্তনের রসে যার মনপ্রাণ রঙিয়ে উঠেছে তার কাছে অভজন অকীর্তনের রং ফ্যাকাশে না লেগেই পারে না—পক্ষান্তরে ভজন কীর্তনে যে গড়পড়তা সঙ্গীতরসিক আদৌ রস পেতে শেখেনি তার কাছে মনে হয় ভজন কীর্তন উচ্চ সঙ্গীতই নয়। এ-প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু আমাকে বলেছিলেন বিস্ফারিত নেত্রে: "তুমি বলো কী দিলীপ? তুমি যোগী হয়ে এমনই অরসিক ব'নে গেলে যে নজরুলের 'আমারে

চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'-র মতন সরস গানকে জাতে ঠেলা করতে চাও।" আমায় রুচি বদলের কাহিনীটা কোনোমতেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, ভজনকীর্তনকে তিনি গানই মনে করেন না, বলেন: "এক আধটা ভজন মন্দ লাগে না, কিন্তু গানের রাজ্যে ওর দাম নেই বললেই হয়।" মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথিকা—প্যারাব্‌ল:

একদা এক শিষ্য পেলো একটি মণি পথের বাঁকে।
কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতে ঘরে বলেন হেসে গুরু তাকে:
"বলছিলাম না সেদিন তোকে—যেমন আধার তেমনি বিচার,
যেমন পুঁজি যার—সে ধরে দর তেম্‌নিই যা দেখে তার?
পারিসনি তুই এ-কথাটার নিহিতার্থ বুঝতে—না রে?
বুঝবি—যদি এই মণিটি যাচাই করতে যাস বাজারে।"

বেগুন বেচে মুদী। শিষ্য গেল প্রথম তার দোকানে।
মণি দেখে বলল মুদী: "ধ্যেৎ! এর দাম কে না জানে?
নয়টি বেগুন দিতে পারি এর বদলে।" শিষ্য বলে:
"দশটিই দিন পুরাপুরি।" মুদী বলে: "যাও না চ'লে!
কেন বকাও? কে না জানে—পাঁচটি বেগুন ঠিক দাম এটার—
দর দিয়েছি আমি বেশি।" শিষ্য হেসে শালওয়ালার
কাছে যেতে বলল সে: "এর বদলে ভাই দিতে পারি
শাল বড় জোর দুটি।" শিষ্য গেল তখন জবর ভারি
এক জহুরির কাছে। দেখেই চম্‌কে বলে সে: "এ কী রে?
লাখ টাকা নে—এক্ষুনি দে—ছাড়ব না তো—এ যে হীরে!"

কথাকয়টি বন্ধুকে বলিনি কারণ ভজনকীর্তনের ব্যাপারে তিনি যে বেগুনওয়ালার মতই অজ্ঞ ও অসমজদার এ-হেন দারুণ ইঙ্গিত

করলে তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যেত। তাছাড়া আমার প্রকৃতি সত্যিই কোনো দিনও ঝগড়াটে ছিল না। তাই বন্ধুদের কাছে আঘাত পেলেও প্রত্যাঘাত করতাম না সহজে। মরুক গে, ফিরে আসি ইতিহাসের অধ্যায়ে।

বিলেতেও আমার নতুন নতুন গান শেখার উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি—আমি বিখ্যাত কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অনেকগুলি রাগ ও ভজন শিখেছিলাম। হারীনের গলা চমৎকার খেলত, এমন কি আবদুল করিমের অনেক তানই সে হুবহু নকল করতে পারত। তার মুখে আবদুল করিমের গানের অপরূপ ঢং শুনেই আমি প্রথম আবদুল করিমের ভক্ত হয়ে উঠি ও সংকল্প করি—দেশে ফিরে তাঁর কাছে কিছুদিন খেয়ালের তালিম নিতেই হবে।

* * *

বিলেতে আমি সুরেশদার নানা ভজন ও গজল গেয়ে নাম করেছিলাম ছাত্রসমাজে। কিন্তু আমি গজল গাইলেও বাজে গজল বড় একটা গাইতাম না—যে সব গজলের লক্ষ্য ভগবান্ শুধু সেই সব গজলই গাইতাম সাধ্যম'ত। দেশে ফিরেও আমি মূলত এই আদর্শের পথেই চলেছিলাম, মানে যদিও ঠুংরি গজল বর্গীয় গান গাইতাম নানা সভায়ই—কিন্তু সবাই স্বীকার করত যে আমার কণ্ঠ ও অন্তর সবচেয়ে ছাড়া পেত ভক্তিসঙ্গীতেই। এইজন্যেই অতুলদার ভক্তির গান আমি সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিলাম—যদিও তাঁর 'কে আবার বাজায় বাঁশি, 'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে', 'কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা' জাতীয় সেন্টিমেন্টাল প্রেমের গানও কখনো কখনো উপরোধে প'ড়ে গাইতাম—বিশেষ ক'রে আমার চ্যারিটি কন্সার্টে। গম্ভীরাত্মা নীতিবাদীরা প্রশ্ন করতে পারেন: কখনো কখনোই বা গাইতাম কেন ভক্তিসঙ্গীতকে বরণ করার পরেও? উত্তর এই যে, জীবনে রুচি বদলালেও স্বভাব বদলাতে সময় লাগে—অতীতের

অভ্যাস পেয়ে বসে মানুষকে—মরিয়া-না-মরে-রাম ঢঙেই দাবি করে তার চিরাভ্যস্ত খোরাক। ফলে এ দোটানায় জাগত দোলা, অতৃপ্তি, অস্বস্তি—যার অশান্তি থেকে সে-সময়ে কিছুতেই অব্যাহতি পেতাম না। সর্বপ্রথম মুক্তির স্বাদ পাই—যখন শ্রীঅরবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়ে মনের জোর অর্জন করি ও পণ নিই যে ভক্তিসঙ্গীত ছাড়া আর কোনো গানই গাইব না ভক্তিবিরাগী শিল্পী বন্ধুদের ঘোর আপত্তি সত্বেও। গুরুদীক্ষায় কীভাবে শিল্পসাধনাকে অধ্যাত্মসাধনার কাজে লাগিয়েছিলাম সে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় এখনো আসেনি—জানি না কোনোদিন লেখা হয়ে উঠবে কিনা—কারণ আজ যে-মন আত্মকথা লেখার তাগিদ পাচ্ছে এমন হ'তে পারে বৈকি যে সে-মনের মতিগতি পরে একদম বদলে যাবে, মনে হবে—কী হবে লিখে? কিন্তু পরের কথা জানেন শুধু পরাৎপর আর কেউ নয়, তাই ও নিয়ে মিথ্যে মাথা বকিয়ে লাভ নেই, চলি যেপথে চলতে আজকের প্রাণ সহজ আনন্দে সাড়া দেয়—লিখে যাই কত ঘাটের জল খেয়ে কেমন করে পৌঁছেছি ঠাকুরের চরণে—কী ভাবে সাঙ্গীতিক যশঃস্পৃহা আদর্শবাদের মুখোশ পরে আমাকে নাকানিচোবানি খাইয়েছে—যদিও তা থেকেও যে তীর্থপথের পাথেয় কিছুই পাইনি এমন কথা বলব না।

যশঃস্পৃহা—ঠিক শব্দটিই এসে গেছে। কারণ বিলেত থেকে ফিরে যশস্বী হতে না হতে মোহ আমাকে পেয়ে বসল—আমি মহা দাপাদাপি সুরু করলাম আরো যশস্বী হ'তে চেয়ে। শুধু গানে নয়—সাহিত্যেও। কিন্তু পণ্ডিচেরী প্রদেশের আগে—অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে—আমার সাঙ্গীতিক জীবনের মুখরতা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আমার সাহিত্যসৃষ্টির অর্ধস্ফুট আবেদন ডুবে গিয়েছিল আমার সঙ্গীতানুরাগীদের করতালিতে। আমি সে-করতালিতে উজিয়ে উঠে একের পর এক ওস্তাদ ও বাইজির কাছে গান শিখে বাহাদুর ওস্তাদ বনতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম—আরো ওস্তাদদেরও ওস্তাদ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের উচ্ছ্বসিত তারিফ

পেয়ে। তিনি একবার আমাকে 'নাইটিঙ্গেল অব্ বেঙ্গল' ব'লে আমার সঙ্গীতিপ্রতিভা সম্বন্ধে যে-তারিফ করেছিলেন আমি তাকে আমার প্রাপ্য (ডিউ) বলে গণ্য ক'রে হয়ে উঠতে চাইলাম তাই, যাতে আমার মন সায় দিত না : অর্থাৎ ধনুর্ধ'র ওস্তাদ। ফল যা হবার—কর্মফল এড়াবে কে?—বাহাদুরির আত্মাভিমানে আমার অন্তরের সরল উচ্ছল ভক্তিরস এল শুকিয়ে, অথচ তবু আমি দেখেও দেখতে চাইলাম না যে আমি চিরদিন যার বিরুদ্ধে লড়েছি—কি না প্রাণহীন কালোয়াতির কসরৎ—দৃপ্ত মোহে তাকেই বরণ করতে চাইছি—কাঞ্চন ছেড়ে কাঁচ কুড়োতে। তাই তো আমি ঠিক করলাম ভজনকীর্তন—ও তো হবেই, এখন ক'ষে শিখি ধ্রুপদ খেয়াল : লোকে যেন বলতে না পারে উচ্চসঙ্গীতের বনেদ আমার নেই। যে-কথা সেই কাজ : ধরলাম একবার ধ্রুপদের মুকুটমণি শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে। তিনি তখন পাথুরিয়াঘাটায় থাকতেন।

এ-মহাগুরুর প্রসাদে আমি দেখতে দেখতে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর ধ্রুপদ, ধামার ও চৌতাল শিখে পাখোয়াজে শুধু যে নিখুঁৎ তালে গাইতে শিখেছিলাম তাই নয়—নানা দূন চৌদূন আড়ি কুয়াড়ির কসরৎ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে দিলাশা দিতাম 'বা রে আমি!' ব'লে। গোঁসাইজি আমার 'বাহাদুরি' দেখে বিস্মিত হয়ে বলতেন : 'ছেলেটির যদি মাথা গরম না হয়ে যায় তবে ও একজন বড় ধ্রুপদী হয়ে উঠবে।' কিন্তু হায়রে নিয়তির পরিহাস!—এই সাবধান বাক্যই আমার কাল হল—আমার মাথা একেবারে টগবগে হয়ে উঠল—আমি আরো ক'ষে কোমর বাঁধলাম শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে কুস্তিগির কালোয়াৎ বনতে।

আমার একটিমাত্র বাঁচোয়া ছিল : আমি অহংকার করলেও শেখা যে দরকার এটুকু ভুলতাম না। তাই ধ্রুপদ শিখবার সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ করতে লাগলাম একজন বড় খেয়ালী ওস্তাদের।

খৃষ্টদেব মিথ্যা বলেননি—He who seeketh findeth—আমিও

খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একজন উঁচুদরের খেয়ালী গুরু: শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন চমৎকার গম্ভীর ও মনোহর খেয়ালের ঢং আমি বেশি শুনিনি। বামাচরণবাবুর গায়কী কৃতিত্ব বেশি ছিল না, কিন্তু শিক্ষকী কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। তানালাপে তিনি সুরেনমামার বা আবদুল করিমের সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু উদাত্ত খেয়ালের কুলীন চালে যে-ছবিটি তিনি ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠে যে মুগ্ধ হ'তে হত—বিশেষ করে তাঁর হলক তানে। এত ভালো হলক তান আমি আর কোনো গুণীর কণ্ঠে শুনিনি যদিও সগমক তানে আল্লাবন্দে খাঁ ও বিদ্যুৎগতি তানে আবদুল করিম তাঁর চেয়ে অনেক বেশি রসসৃষ্টি করতে পারতেন।

বামাচরণবাবু যৌবনে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিখতে পাড়ি দিতেন মেটেবুরুজে যখন লক্ষ্মৌয়ের বিখ্যাত নবাব ওয়াজিদ আলি শা লক্ষ্মৌ থেকে নির্বাসিত হ'য়ে সেখানে বসবার শুরু করেন। তাঁর সর্বপ্রধান সভাগায়ক আলিবক্স খাঁ ছিলেন এই উৎসাহী বাঙালী যুবকের একমাত্র গুরু। বিখ্যাত অঘোর চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর গুরুভাই। তবে অঘোর বাবু শিখতেন ধ্রুপদ, বামাচরণবাবু খেয়াল। তাঁর কাছে ওয়াজিদ আলি শার সভার আরো কয়েকটি ওস্তাদ ও বাইজির গল্প শুনতাম প্রায়ই মুগ্ধ হয়ে। সে সব বলার প্রয়োজন নেই—কেন না তার সঙ্গে আমার গীতসাধনার কোন সম্বন্ধই নেই। কেবল একটি কথা বলব।

বামাচরণবাবু আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে খেয়াল শেখাতেন। কিন্তু কী যে বকতেন দিনের পর দিন: "ছি ছি দিলীপ; শেষে ঠুংরি! তোমার এমন গলা—তুমি কি না ঠুংরি গাও? সাত নকলে আসল খাস্তা! তোমার মুখে হলক তান আমাকে মেটেবুরুজের খেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়—এ-হেন তুমি কিনা বাইজির ঢং নকল করো? ওদের কণ্ঠের মিহি তানে পারবে তুমি ওদের টেক্কা দিতে? তুমি চলো তোমার পথে—অপরের পথে চলবার এ-দুর্মতি কেন? দুটো সস্তা হাততালি পেতে? ছি ছি ছি! তোমার আশ্চর্য কণ্ঠ শুনি আর কপাল

চাপড়াই—কণ্ঠে যার কিন্নর মগজে তার দুষ্টু সরস্বতী ভর করল কেন গো ব'লে।"……এইভাবে তিনি আমাকে নিরন্তরই ধমকাতেন। কিন্তু সে স্নেহের মিষ্টি ভর্ৎসনা, তাতে তাপ নেই তো—তাই তাঁর ভর্ৎসনা শুনে আমার বন্ধুবান্ধব সবাই হতেন হেসে কুটিকুটি, আমিও হেসে সায় দিতাম। মনে আছে একদিন আমার গীতিশিষ্যা ৺উমা বসু তাঁর অশ্রান্ত বকুনি শুনে কী যে খুশী। হাততালি দিয়ে বলেছিল: "তোমাকেও বকতে পারে এমন গাইয়ে আছে মণ্টুদা?"

তাঁর কাছে আমি পুরো দুটি বৎসর গান শিখেছিলাম। এর আগে বা পরে এতদিন ধ'রে কোনো ওস্তাদের কাছেই আমি গান শিখিনি কখনো—শেখা সম্ভব ছিল না বলেই। কারণ আমার তো শুধু গানের নেশা নয়—ছিল আরো অনেক নেশা: ভাষা-শেখার, পড়ার, ভ্রমণের, গুরু-খোঁজার, বাণীসংগ্রহের, মেলামেশার—সর্বোপরি—লেখার। এখানে একটি কথা বলবই বলব—যা থাকে কপালে। মানে সুধীবৃন্দ মৃদু হেসে মাথা নাড়লেও বলব কেন না এ বিশ্বাস আমার বহুদিনের। কথাটা এই যে, আমি নিজেকে খুব গভীরভাবে নিরীক্ষা তথা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সাহিত্য আমার কাছে গানের থেকে একটুও কম প্রিয় নয়। বড় লেখকের লেখা প'ড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বড় গায়কের গান-শুনে-পাওয়া আনন্দের চেয়ে এক তিলও কম নয়। এক্ষেত্রে আমার হয়ত রোঁলার সঙ্গে কিছু মিল আছে কারণ তিনিও শেষ পর্যন্ত কোনোদিনই জোর ক'রে বলতে পারেন নি—কাকে তিনি বেশি ভালোবেসেছিলেন—সাহিত্য না সঙ্গীত? আমি আমার জীবনের প্রাক্-যোগপর্বে অবশ্য সঙ্গীতচর্চাতেই বেশি আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু ১৯২৮-এ শ্রীঅরবিন্দের কাছে যোগদীক্ষার পরে আমার সাহিত্য-অনুরাগ আমাকে বানের জলের মতন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—দিনের পর দিন। পণ্ডিচেরিতে পঁচিশ বৎসর থেকে শ্রীঅরবিন্দের স্নেহোৎসাহে আমি দিনের পর দিন সাহিত্য-সাধনাতেই ডুবে থাকতাম বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু সে-বিকাশ পরে হ'লেও প্রাক্‌যোগপর্বেও আমি হৃদয়ে প্রবল টান অনুভব করতাম সাহিত্যের দিকে—বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর থেকে। তাই বলছিলাম গানে আমার পক্ষে সে-সময়েও ঐকান্তিক হওয়া সম্ভব ছিল না। লেখায় না হোক পড়াশুনোয় আমার বহু সময় যেত—লিখতামও সময় পেলেই কিন্তু সময় বেশি পেতাম না বলে পণ্ডিচেরি-প্রয়াণের পূর্বে লেখার সাধনাকে বরণ করতে পারি নি তেমন ক'রে—যে জন্যে শরৎদা আমাকে একাধিকবার তাঁর পত্রে ভর্ৎসনা করেছিলেন। এ-সময়ে আমি সাহিত্যসাধনায় উৎসাহ পেয়েছিলাম শুধু তাঁরই কাছে। আমার বন্ধুরা কেউই আমার সাহিত্যিক উচ্চাশাকে আমল দেন নি—অধিকাংশই স্বতঃসিদ্ধের মতন ধরে নিয়েছিলেন যে, আমি স্বধর্মে সাঙ্গীতিক মাত্র, সাহিত্যিক বা কবি নই। এতে আমি গভীর দুঃখ পেতাম ব'লেই শরৎদার কাছে কৃতজ্ঞতার আমার অবধি ছিল না। পরে মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দের উৎসাহ পেয়ে আমার এ-দুঃখ ঘোচে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। যা বলছিলাম বলি।

সঙ্গীতে যশঃস্পৃহা দেখতে দেখতে আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। ব্যাসদেবের নির্ঘোষ 'ন জাতু কামঃ কামান্ উপভোগেন শাম্যতি— হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে' * মাঝে মাঝে আমার মনকে টুকলেও আমি আর গ্রাহ্যই করতাম না নিবৃত্তির নিষেধ—আরো এই জন্যে যে হবি তো হ—ঠিক এই সময়ে অবাঙালীদের মধ্যে আমার নাম হল গান্ধীজি, ভগবান দাস, যুগলকিশোর বিরলা, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শিউপ্রসাদ মিশ্র, আম্বালাল সারাভাই প্রমুখ খ্যাতনামাদের সমাদরে। এতে আমি আরো মেতে উঠে লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ কাশী আগ্রা গোয়ালিয়র আমেদাবাদ হিল্লি দিল্লি সর্বত্র গান গেয়ে দেখতে দেখতে সুর-ধনুর্ধর হ'য়ে উঠলাম। তিনি এই সময়ে মাঝে মাঝে

---

* নিরন্তর উপভোগে কবে হয় তৃপ্ত ভোগের বাসনা ?
আহুতি যতই দাও হুতাশনে তত জ্বলে ওঠে দাহনা।

দেখা হলেই আমাকে সস্নেহ পরিহাসে বলতেন: 'তোমার বাবাও গান গেয়েছেন দিলীপ, আমিও বড় কম গাইনি, কিন্তু তোমার মত দাপাদাপি ক'রে ভূভারত চ'ষে বেড়াই নি।' কিন্তু তিনি আমার আর একটি সাথী উচ্চাশার কথা উল্লেখ করেন নি—গান শেখার। যেখানে বড় ওস্তাদের খোঁজ পেয়েছি গিয়ে দিয়েছি ধর্না। কিন্তু হায়রে, খুব কম ওস্তাদই শেখাতেন মন দিয়ে—যদিও দক্ষিণা নিতেন খুশি হয়েই। সময়ে সময়ে বহু অর্থ ব্যয় করেছি, মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেই নমুনা হিসেবে: বরোদায় গেলাম ফৈয়স খাঁর কাছে গান শিখতে। কিন্তু প্রতিদিন তের টাকা ক'রে নিয়েও তিনি তিন দিনে একটির বেশি গান শেখাতে চান নি—যদিও আমার দিনে একটি ক'রে গান শেখার ক্ষমতা সত্যিই ছিল। কিন্তু সে-খেদ থাক—এখানে শুধু একটা ছক কেটে যাই—কার কার কাছে গান শিখেছিলাম।

একটা ভুল হয়ে গেছে—আমার একজন গানের গুরুর কথা বলা হয় নি যথাস্থানে। কিন্তু তাঁর কথা না বললে অকৃতজ্ঞতা হবে। তাই এ-অধ্যায় শেষ করার আগে তাঁর কথা একটু ব'লে নিই সংক্ষেপে।

তাঁর নাম শ্রীমন্মথনাথ দত্ত। ইতিপূর্বে এঁর নামোল্লেখ করেছি কিন্তু পরিচয় দেওয়া হয় নি। পরিচয়টা দেবার ম'ত। ইনি ছিলেন বিখ্যাত অন্ধ গায়ক শ্রীনিকুঞ্জমোহন দত্তের ছোট ভাই। শ্রীনিকুঞ্জ দত্তের কয়েকটি গান আমি গ্রামোফোন থেকে তুলেছিলাম: "সম্পদে বিপদে যেন শ্রীপদে ভুলো না," "হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে" ইত্যাদি। মন্মথবাবু দাদার মতন ওস্তাদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর চেয়েও সুকণ্ঠ ছিলেন। অপিচ পিতৃদেবের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত—পিতৃদেবের কাছ থেকে তাঁর একটি গান তিনি শিখেছিলেন ও গেয়ে নাম করেছিলেন: "মলয় আসিয়া ক'য়ে গেছে কানে—প্রিয়তম তুমি আসিবে।" এ-গানটি উত্তর জীবনে তাঁর কাছ থেকে

শিখে আমি আমার যৌবনে যত্র তত্র গাইতাম। সে-যুগে আমার শ্রেষ্ঠ গান কয়টির মধ্যে এ-গানটি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল ও লোকপ্রিয়তায় ছিল প্রায় "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো"-র প্রতিস্পর্ধী। মন্মথবাবু গান ধরতেন, কোমল গান্ধারকে মা করে ও তার সপ্তকে পঞ্চম ধৈবতে দাঁড়াতেন অবলীলাক্রমে। মর্দানা গলায় এত উচ্চ পর্দায় সুরের জৌলুষ সহজে বর্তায় না, কিন্তু মন্মথবাবু সবাইকেই মোহিত করতেন এই উচ্চ পর্দায় স্থায়ী হবার ব্রহ্মাস্ত্রে।

কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি লাভ করি বাংলা টপ্পা শিখে। ইতিপূর্বে সুরেনমামার কাছেও বাংলা রাগপ্রধান গান শিখেছিলাম—কিন্তু খেয়াল ঢঙেই বেশি, টপখেয়ালও শিখেছিলাম, যথা, নিধুবাবুর

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখতে এলাম আপনি,
দেখ বা না দেখ আমায় দেখে যাবো মুখানি।
মনে করি আসিব না, এ মুখ আর দেখাব না,
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে কেন তাহা না জানি।
এসেছি দিব না ব্যথা, বলিব না কোনো কথা,
আড়াল থেকে বারেক দেখে চ'লে যাব অমনি।

কিন্তু এ-গানটি নিধুবাবুর টপ্পা হ'লেও সুরেনমামা বিশুদ্ধ টপ্পার ঢঙে গাইতেন না, গাইতেন টপখেয়ালের ঢঙে। ১৯৫৯ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় একদিন অশীতিপর প্রাজ্ঞ শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতিতে—(তিনি সুরেনমামার গানের মহা ভক্ত ছিলেন) সর্বভুক সঙ্গীতোৎসাহী শার্ঙ্গদেবকে গেয়ে শুনিয়ে ছিলাম কী অপরূপ ঢঙে সুরেনমামা এ-ধরনের বাংলা গান গাইতেন খেয়াল ও টপ্পা মিশিয়ে।

কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা টপ্পা শিখেছিলাম আমি মাত্র দুজনের কাছে —বকুবাবু (দাশুরায়ের ননদিনী বোলো নগরে, কি নিধুবাবুর বিরহ জ্বালা সই আমি আর কত সই দিবানিশি প্রাণে প্রাণে ইত্যাদি)

ও পরে মন্মথবাবুর কাছে। মন্মথবাবু বিশুদ্ধ টপ্পাকে আরো প্রাণকাড়া ঢঙে গাইতেন বিশেষ ক'রে তাঁর একটি খাম্বাজ টপ্পায়। গানটি আমার ভারি মধুর লাগত ; মন্মথবাবু বলতেন : "দেখো, যদি প্রেমে প'ড়ে ঘা খাও তাহ'লে আরো মধুর লাগবে দিলীপ-এর তাৎপর্য বুঝে।" আমি লজ্জা পেতাম—(তখন আমি উদ্ভিন্ন কিশোর তো !) —কিন্তু তবু মানের দায়ে সদাপটেই বলতাম : "প্রেমে না পড়লেও বুঝি তাৎপর্য।" মন্মথবাবু হেসে বলতেন : "সে হয় না দিলীপ, কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে যাবার আগে রাধা বোঝেন নি অভিসারের বিষামৃত রস।" যাই হোক গানটি উদ্ধৃত করি তাহ'লে রসিক সুজন আঁচ পাবেন তর্কটা উঠেছিল কেন। গানটি কার বাঁধা জানি না, তবে মনে হয় মন্মথবাবু তাঁর দাদা শ্রীবরদা দত্তের নাম করেছিলেন। যাহোক গানটি এই (গানটি আমার এত প্রিয় ছিল যে একটি কথাও ভুলি নি)।

ভুলো না ভুলো না সরলা কিশোরী, ভুলো না সজল জলধর রূপে :
বরষে সে ধারা বজ্র বুকে ধরি'।
শ্যামা সুহাসিনী প্রসূনমালিনী দেখিলে লতিকা ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না :
চাহ যদি মূলে কালফণা তুলে দেখিবে ভুজঙ্গী বসি' বিষধরী।
নির্মল নিথর নেহারি' নদীতে ভেসো না বালিকা ভেসো না ভেসো না,
উঠিবে তুফান হারাইবে প্রাণ ভাঙিবে চুরিবে ডুবিবে গো তরী।

তিনি রজনীকান্তের কয়েকটি ভক্তি-সঙ্গীতও গাইতেন তাঁর স্বকীয় টপ্পা ঢঙে—যেগুলি আমি তাঁর কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলাম ও প্রায়ই গাইতাম। এ-গানগুলি আমার কাছে তখনও যেমন প্রিয় ছিল আজো তেমনি প্রিয়ই আছে, যথা : "যদি মরমে লুকায়ে রবে," "কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব," "আমায় পাগল করবে কবে" ইত্যাদি। মন্মথবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, কিন্তু বকুবাবুর প্রতি আমার পক্ষপাত সইতে পারতেন না। তাই একটি আসরে

বকুবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে অবলীলাক্রমে দারুণ চড়া পর্দায় গলাবাজিতে "ফাটিয়ে দিলাম" ব'লে জাঁক ক'রে আমার দিকে চেয়ে হেসে জনান্তিকে বলেছিলেন : "হুঁঃ! বকুবাবুর সাধ্য কি! গায়কদের মধ্যে রেষারেষির বহু দৃষ্টান্ত দেখেছি, কিন্তু কৃতি সুগায়কেরো অপরকে দাবিয়ে নিজের সুনাম বৃদ্ধি করবার এ-শ্রেণীর ছেলেমানুষি আমার বেশি চোখে পড়ে নি। এই শ্রেণীর "পাল্লা দেওয়ার" প্রবৃত্তিকে আমি দমন করতে শিখি প্রথম তাঁর এ-দুর্বলতাটি দেখে—তাই এ উদাহরণটি দিলাম।

এ-সূত্রে আমি মন্মথবাবুর গুণপনাকে খাটো করতে চাইছি না। কারণ আমি যে নিজেই ভুক্তভোগী, তাই জানি তো হাড়ে হাড়েই যে, কবি শিল্পী মাত্রেরই মধ্যে দুটো মানুষ পাশাপশি ঘর করে : স্রষ্টা ও উচ্চাশী। প্রথমটা শেখায় বড় হ'তে, কিন্তু দ্বিতীয়টা প্রায়ই উচ্চাশার মোহে প'ড়ে সৃষ্টির আনন্দকে গৌণ মনে ক'রে দলাদলি ও রেষারেষিকে মুখ্য ভেবে ব'সে পথ হারায়। আমি মন্মথবাবুর কাছ থেকে তাঁর অজ্ঞাতেই শিখেছিলাম সৃষ্টিকেই বড় মনে ক'রে সজাগ থাকতে—যেন উচ্চাশা বা দেখানোপনার মোহ পাঁকে না ফেলে। তাই মন্মথবাবু আমাকে যে এই শিক্ষাটি দিয়েছিলেন বকুবাবুকে অপদস্থ করার অপচেষ্টায়, এজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব চিরদিনই।

এবার আমার আর কয়েকটি গীতিগুরুর নাম ক'রে এ-অধ্যায়ের ইতি করি :

গয়ার সোনি, গোয়ালিয়রের হাফেজ আলি, মিরজের আবদুল করিম, বরোদার ফৈয়সখাঁ, মথুরার চন্দন চৌবে, উদয়পুরের জিয়াউদ্দিন—জাফরুদ্দিনের পুত্র, ইন্দোরের কেশবরাও আপ্তে, জয়পুরের ফুলজি ভট্ট, বম্বের বালগন্ধর্ব, দিল্লীর মজঃফর খাঁ, কাশীর মোতি বাঈ, এলাহাবাদের জানকী বাঈ, লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছন বাঈ। এ ছাড়া বরোদার রাইহানা তায়েবজির কাছেও শিখেছিলাম কয়েকটি রাগ তথা ভজন। হ্যাঁ, ইন্দোরের সারঙ্গিয়া বুন্দু খাঁর এবং লক্ষ্ণৌয়ের

রতনজনকরের কাছে অনেকগুলি গানেরই তালিম নিয়েছিলাম। লক্ষ্ণৌয়ে একটি স্মৃতি ভুলবার নয়। রতনজনকর ও আমি দিনের পর দিন যেতাম বিখ্যাত ঠুংরি সুরকার নবাব কদর পিয়ার পুত্র মুরুদ্ধের মির্জার কাছে। ঠুংরি শিখে আমি সবচেয়ে লাভ করি এই নবাব পুত্রটির তথা অচ্ছন বাঈয়ের কাছে। ঠুংরির শ্রেষ্ঠ ঘরানা চাল শিখি এঁর কাছে ও গায়কী বন্দেশ শিখি অচ্ছন বাঈয়ের কাছে। এই বর্ষীয়সী অপরূপা আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। তাঁর বয়স তখন বাহান্ন তিপান্ন, আমার সাতাশ আঠাশ। তিনি আমাকে বহু যত্ন নিয়ে শেখাতেন। তাঁর স্নেহ ও সদাশয়তার কথা আমি ভুলব না। আমি যে-গানই কেন-না ফরমাস করতাম, তিনি তৎক্ষণাৎ শোনাতেন অনেক সময়েই সারেঙ্গিওয়ালার সঙ্গতে। যে-গম্ভীরাত্মা অধ্যাপকটির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁকে বাঈ সাহেবার গান শুনিয়েছিলাম এইভাবেই—আসর ক'রে শোনাতে চাইলে তিনি ভয়ে ও-মুখোই হতেন না। একথা বাঈ সাহেবার কাছে বিদায় নেবার দিন বলি হাসতে হাসতে। কিন্তু বাঈ সাহেবা না হেসে হঠাৎ এমন এক সুর ধরলেন যে, আমি শুধু যে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই নয়—আমার মনের উপর তাঁর কথাগুলির ছাপ পড়েছিল গভীর-ভাবে। কেন—বললেই বোধগম্য হবে, কেননা তিনি দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা বলেননি, অতি মধুর মুসলমানি বাংলায় দিয়েছিলেন আমাকে সাবধান ক'রে। একটু নমুনা দেই তাঁর বাক্-ভঙ্গির:

"তোমাকে বাচ্চা, আমি নিজের লড়কার মতনই দেখেছি প্রথম থেকে। তোমার শক্ল্ দেখে আমার মায়া পড়েছিল। তোমার আওয়াজও আমার মন টেনেছিল—আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম যে, তুমি পারবে বাকায়দা শিখতে। কিন্তু একটি কথা তোমাকে বলি বাচ্চা, কিছু মনে করো না। তুমি যে-প্রফেসারটির ভয় পাওয়া নিয়ে মজাক্ করলে তাঁর ভয়ের বেশক্ কারণ ছিল জেনো। গান খোদার দান বটে বাচ্চা, কিন্তু গান শিখে কত নেক লড়কা যে জাহান্নমে গেছে

তুমি বা প্রফেসর না জানলেও আমি জানি তো। তাই তোমাকে বলি—গানে তালিম নাও—কিন্তু বাইজিদের কাছে নয়। আমি তোমার মা-র মতন, আমার কাছে এলে তোমার কোন আফৎ হবে না। কিন্তু জওয়ানীর পথ বড় পিছল বাচ্চা, আরো এইজন্যে যে, তোমার শুধু রুপিয়াই নেই, আছে সুরৎ আর মীঠী আওয়াজ। তুমি জানো না বাচ্চা, তবায়ফ-দের হালচাল। তাদের মধ্যে ভাল অওরৎ একেবারেই মেলে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার না হ'লে খুবসুরৎ অওরৎরা প্রায়ই মরদদের গিরফতার করে—খাস করকে তোমার মতন শরীফ নও-জোয়ানকে তারা নানা নাজ হাওভাওসে করতে চায় বেবশ—বুঝলে না? না না বাচ্চা, গুস্‌সা কোরো না। তাছাড়া তুমি জানো না তবায়ফরা মীঠী আওয়াজ শুনলে অখ্‌সর কী রকম দিওয়ানি বনে যায়.........."

ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, কথাগুলি একটু সাজিয়ে বললাম ইচ্ছে ক'রেই—খানিকটা তাঁর সঙ্গে আমার কী ধরনের কথা হত তার একটা নমুনা দিতেও বটে। আমাকে তিনি আরো অনেক কথা বলেছিলেন—শুনেওছিলাম কিছু কিছু, তিনি কত দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে দুটি স্মৃতি আমার কাছে চিরদিনই অবিস্মরণীয় থাকবে: এক, তিনি পঙ্কের মধ্যে বাস ক'রেও পঙ্কিল হননি, ফুটে উঠেছিলেন পঙ্কজিনীর মতনই; দুই, আমি তাঁর কাছে যে-স্নেহ পেয়েছিলাম, তার মধ্যে সত্যিই মাতৃস্নেহের আমেজে আমার মন ভরে উঠেছিল। তিনি বাইজি হয়ে কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন, আমি আজো জানি না, জানতেও চাইনি কোনোদিন। কারণ আমার মনে তিনি এমন একটি অমল গৌরবের স্থান অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন তাঁর মিষ্ট অভ্যর্থনায়, কিন্নরী-কণ্ঠে ও (সর্বোপরি) মাতৃস্নেহের সহজ মর্যাদায় যে তাঁর ঋণ আমি কোনোদিনই শুধতে পারব না—আরো এইজন্যে যে, তাঁর সাবধান-বাক্য আমার মনকে স্পর্শ করেছিল—এর পরে আমি আর কোনো তবায়ফের কাছেই

গানের তালিম নিইনি—এক বর্ষীয়সী মোতি বাঈয়ের কাছে ছাড়া।

[স্মৃতিচারণী—প্রথম স্তবক]

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, কল্যাণীয়েষু !

তোমার এগারই নভেম্বরের সুন্দর চিঠিটি পেলাম উনিশে—ভূপাল, দিল্লি, মুসুরি, হরিদ্বার, জয়পুর ও উদয়পুর ঘুরে পুণায় ফিরে। তাই প্রেরণা পেলাম আমাদের সফরের খবর দিয়ে একটি খোলা চিঠি লিখতে। অতএব অবহিত হও।

আমার আগেকার প্রায় সব বন্ধুদেরই চিঠি লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরেও তোমাকে এখনও মাঝে মাঝে বড় চিঠি লিখি, এর কারণ কি বলব? কারণ এই যে, তাঁরা আমার পত্র পেলে আজকাল বিব্রতই বোধ করেন, যেখানে তুমি এখনও আনন্দিতই হও। তাঁরা হন না, কারণ আমি চিঠি লিখলেই ধর্মের কথা পাড়ি, আর তাঁরা শুনতে চান হয় বিজ্ঞানের আকাশে গতিবৃদ্ধির কথা, না হয় গণতন্ত্রের মহিমার কথা, না হয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের অব্যর্থ মুক্তিবাণীর কথা—এদিকে আমি ধর্মকে জাতে-ঠেলা ক'রে চাই না এসব বুলিকে পূজার বেদীতে বসাতে। কেন জান? কারণ, আমার মনে হয় আজও যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজহিতৈষণার প্রচেষ্টা শুধু যে নিষ্ফল তাই নয়, তার পরিণামে "মহতী বিনষ্টি"। উদাহরণ প'ড়েই আছে। দেখ না, লাওৎসে-কনফুসিয়াস বুদ্ধকে বরখাস্ত ক'রে মাওৎসেটুং-চাউএনলাইয়ের কাছে কম্যুনিসমের দীক্ষা নিয়ে শান্তিপ্রিয় সভ্য চীন গড়িয়ে চলেছে কোন্ বর্বরতার "অসূর্য" রসাতলে। চীনকে দেখে আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত নয় কি?

কিন্তু আমার আগেকার বন্ধুদের সঙ্গে যে আজ আমার অমিলের ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠেছে তার আরো একটি কারণ আছে: তাঁরা আজ ক্লান্ত, এবং আমি এখনো—মোটের উপর—অক্লান্ত। এ-দুয়ের মধ্যে সৌহার্দের আদান-প্রদান সম্ভব কি? দাদুর একটি দোঁহার কথা মনে পড়ে—অনুবাদ এই:

প্রিয়তম জেগে, প্রিয়তমা ঘুমে অচেতন—বলো তবে
মিলনবাসরে কেমনে দুহুঁর প্রেমের আলাপ হবে?

তবে ভরসা এই যে, তোমার ক্লান্ত হবার এখনও দেরি আছে এবং ধর্মকে তুমি এখনও শ্রদ্ধা করো মনে মনে। তাই আজও তুমি আমার পত্রালাপে সাড়া দাও। আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় ভাগ তোমাকে উৎসর্গ করেছি এই লাভেরই অঙ্গীকারে—কিম্বা বলি তোমার এই সাড়াতেই সাড়া দিতে। কেমন? খুশি?

অবশ্য ধর্মের কথা তুমিও যে বেশিক্ষণ শুনতে চাইবে এমন দুরাশা আমি পোষণ করি না। তবে প্রসঙ্গান্তরের মাঝে মাঝে ধর্মের কথা এসে গেলে তোমার কানে শ্রুতিকটু না ঠেকতেও পারে এটুকু অন্ততঃ ভরসা পেতে চাই, কারণ, এখানে নির্ভরসা হ'লে অন্য বন্ধুদেরকে চিঠি লেখা যেভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি তোমাকে লেখাও সেই ভাবেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হব। কাজেই সাবধান!

বোলো না কাতরে: "নয়, ধর্মকথা আর। ভয়
পাই দাদা, অত্যধিক dose-এ।
কাব্য ও সমালোচনা সুমিষ্ট, অনুশোচনা
নাই সেথা গুরুপাক ভোজে।"

রোসো, তোমার একটি মন্তব্যের সম্বন্ধে কিছু ব'লে নিই আগে। তুমি লিখেছ: "সম্প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর কবিতা ও নাটকগুলি নতুন ক'রে পড়তে হয়েছে। যতই তাঁর লেখা পড়ছি ততই আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা ও গভীর সংবেদনশীলতার পরিচয় পেয়ে। ওঁর নাটকে এমন সব

সংলাপাংশ আছে যা প'ড়ে রীতিমত চমকে উঠতে হয় নাট্যকারের অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও হৃদয়ের বিশালতায়। হায়, এমন একজন প্রথমশ্রেণীর কবিকেও কিনা আমাদের দেশ তাঁর যথোচিত প্রাপ্য সম্মান দিতে দ্বিধা করেছে।"

তোমার এ-খেদে আমি পুরোপুরি সায় দেই। কারণ আজও দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ নাট্যকার বা হাসির গানের রচয়িতা ব'লেই তর্পিত হন—কবি ব'লে নন। এমন কি জনৈক শ্রদ্ধাবান্ গবেষকও তাঁর বৃহৎ দ্বিজেন্দ্রলাল গবেষণায় কোথাও সাহস ক'রে বলতে পারেন নি যে, তিনি সবার আগে ছিলেন কবি—স্বভাব কবি—যিনি বারো বৎসর বয়সেও লিখেছিলেন, "গগন-ভূষণ তুমি জনগণমনোহারী, কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী।" এবং মৃত্যুর আগের দিনেও রচনা করেছিলেন: "ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র।" হয়েছে কি জানো? তিনি হাসির গানে এক নব-পথের পথিকৃৎ হয়ে ও পরে দেশভক্তির নাটক লিখে যশস্বী হয়ে পড়ার দরুণ লোকে তাঁর নানা গানের ও কবিতার দীপ্তির দিকে তাকাবারও যেন সময় পায় নি। এই কারণেই আমি "দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়ন" প্রকাশ করেছি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব-সভার উপচার হিসেবে। কিন্তু এ-বইটি গত বৈশাখে প্রকাশ হওয়া সত্বেও কোন মাসিক পত্রিকায় এ-পর্যন্ত তার নাম পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি।

অবশ্য মাসিক পত্রিকাদির স্বীকৃতির সাহিত্যিক মূল্য বেশি নয়, মানি। কিন্তু তবু কিছু সাড়া ত জাগা উচিত ছিল কবিশেখর কালিদাস রায় ও তোমার-লেখা গভীরদর্শী সমালোচনার পরে। কি বলো তুমি?

যা হোক্ এ-বিষয়ে আমার কি মনে হয় একটু খুলে বলি—যদিও সংক্ষেপেই বলতে হবে নানা কারণে।

আমার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যুজ্জ্বল কবি-প্রতিভার

অপ্রতিবাদ্য কীর্তি যে আজও আমাদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি তার একটি কারণ—হাল-আমলের বিলিতি বাস্তববাদের মোহে প'ড়ে আমাদের খানিকটা দিগ্‌ভ্রম হয়েছে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের, ভক্তির, দেশাত্মবোধের আদর্শবাদে আমরা এ যুগে ঠিক মনোপ্রাণে সাড়া দিতে পারি না। অত্যধিক বস্তুবিচারী হওয়ার দরুণ আমরা এই মহাভ্রমে পড়েছি যে, পাখীর গগনবিহারের চেয়ে পঙ্ককীটের পঙ্কবিলাস বেশি জাজ্জ্বল্যমান সত্য—যেহেতু বেশি বাস্তব। মহাজনের মহত্ত্ব এখনও হয়ত আমাদের চোখে পড়ে সময়ে সময়ে, কিন্তু মহত্ত্ব নীচতার চেয়ে কম প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক ব'লে আমরা অপসিদ্ধান্ত ক'রে থাকি—গাণিতিক যুক্তির নিরিখে যে, যেহেতু এ জগতে নীচতা হীনতা ক্ষুদ্রতারই রেখা বেশি মেলে, সেহেতু ঔদার্য মহত্ত্ব দাক্ষিণ্য নামঞ্জুর। অর্থাৎ পরিসংখ্যানের (statistics) বিচারই হ'ল সত্য নির্ণয়ের অভ্রান্ত দিশারি।

কিন্তু আমাদের জীবনে যে-সব নিরানন্দ অতিবাস্তব সত্যের দেখা সবচেয়ে বেশি মেলে (সবচেয়ে বেশি দর্শকের সাক্ষ্যে), তাদের সত্যতা বেশি মঞ্জুর, আর যে-সব আনন্দময় সত্য চেতনার বিকাশের অপেক্ষা রাখে ব'লে কম দ্রষ্টার কাছে প্রত্যক্ষ হয়, সে-সব সত্য নামঞ্জুর —এ যুক্তি যদি গ্রাহ্য হয় তা হ'লে আমাদের জীবন কি ভাবে দেউলে হয়ে দাঁড়ায় বল ত? শেলি দুঃখ করেছিলেন: "আনন্দ! তোমার দেখা কত কম মেলে!" ("How rarely, rarely comest thou O spirit of delight!") বাস্তবিক, আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় কোন্ অনুভব আমাদের গোচর হয় দিনের পর দিন? তীব্র বেদনাও নয়, গভীর আনন্দও নয়। সচরাচর আমরা দিনগত পাপ-ক্ষয় ক'রে চলি একটা ধূসর স্বাদহীন ফ্যাকাশে অস্তিত্বের অনুভূতি চাখতে চাখতে। কিন্তু এক-এক সময় আসে যখন হঠাৎ প্রেম এসে উদয় হয়। সে বলে: "অয়মহং ভোঃ!" অমনি দুনিয়ার চেহারা যায় বদলে, আর আমরা প্রাত্যহিক ঔদাসীন্যের ধূসরতা কাটিয়ে উঠে

এক নব-উপলব্ধির রঙিন পুলকলোকে। অমনি আমাদের মন গান গেয়ে ওঠে, বলে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরে সুর মিলিয়ে (দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন—প্রথম চুম্বন—২০৯ পৃষ্ঠা) :

জীবনের সার—প্রথম মধুর যৌবনে ;
যৌবনসার—প্রথম মধুর প্রণয়ে ;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে ;
মাববের অতি সুখময়তম ক্ষণ-এ !
মানবের সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে,
একবার আসে সে-সুখ জীবনে মরণে ;
একবার দেখি মানবহৃদয় মন্দিরে
প্রেমের প্রতিমা—মৃত্যু দলিত-চরণে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এই মায়াবী ক্ষণমুহূর্তবাদী। তাই অঙ্গীকার করতে পেরেছিলেন। (ঐ—২৬০ পৃষ্ঠা) :

যদি পেয়েছি তোমায় কুটিরে আমার আশার অতীত গণি,
আমি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি।

প্রেমের অঞ্জন তিনি পেয়েছিলেন ব'লেই দেখতে পেয়েছিলেন যা প্রেমাঞ্জন বিনা দেখা যায় না : (ঐ—২৬৬ পৃষ্ঠা) :

আকাশে ভুবনে ব্যস্ত শুধুই তাহার রূপের আলো,
তারি পদযুগ হৃদে ধরে ব'লে ধরারে বেসেছি ভালো।
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি
ও-দু'টি আঁখির কিরণের তরে সকলই ভুলিতে পারি।

আমার "দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়নে" আমি তাঁর এই-জাতীয় মণিময় মুহূর্তের উজ্জ্বল এজাহারই সংকলিত করেছি—বিশেষ ক'রে তাঁর প্রেমের কবিতায়, দেশভক্তির গানে এবং ভক্তির কীর্তনে। কিন্তু প্রেমের এ-ধরণের সোনালি অনুভূতি কখনও কদাচিৎ রঙিয়ে ওঠে গড়পড়তা মানুষের ধূসর চেতনায়। তাই তারা অবাস্তব ব'লে ফেলে

দিতে চায় সেই প্রেমের বিদ্যুদ্দামকে যে প্রাণবন্ত মানুষ ছাড়া আর কারুর অনুভবের পরিধির মধ্যে আসে না। কাজেই তারা বলবেই ত: “এ হ’ল আদর্শবাদ, মাটিছাড়া—এ হয় না, হ’তে পারে না, আর হ’লেও এত অল্প লোকের জীবনে হয় এবং এত কম সময় থাকে যে এ কাজে আসে না, ধোপে টেঁকে না।”

এই মিথ্যে যুক্তির ফেরে প’ড়ে পথ হারানো সহজ ব’লেই আমরা যখন শুনি দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তির প্রদীপ্ত অনুভব ঝংকার:

সেথা গিয়াছেন তিনি সে-মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,
হেথা হয়ত ফিরিবে জিনিয়া সমর, হয়ত মরিয়া হইবে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির।
উঠ বীরজায়া! বাঁধো কুন্তল, মুছ এ-অশ্রুনীর।

তখন বলি: “ওঃ। পেট্রিয়টিস্‌ম্‌! এ-যুগে অচল। এ-যুগে চাই ইনটারন্যাশনালিস্‌ম্‌, কস্‌মোপলিটানিস্‌ম্‌, ধূমকেতু-স্পুটনিকিস্‌ম্‌, নীচমানুষকে মহাজনের সমান ব’লে ঘোষণা করার রিয়ালিস্‌ম্‌—এই সব।”

অন্য ভাষায়, যার যেখানে দরদ নেই, যার কোন গভীর অনুভবলোকে যাতায়াত নেই, সে সেখানে শুধু যে সে-স্পন্দনে সাড়া দিতে পারে না তাই নয়, কেউ সাড়া দিলেও হাসে। ভেবে দেখে না যে, জীবনের সমস্ত বড় অনুভূতিকে নাকচ করলে যা উদ্বৃত্ত থাকে তাতে ক’রে হয়ত মানুষের দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি হ’তে পারে, কিন্তু মনের প্রাণের আনন্দমন্দিরের সব দীপগুলিই যায় নিভে।

চীনের আক্রমণের পরে একথা যেন আমি নূতন ক’রে অনুভব করি দ্বিজেন্দ্রলালের নানা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে জেগে ওঠে আনন্দের গৌরবের জোয়ার, বলি—দেশভক্তির গুণগান করতে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। যে-দেশে জন্মেছি,

যার আলো-হাওয়া, ঐতিহ্য, সঙ্গীত, শিল্প, ভাষা—সর্বোপরি সাধুসন্তের চিরন্তন অমৃতবাণী আমাদের নানা জিজ্ঞাসার দিশা দিয়েছে, প্রাণের ক্ষুধায় খোরাক জুগিয়েছে, অন্তরের তৃষায় জলের সন্ধান দিয়েছে—সে-দেশমাতৃকাকে ভালবাসব, এই-ই ত চাই। তাই এবার উদয়পুরে গিয়েছিলাম যেন নব হৃৎস্পন্দনের তালে, আর ওরা সবাই বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতই সচকিত হয়েছিল শুনে:

মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, রঞ্জিত করি' কাগার-তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।

এ দেশভক্তি সত্যেরই নির্দেশ দেয়, মরীচিকার নয়। তবে একথা সত্য যে, যাদের দেশভক্তি বলে: "আমার দেশের লোকই রাজা হবার জন্যে জন্মেছে, আর সব দেশের লোক থাকবে আমাদের তাঁবেদার হয়ে, তাই আমার মতে, কি রুচিতে, যারা সায় দেবে না তাদের 'লিকুইডেট' করতেই হবে ট্যাঙ্ক, হ্যাণ্ডগ্রেনেড ও বিমান-বাহিনীর দাপটে—তারা দেশভক্ত নয়, মানুষের শত্রু। যেমন হিটলার, ষ্ট্যালিন, মাওৎসেটুং।"

কিন্তু কোনো আদর্শ বদহজম হয়ে দুর্গন্ধে পর্যবসিত হয় ব'লে সে আদর্শের যথাবিধি পরিপাকও পুষ্টিকর নয়, এ কথা ত সত্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের চক্ষুষ্মান্ দেশভক্তি মনের প্রাণের স্বাস্থ্যের অন্তরায় নয়। তিনি বলেন নি কোন দিনই যে, আমরাই ভগবানের একমাত্র মানসপুত্র, আর সবই নারকী। বলেছেন—বিশেষ ক'রে তাঁর মেবার পতনে—যে, মানুষ ধাপে ধাপে ওঠে মুক্তির শিখরে—আত্মপ্রীতি থেকে স্বজনপ্রীতিতে, স্বজনপ্রীতি থেকে দেশভক্তিতে, দেশভক্তি থেকে বিশ্বপ্রেমে—শেষে ধর্মে। গেয়েছেন:

ঘুচাতে চাস যদি রে এই হতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।

ধর্ম যেথা সেদিকে থাক্ ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্, আবার তোরা মানুষ হ।

এ চরণগুলি গাইতে আজও আমার চোখে জল আসে, বুকে আনন্দ ছায়, রোমে শিহরণ জাগে। মনে হয় মহাপ্রাণদের মধ্যেই বা ক'জন কবি পেরেছেন এহেন মহান্ আদর্শকে এমন উদ্দীপক ভাব ভাষা ও ছন্দের গাঢ় বন্ধে এমন চিরস্মরণীয় স্পন্দনে পরিবেশন করতে? এ-শ্রেণীর অপূর্ব কাব্যে ঘুমন্ত দেশকে তিনি কতখানি জাগিয়েছিলেন স্বদেশী যুগে—ভাবো ত!

আজ আমাদের দেশে একদিক্ থেকে নাস্তিক পরস্বাপহারীরা হানা দিয়েছে, অন্যদিকে দেশকে রক্ষা করতে ছুটেছে একদল আদর্শবাদী যুবক। সেদিন ইন্দিরার বড় ছেলে অনিল মালহোত্রা কলকাতা থেকে লিখেছে সে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্যে নাম লিখিয়েছে। খুব ভাল চাকরি পেয়েছে সে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কে। তার বিবাহ স্থির, এক পরমা সুন্দরীর সঙ্গে। এহেন যুবক মোটা মাইনে ও সুলভ্য ভোগের লোভ ছেড়ে, যখন দেশের জন্য প্রাণ দিতে ছোটে তখন—বলো ত আমাকে—তার প্রাণের মূলে প্রেরণা যোগায় কোন্ ভাব—মহৎ দেশভক্তি ছাড়া? আর দেশভক্তির আদর্শ না থাকলে দেশের স্বাধীনতার রক্ষকই বা থাকবে কে? দ্বিজেন্দ্রলাল চেয়েছিলেন দেশের এই বরেণ্য স্বাধীনতা, কিন্তু সে কি দেশের ছোট-আমিকে বড় করতে, না বড়-আমিকে জাগিয়ে তুলতে? ভারতকে পুণ্যভূমি জন্মভূমি ব'লে বরণ করেছিলেন ব'লেই না তিনি গাইতে পেরেছিলেন মহাপ্রয়াণের ঠিক আগেই—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৩ সালে:

ভারত আমার ভারত আমার!
সকল মহিমা হউক খর্ব।
দুঃখ কী যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব?…

চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিবে নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

এই বিশ্বপ্রেমের আদর্শ যাদের কাছে প্রাণস্পন্দনে স্পন্দমান কেবল তারাই পারে বড়র জন্য ছোটকে ছাড়তে—তারাই পারে দেশকে বড় করতে। তাই ইন্দিরা অনিলের পত্র পেয়ে বলছিল সেদিন: "যদি দেশের জন্যে সে সত্যিই সুদূর হিমালয়ে লাডকে প্রাণ দেয় আমি দুঃখ করব না, বলব এর দরকার ছিল।" আমি সেদিন মন্দিরে সাধক-সাধিকাদের বলছিলাম: "অনিলের আদর্শবাদে আমরা গর্ববোধ করেছি আরও এই জন্য যে, সামনে যার পরম ভোগের রাস্তা খোলা, সে যখন ভোগ ছেড়ে কোনো বড় ডাকে সাড়া দিয়ে ছোটে আত্মোৎসর্গ করতে, তখন তাকে বলতেই হবে ধন্য।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নানা গানে ও নাটকে এই দেশভক্তির ধন্য আদর্শ প্রাণোন্মাদী ভাষায় পেশ করেছেন ব'লেই এ সূত্রে আমি অনিলের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিলাম। উদয়পুর ও জয়পুরে এবার দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদের মহিমা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছি, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু আর না। তাঁর কাব্য ও বহুমুখী প্রতিভার অঙ্গীকার আর পাঁচজনের মুখে ঝঙ্কৃত হওয়াই ভাল। আমি বেশি বললে ক্রিটিকরা বলবেন (যেমন একজন সম্প্রতি বলেছেন): "ক্ষমণীয়।" তাই তোমরাই বলো—সেই ভালো। কারণ, একথা ত অস্বীকার করতে পারি না যে, আমি স্বভাবতঃ পিতৃদেবের রচনার পক্ষপাতী। কেবল এই সূত্রে গ্যেটের একটি সাফাই মনে পড়ে: Aufrichtig zu sein kann ich ver-sprechen, unparteiisch zu sein aber nicht—অর্থাৎ, আমি কথা দিতে পারি যে আমি

সত্যনিষ্ঠ হব, কিন্তু নিরপেক্ষ হবই হব—এমন অঙ্গীকার করি কোন্ মুখে ?

* * *

একথার মর্ম যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম ভূপালে আলাউদ্দীন খাঁকে দেখে। বহুদিন থেকেই আমি এই মানুষটির নানা গুণের পক্ষপাতী ব'লে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা আমার আরও বেশী ভাল লাগে। ত্রিশ বৎসর আগে আমার ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকায় আমি এঁকে আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতস্রষ্টা (composer of instrumental music) নাম দিয়েছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, ইনিই সর্বপ্রথম আমাদের দেশে "প্রথম শ্রেণীর" অর্কেষ্ট্রা গ'ড়ে তোলেন, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন পরে তিমিরবরণ, শিরালি মেনকার যান্ত্রিকেরা—আরও অনেকে। বস্তুতঃ অর্কেষ্ট্রা জগতে ইনি তেমনিই পথিকৃৎ যেমন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর কাব্যজগতে। ইউরোপীয় প্রাণশক্তি ও ভারতীয় রাগ-মহিমা—এ দু'য়ের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হয়েছে এঁর অর্কেষ্ট্রায়।

তাই ভূপাল থেকে যখন সরকারী নিমন্ত্রণ পেলাম আলাউদ্দীন খাঁর শতবার্ষিকী সংবর্ধনায় যোগ দিয়ে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হবে—তখন এক কথায়ই রাজী হয়েছিলাম।

অথ বেচারি পুনর্ভ্রাম্যমাণ ভূপাল রওনা হ'ল ৫ই অক্টোবর। আর ভ্রমণ করব না—এবার জপতপে মন দেব বেশি ক'রে—বললে হবে কি ? ভবিতব্যের কি কাটান্ আছে ভাই ? ভাগবতকার লিখেছেন—ব্রহ্মা নারদকে শাপ দিয়েছিলেন, তুমি ভবঘুরে হবে। আমি নারদের মতন অতবড় গায়ক নিশ্চয়ই নই, কিন্তু অন্তরীক্ষে না হোক্ এ-ভবার্ণবে আমাকে তাঁর চেয়েও বেশি ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আকৈশোর। তবে এক সময়ে ঘুরে বেড়াতাম এ ও তা কত কি টানে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "All sides he (man) sees and

turns to every call," আর আজকাল কেউ না ডাকলে যাই না —এই তফাৎ। যাকৃগে। ভ্রমণের আদিপর্ব সুরু করি।

ভূপালে বহুদিন পূর্বে গিয়েছিলাম ওস্তাদী গান শুনতে—(সে খবর লিখেছি বিশদ ক'রেই আমার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থে, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বোধহয় শীঘ্রই বেরুবে, প'ড়ো)—এবার পাকে-চক্রে যেতে হ'ল—ওস্তাদ গুণ-কীর্তনার্থে। History repeats itself—বলে না?

বলেছি, আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে আমার আলাপ বহুদিনের। তাঁর বাজনা শেষ শুনেছিলাম আঠারো বছর আগে কলকাতায়। তিনি ও তাঁর জামাতা রবিশঙ্কর যুগলে বাজিয়েছিলেন—কী অপূর্ব যে!

তার পর রবিশঙ্কর একবার ডাকেন দিল্লীতে তাঁর বাসায় ও সেতার বাজিয়ে আমাদের পুলকিত করেন। এ-যুগে সেতারে তাঁর চেয়ে বড় গুণী আমি শুনি নি। তবে সে-যুগে আমার আরও বেশী ভালো লেগেছিল মনোহরলালের সুরবাহার—লক্ষ্ণৌয়ে ১৯২৪ কি ২৫ সালে। "ভ্রাম্যমাণে" তাঁর কথা লিখেছিলাম। সেতারে রবিশঙ্কর বহুর মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হয়ে জলদ করেন দেখতে দেখতে—কিন্তু তাতে ক'রে আলাপ ও মিড় মারা পড়ে। যাই হোক্ তবু বলতেই হবে যে, রবিশঙ্কর একজন প্রথম শ্রেণীর সেতারী। ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছেন তিনি নানা দেশে নাম ক'রে। এজন্যে তাঁকে সাধুবাদ না দেবে কে?

ভূপালে পৌঁছলাম ৬ই অক্টোবর সকালে। সরকারী সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত কান্তি চৌধুরী ও ভাষার ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী ষ্টেশনে এসে আমাদের সপ্তরথীকে অভিনন্দন করলেন: ইন্দিরা, শ্রীকান্ত (ওরফে ব্রিগেডিয়ার থাডানি), প্রেমল (ইন্দিরার কনিষ্ঠ পুত্র,) প্রশান্ত (ওরফে ডন ট্যাস্কে, শিকাগো), একান্ত (ওরফে রিচার্ড মিলার, নিউইয়র্ক), শ্রীপ্রহ্লাদ যোশী (ইন্দিরার গীতিশিক্ষক, সত্যিকার ওস্তাদ তথা গুণী) ও আমি।

আমাদের ঠাঁই হ'ল সরকারী সার্কিট হাউসে। খুব আরামেই ছিলাম আমরা। আলাপও হ'ল দেখতে দেখতে যে কত লেখকের সঙ্গে! উল্লাসে মন যেন গুনগুনিয়ে উঠল: "শুষ্ক তরু মঞ্জরিল"। ষাট পেরিয়েও যৌবনের উল্লাসে হারিয়ে-যাওয়া স্বাদ ফিরে পাওয়া—এ কি চাট্টিখানি কথা, নারায়ণ?

কান্তি চৌধুরীর মহাশয়ের ওখানে আলাউদ্দিন খাঁ উঠেছেন শুনেই ছুটলাম তাঁর দর্শন পেতে। আমাদের দেখেই খাঁ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন ও তার পরেই আমার ও ইন্দিরার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। মানুষটি সত্যি ধার্মিক তথা ধর্মভীরু, তা ছাড়া মনে-প্রাণে হিন্দু। নৈলে কি স্ত্রীর নাম রাখেন মদনমঞ্জরী, দুই মেয়ের নাম সরোজিনী ও অন্নপূর্ণা? অতীতে তাঁর মুখে আমি অনেকবারই কালীকীর্তন শুনেছি—ঈষৎ পূর্ববঙ্গীয় ভঙ্গিমায় গাইতেন তিনি। পূর্ববঙ্গেই জন্ম ত। ত্রিপুরায় না?

বড় সরল উদার মানুষটি। প্রথম থেকেই তাঁকে ভালোবেসেছি—তার উপর এত বড় প্রতিভা, প্রেমে পড়তেও যে গর্ব! বিলেতে বহু সঙ্গীতজ্ঞই অভিভূত হয়েছেন তাঁর আশ্চর্য বাজনা শুনে। ভারতবর্ষে এত জলদ বাজাতে পারে, খুব কম গুণীই। কেবল বেচারী তবলচীই পড়ে বিপদে—কিন্তু সেইখানে আমোদ ও উত্তেজনাও ত জমে কম নয়! ঠিক সাঙ্গীতিক রস নয়—মিশেল: বুকে দুরু দুরু কাঁপন জাগে: কে হারে কে হারে—তবলিয়া না সরোদিয়া! ব্যাপারটা কি, তোমার অজানা নেই। তাই প্রসঙ্গান্তরে আসি। বলি আগে তাঁর ভক্তিভাবের কথাই। নিরুপায় নারায়ণ! একটু শুনতে হবেই তাঁর ধর্মের কাহিনী, ভাই।

আমার শৈশবে দেখেছিলাম কতবারই—মুসলমান কৃষাণদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে দুর্গাপূজার সময়ে সানন্দে প্রতিমা দেখতে আসত তাই নয়। প্রতিমার সামনে গড় হয়ে প্রণাম করতেও তাদের বাধত না। দিন-দুনিয়ার হিন্দু সাধুসন্ত মহাত্মাদের যাঁরা পৌত্তলিক

বা মিডিভাল ব'লে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছেন তাঁদের উপহাসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সহজ, কঠিন শুধু এই আক্ষেপটিকে ডিশমিশ করা যে, মূর্তিপূজার মাধ্যমে যে ভক্তি সহজেই হিন্দু-মুসলমানকে সৌভ্রাত্রের রাখী বন্ধনে বাঁধত সে-ভক্তিকে হারিয়ে আমাদের জাতীয় জীবন আজ কী.গভীর ভাবেই না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে! কিন্তু সে যাক্, বলি, যা বলতে হৃদয় এখনও আর্দ্র হয়ে ওঠে: আমার একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা—ভক্তিরস কী ভাবে বহুদূরের তথা ভিন্নধর্মী মানুষকেও কাছে টেনে আনে তেমনি সহজে, যেমন চুম্বক আনে লোহাকে।

সেবার আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম—১৯৩৮ সালে—অক্টোবর মাসে। কাশ্মীরে আমার গানের ছাত্রী প্রতিভাময়ী ৺উমা বসুকে গণ্ডোলায় গান শেখাতাম দিনের পর দিন। ফিরে এলাম কাশ্মীর থেকে একাই। একটি ছোট শহরে জিরুতে নামলাম বাংলার উপান্তে। মন খারাপ ছিল আমার কন্যাপমা কিন্নরকণ্ঠী স্নেহপাত্রীকে ছেড়ে এসে। এমন অপরূপ ভঙ্গিতে আমার গান অতীতে কেউ কখনও গায় নি—মনে প্রশ্ন উঠছিল কেবলই—ভবিষ্যতে আর কেউ কখনও গাইবে কি না? আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু বলেছিলেন একবার, যে যেহেতু উমার মত কণ্ঠ ও প্রতিভা বিনা দৈলিপী গানের প্রচার সম্ভব নয়, সেহেতু দৈলিপী গানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একথা ভাবি আর মন খারাপ হয়ে যায়। এত সুন্দর সুন্দর গান বাঁধলাম, সুর বসালাম—কেউ কখনও গাইবে না? স্বীকৃতির লোভ যে মরিয়া না মরে রাম, জান ত হাড়ে হাড়ে! গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ—ফলাকাঙ্ক্ষাকে বরখাস্ত ক'রে কর্ম ক'রে যাওয়া—মুখে বলা সহজ, কাজে করতেই যা প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তাই বিষণ্ন মনে গ্রামটির ক্ষীণস্রোতা নদীতীরে এক গাছের তলায় ব'সে পুরবী সুরে গান বাঁধছি এমন সময়ে দেখা এক মুসলমান কৃষাণের সঙ্গে। কাহিনীটি লিখেছিলাম সেদিনই একটি কবিতায়—

গাছের তলায় গান বাঁধছি উদাস মনে—
এমন সময় কাছে
বসল এসে মুসলমান এক কৃষাণ।
বিরাগ জাগে মনের মাঝে।
চেয়ে দেখি—সাদা দাড়ি, মাথারও চুল
সবই পাকা তার,
অর্ধনগ্ন দেহখানি শীর্ণ, মুখে ভাঙা দাঁতের সার।
ছোট্ট বুকের হাড়গুলি যায় গোনা,
ঠোঁটে কোমল হাসির রেশ,
দৃষ্টি নরম। অনুতাপে শুধাই—"মিঞা!
এই কি তোমার দেশ?"
—"হ্যাঁ, স্বামীজী। কাশিম আলি—ডাকে সবাই।"
—"কি চাও?"—"কি চাই? মানে?"
এম্‌নি এসে কাছে-বসার ভাষ্য—
কিছু চাওয়া, সে কি জানে?
কয় না কথা···অবাক্‌ হয়ে চেয়ে থাকে,
পরে বলে—"আজ
মুখ দেখে কার উঠেছিলাম।
পেলাম দেখা সাধুর, মহারাজ।"
কথায় কথায় উঠল আলাপ জমে,
মাথার উপর ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কী অপরূপ সঙ্গৎ ওঠে বেজে
তালে তালে।
"কৃষাণ আমি, গরিব। ভিটে তিন পুরুষের।
সাতটি ছেলে ছিল—
একটি শুধু রইল, বাকি দিয়ে আল্লা
আবার কেড়ে নিল।"

সামলে চোখের জল, বলে সে—
"শক্ত মাটি, দিই না চাটাই পেতে ?"
—"দরকার নেই ভাই, বল না কি বলছিলে ?"
—"চান কি তামাক খেতে ?"
—"ওসব নেশা সে করে কি মশগুল যে
গানের নেশায় ?"—"গান ?
একটি শোনান, লক্ষ্মীটি গাই আমিও, ঠাকুর।
একটি গান শোনান।"
গাইলাম আমি রামপ্রসাদী।
ফুটল মুখে তার কি মিষ্টি হাসি।
গাইল সেও বাউল আমার অনুরোধে—
সাঁই পীর উচ্ছ্বাসী।

চিকিয়ে ওঠে জল চোখে তার,
বলল কাশিম আলি : "কেমন ক'রে
করব আমি হায় রে খাতির ? গরিব আমি—
কিছুই যে নেই ঘরে।
আপনি অতিথ দেব্‌তা।" আমি বলি—
"যদি চাও খাওয়াতে—তবে
দাও এক গেলাস জল !" সে অবাক্‌ হয়ে তাকায়
হিন্দু সাধু কবে
মুসলমানের জল খেতে চায় ?
এক দৌড়ে কুঁড়েয় গেল চ'লে।
মনটা আমার ওঠে ভরে....
মেঘলা ব্যথা গেছে কখন গ'লে।
"যার নেই ঘর তার নেই পর—"
গুনগুনিয়ে গাইছি, হঠাৎ দেখি

হাসিমুখে সাম্‌নে কৃষাণ! হাতে লোটা।
বললাম আমি—"এ কি?
দুধ এ যে ভাই?"—"কোথায়? জোলো মিছরি
পানা, এক ফোঁটা দুধ, খান
এক চুমুকে, রুটি ও গুড় দিতে নারি—
আমরা মুসলমান,
তাই বাসি ভয়। কেবল মনে হয়—
দেখুন এ অন্ন ত নয়, খেয়ে
নিন স্বামীজী। ভুখা আছেন নিশ্চয়ই।"
সে স্নিগ্ধ হাসে চেয়ে।

মনে হ'ল সুধার পাত্র! এমন সরল দরদভরা প্রাণ!
কতদিনের চেনা যেন! জাত, শিক্ষা, কেতাব,
খেতাব, মান—
সব ভেসে যায়—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু
স্বামীজী আর চাষা!
শুভদৃষ্টি কে ঘটালো? না, নয় মুখের,
এ যে বুকের ভাষা!
"আজ উঠি ভাই?"—"যাবেন কতদূর স্বামীজী?
ধুপ যে বেজায় কড়া,
তালপাতার এই ছাতাটি নিন।"—"না, না,
আমার মাথায় টুপি পরা।
দুধ এ তোমার নয় ত—এ যে চাঙ্গা-করা
সর্বৎ সুধার।
শান্তি যেন পাও ভাই! না দেখা যদি হয়
আমাদের আর—

তোমার জন্যে করব আমি প্রার্থনা।"
সে ধরা গলায় বলল—"ঠাকুর, করি
প্রণাম—না না প্রণাম বৈকি।
যে সাধু সেই পীর, আল্লা, হরি।
কেবল ঠাকুর, একটি আর্জি—
একটি ছবি চাই আপনার আমি।"
—"পাঠিয়ে দেব আজই—না, না,
আমারও ত চাই দেওয়া সেলামি।"

সোনার আলোর হরিণ ছোটে
মেঘের ধূসর বনে রঙিন রাগে···
ছোট্ট নদী বাজিয়ে নূপুর চলে উধাও····
পথের প্রতি বাঁকে
লতা নাচে, পাতা দোলে, ফুল হাসে ঐ···
এ কি? কোথায় ব্যথা?
কার সে ছোঁয়ায় ছায়ার মতই মিলিয়ে গেছে।···
নিটোল কৃতজ্ঞতা
বেজে ওঠে বুকের বীণায়। ··একলা কে নয়?
তবু পথের ধারে
এমনি দরদ ভরা প্রাণের প্রদীপ জ্বালে
কে সে অন্ধকারে?

ঘটনাটি আমার কাছে অঘটনের মত ঠেকেছিল ব'লেই আমি সেদিন এ কবিতাটি লিখে রেখেছিলাম বাড়ী ফিরেই। কোথায় কে এক নাম-না-জানা অশিক্ষিত মুসলমান কৃষাণ—আর কোথায় আমি যোগদীক্ষিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কবি, গায়ক, সুরকার···অথচ মুহূর্তে কি ঘ'টে গেল, এক মুহূর্তে—বল ত! সে বলল আমাকে তার জীবনের

কত সুখদুঃখের কথা—তার পরে প্রণাম করা, আদর যত্ন করা, এ মনোবৃত্তি আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে কমলেও অশিক্ষিতদের মধ্যে কমে নি আজও—কি হিন্দু, কি মুসলমান। তাই ত আলাউদ্দীন খাঁ যে আমাকে ও ইন্দিরাকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন, সে প্রণাম তো আমাদের উদ্দিষ্ট নয়, সে প্রণাম প্রতীকেরই প্রাপ্য—যার নাম সাধু। বললাম: "খাঁ সাহেব! আমাকে মনে আছে, না ভুলে গেছেন?" পরিষ্কার বাঙাল বাংলায় বললেন তিনি হেসে: "ভুলব কেন? আমি কি পশু?" আমি বললাম: "আপনার কাছে শিখেছিলাম আপনারই একটি নবরচিত রাগ—'হেমন্ত'—মনে পড়ে?" খাঁ সাহেব হেসে বললেন: "না। ভুলে গেছি। এত বয়সে কি আর মনে থাকে সব কথা?" আমি বললাম: "আমার কাছে কতবার শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন মনে আছে, না তাও ভুলে গেছেন?" খাঁ সাহেব স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "মা-র নাম কি ভোলা যায়?"—ব'লেই গুন গুন ক'রে ধরলেন রামপ্রসাদী:

"মা আমায় ঘুরাবি কত? চোখবাঁধা বলদের মত?"

আমি বললাম: আপনার আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। কারণ আপনার কাছে শুধু যে হেমন্ত রাগ শিখেছি তাই নয়—আরও কত কি শিখেছি ছন্দ তাল মীড় গমক সুরের প্রাণের কথা। কত আনন্দই যে পেয়েছি আপনার গানে! লক্ষ্ণৌয়ে একদিন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, অতুলপ্রসাদ ও আমি তিনজনে কি মাথাই না নেড়েছিলাম স্বরোদে আপনার একটি পুরিয়া আলাপ শুনে। একথা আজও মনে আছে আরও এইজন্যে যে, আপনার পুরিয়া আলাপ শুনবার আগে আমি বলতাম—পুরিয়া রাগ পূরবীর মতন মধুর নয়। আপনি আমার মত বদলিয়ে দিয়েছিলেন ঝাড়া একঘণ্টা ধ'রে পুরিয়া রাগের সুধাবৃষ্টি ক'রে।"

খাঁ সাহেব বললেন: "আপনি গুণী, তাই আমাদের সামান্য বাজনারও এত কদর করেন। কারণ আমাদের গানবাজনা এমন কি

বলুন? আমরা গাই মানুষের জন্যে—আপনার ভজন দেবতার জন্যে....” ইত্যাদি।

ওখানে তাঁর নাতি আশীষ খাঁর স্বরোদ শুনেও মুগ্ধ হ'লাম। খাঁ সাহেব তাঁর ঘাড় ধ'রে বললেন: “প্রণাম কর্‌রে সাধুজীকে—তোর বাজনা এঁর ভালো লেগেছে।” ব'লেই আমাকে: “আপনি একে আশীর্বাদ করুন।”

এমনি শ্রদ্ধাভক্তির মাখন দিয়ে গড়া মনটি খাঁ সাহেবের। যেমন উদার তেমনি স্নেহশীল। মনে হ'ল—শুধু এই একটি মানুষের দেখা পেতেই ভূপালে আসা সার্থক।

ভূপালে শরণরাণী মাথুর নামে খাঁ সাহেবের এক শিষ্যার স্বরোদ শুনে আরও চমকে গেলাম। ভালো সেতার ও বীণা বাজানো মেয়েদের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু স্বরোদে প্রচুর দেহশক্তি চাই। তাই শরণরাণী যখন শুরু করলেন, তখন ভাবলাম: কীই বা এমন বাজাবে স্বরোদ! মেয়েছেলে তো! কিন্তু ভদ্রমহিলা শুধু যে একটানা দেড় ঘণ্টা বাজালেন তাই নয়—কি অপরূপ রাগালাপ ও ঝংকারের ঝর্ণাই যে বইয়ে দিলেন কি বলব! মনে হ'ল সঙ্গীত জগতে একটি নব তারকার অভ্যুদয় হয়েছে—বটে। কেবল দুঃখ হ'ল ভাবতে—হয়ত এঁকে সিনেমায় বহাল করবে ডিরেক্টররা মোটা মাইনে দিয়ে। ফলে টাকা হবে অবশ্য, কিন্তু সঙ্গীতের হবেই হবে ভরাডুবি। প্রার্থনা করি—যেন শরণরাণী টাকার চেয়ে সঙ্গীতকেই বেশী বড় মনে করতে পারেন—তাঁর সঙ্গীতপ্রীতিই যেন হয় তাঁর রক্ষাকবচ।

ভূপালে রবীন্দ্রসদনে প্রথম দিন আমার গান করবার কথা ছিল রবীন্দ্র ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে। লোকে টিকিট ক'রে এসেছিল সেই জন্যেই হয়ত—বলতে পারি না। যেটা বলতে পারি সেটা এই যে, প্রথম দিনের আসরে রবীন্দ্রভবনের উদ্বোধন হোক বা না হোক, হয়েছিল কেবল আমারই গান—আর কারুর নয়।

গাইলাম প্রথমে আমরা দুজনে মিলে "ন তাতো ন মাতা"—শঙ্করাচার্যের ভবানী স্তোত্র। তার পর ইন্দিরাতে আমাতে গাইলাম একটি মীরাভজন। সবশেষে আরও একটি মীরাভজন। প্রায় দেড়ঘণ্টা গান হ'ল। পরদিন মধ্যপ্রদেশ ক্রণিকল্ লিখল: "Sri Dilip Kumar sang devotional songs for about ninety minutes. Though 66 years of age, his voice still has the quality of enthralling the audience...." ইত্যাদি।

কিন্তু এ প্রশংসায় মন খুশী হলেও তেমন ভ'রে ওঠে নি যেমন উঠেছিল পরদিন খাঁ সাহেবের সামনে রবীন্দ্রভবনে গান গেয়ে। তাঁকে ধরাধরি ক'রে প্রেক্ষাগৃহে এনে মঞ্চে বসানো হ'ল। হুমায়ুন কবীর, রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী প্রভৃতি সবাই তাঁর গুণগান করার পরে আমি বললাম প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধ'রে খাঁ সাহেবের সঙ্গীত প্রতিভার কথা। শেষে বললাম: "খাঁ সাহেবের কাছে বহু বৎসর আগে তাঁরই রচিত একটি নতুন রাগ শিখেছিলাম, নাম—'হেমন্ত'। সেই থেকে জয়দেবের বিখ্যাত 'চন্দন-চর্চিত-নীল-কলেবর' পদাবলীটি এই রাগেই গেয়ে আসছি সর্বত্র। বিখ্যাত কথাকলি নট গোপীনাথ আমার এই গানের সঙ্গে শুধু নিজে নাচা নয়, ইন্দিরাকে নাচতে শিখিয়েছিলেন।" ...ইত্যাদি।

ব'লে গাইলাম এ গানটি এবং পিতৃদেবের "আমার জন্মভূমি"—বাংলায়, হিন্দিতে, ইংরাজী ও সংস্কৃতে। আলাউদ্দীন খাঁ শুনতে শুনতে এত চোখের জল ফেলেছিলেন যে পরদিন ভূপালের একাধিক সংবাদপত্র লিখেছিল যে, দিলীপকুমারের গান শুনে খাঁ সাহেবের গাল বেয়ে অবিশ্রান্ত চোখের জল ঝরেছিল। আমার গানের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হ'তে পারে?

কিন্তু ভূপালে সবচেয়ে ভাল লাগল কাকে শুনবে?—এক ভক্ত-মণ্ডলীকে। এরা বিশ-পঁচিশ জন নরনারী এসে আমাকে বলল যে রবীন্দ্রভবনে টিকিট ক'রে আমার গান শুনতে যাবার সঙ্গতি তাদের

নেই। অথচ ইন্দিরা দেবীর ভজনাবলী প'ড়ে তারা মুগ্ধ। রবীন্দ্রভবনে পরপর দু'দিন তারস্বরে গেয়ে দেহ ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও এদের ভক্তি দেখে মন ব'লে উঠল: "কুছ পরোয়া নেই, আমি চাঙ্গা আছি।" ফের ধরলাম মীরাভজন। গান শুনে তাদের সকলেরই চোখে জল—আমারও। একজনের প্রায় দশা হবার উপক্রম। তার পর তাদের কুটিরে গেলাম। দরিদ্রের কুটির—কিন্তু পাড়ার সবাই এল সে যে কী আগ্রহ নিয়ে!—আমার ও ইন্দিরার কপালে দিল তিলক, বাজাল শাঁখ, গাইল নামকীর্তন, ছড়ালো গঙ্গাজল—কী না করল তারা? আনন্দ যেন ধ'রে রাখতে পারে না দরিদ্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম: "ঠাকুর! কাল দেখালে শিক্ষিত সমাজের সভ্য, সংযত অভিনন্দন, আজ পেলাম ভক্তদের বরণমালা। এ স্বতঃস্ফূর্ত আত্মহারা অভিনন্দনের কাছে কালকের সম্মান দাঁড়ায় কি?"

পরদিন ৮ই সন্ধ্যায় রওনা হলাম দিল্লী। ৯ই সন্ধ্যায় গাইলাম দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট লাইব্রেরি হ'লে। প্রায় সাত-আটশো শ্রোতা এসেছিল টিকিট করে ৫৲, ৩৲ ও ২৲। স্বামী স্বাহানন্দ লিখেছিলেন: ভিড় সামলানোর জন্যেই টিকিট করতে হবে—এবং টিকিটের টাকাটা স্বামীজীর জন্ম শত-স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব তহবিলেই জমা হবে।

হল্ পুরোপুরি ভরেনি বলে স্বামীজী সকুণ্ঠে বললেন: "আজ বিজয়া দশমী ব'লে বাঙালীদের অনেকেই আসতে পারেন নি।"

যাই হোক রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথমে গাইলাম আমার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা:

তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার,
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানে নি আর।

তারপরে এর অনুবাদ গাইলাম সবাই মিলে কোরাসে—আমাদের মার্কিন শিষ্যযুগল যোগ দেওয়ার ফলে কোরাস জমেছিল বৈকি:

O pinnacle spirit of our age, O mother Kali's deputy
And darling son, who hailedst her as thy
All-in-all, we bow to Thee.

তারপরে গাইলাম ঐভাবে স্বামীজীর বন্দনা :

অন্নের পথ বিদায়ে বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ,
বিবেকানন্দ।
দিলে তাহাদের দিব্য নয়ন ছিল যারা মোহ
বাসনা-অন্ধ।

ইংরাজীতে :

Thou sangst, Vivekananda ; "Mother
India calls, how can you sleep ?"
A truce to-crawling in coward fear !
Awake, arise love's truth to keep."

এতে একটা সুফল ফলল এই যে, বেশির ভাগ শ্রোতাই বুঝতে পারল গানদু'টির ভাবার্থ—কারণ বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীই এসেছিল সেদিন বেশি—হয়ত অবাঙালীরা বিজয়া দশমীর জন্যে ব্যস্ত হয় না ব'লে—জানি না। জানি শুধু এইটুকু যে, রামকৃষ্ণ মিশনের পুণ্য আবহে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের তর্পণ করতে না করতে মন ভরে উঠল। তারপরে গাইলাম একটি মীরাভজন, পিতৃদেবের পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ও সবশেষে কমলাকান্তের বিখ্যাত কালীকীর্তন "মজল আমার মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় গান। কাগজে লিখল : "শ্রোতারা শুনল পিন-পড়া নৈঃশব্দ্যে গভীর ভক্তিভাবের আবেশে…" ইত্যাদি।

এর পরের দিন গান গেয়েছিলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাদের বরেণ্য লোকপাল শ্রীল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সামনে। এ প্রখ্যাত মনীষীর কথা অনেক দিন থেকেই কিছু লিখব ভাবছি কিন্তু হয়ে ওঠে নি

প্রধানতঃ এই জন্যই যে, তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতি-পরিচয় বহু বৎসরের হ'লেও হৃদ্যতার সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছে সম্প্রতিই বটে, কি ভাবে —বলি। সংক্ষেপেই বলব।

তুমি জানো আমার "তীর্থংকর" বইটির অনুবাদ আমি প্রকাশ করেছি Among the Great নাম দিয়ে এবং এও জানো যে, বইটি প্রকাশ হবার পরে বাংলা দেশে বিশেষ কেউ আনন্দ প্রকাশ করে নি তোমার মতন কয়েকটি দরদী গ্রহীতা ছাড়া। এরও সেই একই কারণ, মহাজনের মহত্ত্বের কাহিনীতে বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকার মন তেমন সাড়া দেয় না: মহাজনেরা ভালো লোক হবেন এ তো জানা কথাই —তাঁদের কথা আবার শুনব কি? যাই হোক, তীর্থংকরের ইংরাজী রূপায়ণ Among the Great বইটি লেখা যখন সমাপ্ত হ'ল তখন ভেবেচিন্তে পাঠিয়ে দিলাম শ্রীরাধাকৃষ্ণনকে। তখন তিনি কাশীতে। ভেবেছিলাম, তিনিও আমার বাঙালী বন্ধুদের মতন বইটির অনাদর করবেন, হয়ত পড়বেনই না, কে জানে? তাই উল্লসিত হ'লাম যখন তিনি বইটির একটি চমৎকার ভূমিকা লিখে দিলেন।

তীর্থংকরের বঙ্গীয় অনাদরের ক্ষতিপূরণ মিলল Among the Great-এর সার্বভৌম সমাদরে। প্রথমে ভারতের সবদেশের মনীষীই সাড়া দিলেন। দেখতে দেখতে তিনটি সংস্করণ বেরুল। তারপরে জাইকো নিউয়র্কে পপুলার এডিশন পঞ্চাশ হাজার কপি ছাপার সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশেই আমার এ বইটি আদৃত হ'ল—এমন কি, অলডাস হাক্সলি ও সমর্সেট মমও প'ড়ে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে আমাকে চিঠি লিখলেন। ফলে এক কথায় যে-আমি বাংলা দেশে বহুদিন ধ'রে কলম পিষেও, এমন কি চলনসই সাহিত্যিক ব'লেও গণ্য হতে পারি নি, সে-আমি একটিমাত্র ইংরেজী বই লিখেই বিশ্বের পাঠকসভায় সমাদৃত হ'লাম। ঠাকুরের লীলা কে বুঝবে! আজও আমার দশ-বারোটি ইংরাজী বইয়ের মধ্যে এই বইটিরই বিক্রয় সবচেয়ে বেশি—বম্বে, পুনায়, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে। তবে কলকাতায়

নয়। কারণ বলেছি—আমার বাঙালী-বন্ধুরা প্রায় সবাই এই একটি বিষয়ে একমত যে, আমি বড়জোর একজন সুগায়ক—এমনকি সুরকারও নই, সাহিত্যিক ত নইই। একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক আমাকে বিজ্ঞ হেসে বলেছিলেন: "কেন মিথ্যে বই লিখছেন দিলীপবাবু? আপনি গান করুন, যা পারেন।" মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই ব'লে যে—আজ যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম ব'লে মান পেয়েছেন সেই সমর্সেট মম লিখেছেন যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস Of Human Bondage বহু বৎসর প'ড়ে ছিল, কোন প্রকাশকেরই নেকনজরে পড়েনি—প্রকাশ হল প্রায় দৈবাৎ —এক বান্ধবীর প্রসাদেই বলা চলে। কেবল মজা এই যে, যে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের পর প্রকাশক পড়তে না পড়তে 'অচল' ব'লে বরখাস্ত করেছিলেন, সেই উপন্যাসটির প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে মম বিশ্ব-বিশ্রুত কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম ব'লে অভিনন্দিত হলেন—শুধু য়ুরোপে নয়, আমেরিকায়ও তাঁর এই পাণ্ডুলিপিটি সাদরে সাহিত্যকীর্তি-আগারে রক্ষিত হ'ল। তাই ভাবলাম, আমার সাহিত্যপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমার উন্নাসিক সাহিত্যিক বন্ধুর রায় মহাকালের সুপ্রীমকোর্টের বিচারে উল্‌টে যেতেও পারে হয়ত।

যাই হোক, "তীর্থংকর" অনাদৃত হওয়ার পর ভয় কাটল প্রথম শ্রীরাধাকৃষ্ণনের প্রশস্তিপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে। তাঁকে লিখলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে: "যখন আমাকে প্রায় কেউই লেখক ব'লে চিনত না আপনি তখন অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আমাকে বরণ করতে" ইত্যাদি।

তারপর আমার ষাট বৎসর বয়সে কলকাতায় যখন বন্ধুরা ১৯৫৭ সালে আমাকে স্বর্ণগ্রন্থ উপহার দেন তখন তার জন্যে তিনি এই বাণী পাঠালেন ভাইস প্রেসিডেন্ট পদবী পাবার পরে:

"I am glad to know that you are according a suitable reception to Sri Dilip Kumar Roy whom I have known for a number of years and have had a great

affection and admiration for him. The test of human life is its capacity to radiate joy and sunshine among those who meet us. His powerful and musical voice has delighted thousands ··he has been a notable exponent of our Music and has made very valuable contributions to our literature···May he be spared for a number of years to spread the message of love and joy."

চমকে গিয়েছিলাম বৈকি। কারণ আমি বহুদিন থেকেই ভারতের এ সর্বশ্রদ্ধেয় মনীষীর পাণ্ডিত্য, চরিত্র, ঔদার্য ও দার্শনিক ভাবুকতার অনুরাগী ছিলাম বটে—বিশেষ ক'রে ভালোবাসতাম তাঁর স্বচ্ছ অনবদ্য ইংরাজী ভাষাশৈলী—কিন্তু আমার সত্যিই একবারও মনে হয় নি যে, আমার লেখার বা গানের তিনি অনুরাগী। তাই তাঁকে ফের ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখলাম এবং সেই থেকে তিনি আমাকে নিয়মিত পত্র লিখতেন—বা আমি লিখলে তৎক্ষণাৎ পত্রোত্তর দিতেন বলাই ভালো।

শ্রীরাধাকৃষ্ণনের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখবার আছে। আমি কিছু লিখেছিও একটি ইংরাজী প্রবন্ধে—Minstrel of Harmony নাম দিয়ে। এ প্রবন্ধটি তাঁর গত জন্মদিনের স্বর্ণগ্রন্থে তাঁকে উপহার দেবার কথা ছিল, দেওয়া হয়েছে কি না জানি না, কারণ, বইটি প্রকাশকেরা আমাকে পাঠান নি। কিন্তু সে যাই হোক, প্রবন্ধটিতে আমি লিখেছিলাম একটি কথা খুব জোর দিয়েই যে, ভারতের এ বরেণ্য বাণীবাহের জীবন তথা রচনার একটি প্রধান বাণী হ'ল দর্শন ও আত্মিক উপলব্ধির আলোয় ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমন্বয়। এ প্রতিপাদ্যটিকে ফলিয়ে তুলতে হ'লে অন্ততঃ বিশ-পঁচিশ পাতা লিখতে হবে। তার সময় নেই—তা ছাড়া এ পত্রকে দার্শনিক প্রবন্ধে দাঁড় করালে তোমার ও পাঠকদের 'পরে অত্যাচার করা হবে। তাই শুধু এইটুকু

ব'লেই ক্ষান্ত হই যে, ভারতের এ মনীষীর কাছে দার্শনিক তথা অধ্যাত্মপন্থীদেরও ঋণ যে অদূর ভবিষ্যতে স্বীকৃত হবেই হবে, একথা মনে করার বহু সঙ্গত কারণ আছে। এ পর্যন্ত ভারতের অন্তরাত্মার বাণী বিদেশে প্রচার করেছেন প্রধানতঃ ছয়টি মহাজন—সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ, তার পরে যথাক্রমে স্বামী রামতীর্থ, শ্রীঅরবিন্দ, আনন্দ কুমারস্বামী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণন। এযুগে মানুষ মানুষের কাছে এসেছে শুধু বিজ্ঞানের মাধ্যমে নয়—দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও কবিদের মাধ্যমেও বটে। এঁদের মধ্যে কোন্ মনীষীর দান কোন্ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছে সে গবেষণা এ খোলাচিঠিতে অবান্তর হবে। তাই এ সূত্রে শুধু এইটুকু ব'লেই থামব যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণন তাঁর আশ্চর্য প্রাঞ্জল ও প্রসন্ন ইংরাজীতে ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রাণের কথাটি যে গভীর পাণ্ডিত্যে ও অন্তর্দৃষ্টির আলোয় ফুটিয়ে তুলেছেন তার জন্যে ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগীরা তাঁর কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমার নিজের তাঁকে সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই জন্যে যে, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও এযুগের "সেকুলার" বুলি উদ্‌গার করেন নি, বলেছেন সংযত অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের দীপ্ত ভাষায় যে—

"True life grows from inside···the unrest of the people is due to the thwarted desire for religion···We do not realise that religion, if real, implies a complete revolution, a total overcoming of our unregenerate nature."*

---

* সত্য জীবনের প্রকাশ হয় অন্তর থেকে···ধর্মৈষণা ব্যাহত হবার ফলেই এ-যুগের মানুষ আজ এত অশান্ত হয়ে উঠেছে···আমরা এখনও ঠিক মত উপলব্ধি করি নি যে, যথার্থ ধর্ম জীবনকে ঢেলে সাজায়, ঘটায় আমাদের অশুদ্ধ চরিত্রের রূপান্তর।

—Brahma Sutra (1960) ভূমিকা ৯ পৃষ্ঠা।

কয়েক বৎসর আগে আমি তাঁকে লিখি যে, তাঁর Principal Upanishads-এর দেড়শো পাতা ভূমিকা ও উপনিষদগুলির অপরূপ প্রাঞ্জল ইংরাজী অনুবাদ প'ড়ে আমি শুধু মুগ্ধই না, বিশেষ লাভবান্ হয়েছি। এ ছাড়া তাঁর গীতার অনুবাদও আমার খুব ভালো লেগেছে—মনে হয়েছে গীতার এত চমৎকার ইংরাজী অনুবাদ কেউ করে নি আজ পর্যন্ত। (এক শ্রীঅরবিন্দ করতে পারতেন, কিন্তু গীতা-জিজ্ঞাসুদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি তাঁর গীতা-ভাষ্যে প্রসঙ্গতঃ কতিপয় শ্লোকের উল্লেখ করেই নিরস্ত হয়েছেন।)

শ্রীরাধাকৃষ্ণনের ইংরাজী শৈলী সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলার আছে। ইংরাজী ভাষার চর্চা আমি ক'রে আসছি আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং দীক্ষা পেয়েছি এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায়—ইংরাজী গদ্যে-পদ্যে যাঁর মত জুড়ি হাঁকাতে এযুগে আর কেউ পারে নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে আমেরিকায় একটি প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় ভারতের রাজনৈতিক ভাবধারা সম্বন্ধে। বইটি প্রকাশ করেছেন কালিফর্নিয়ার খ্যাতনামা অধ্যাপক ম্যাকেনজি ব্রাউন—The White Umbrella নাম দিয়ে। এতে শ্রীরাধাকৃষ্ণন শ্রীঅরবিন্দের তর্পণে লিখেছেন—"আমাদের দেশে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মনীষীদের শিরোমণি এবং আত্মিক জগতের একজন দিক্‌পাল। আমাদের রাজনীতি ও দর্শনে তাঁর অবদান ভারতবাসী ভুলবে না কোনদিনও। আর দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান জগৎ চিরদিন সকৃতজ্ঞেই স্মরণ করবে।"

("Sri Aurobindo was the greatest intellectual of our age and a major force in the life of the spirit. India will not forget his services to politics and philosophy and the world will remember with gratitude his invaluable works in the realness of philosophy and religion.")

শ্রীঅরবিন্দের মহিমা ও কীর্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। আমি তবু তাঁর নাম করলাম শুধু এই জন্যে যে, শ্রীঅরবিন্দ যে-পথের পথিকৃৎ সে-পথে শ্রীরাধাকৃষ্ণনও একজন উজ্জ্বল দিশারী ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন। শুধু ভারতের আত্মার আধুনিক বাণী-বাহদের একজন প্রধান পুরোধা রূপেই নয়, তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ সৌম্য গদ্যের ও গুণেও বটে। শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কোন ভারতীয় লেখকই উচ্চাঙ্গের ইংরাজী গদ্যে আজ পর্যন্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণনের মতন স্নিগ্ধ আলো বিকীরণ করতে পারেন নি। এ-কৃতিত্বের জন্যে তিনি চিরদিন নমস্য থাকবেন মনে হয়, আর এই কারণে যে, তাঁর ইংরাজীর মধ্যে বৈদেশিক অপটুতা, প্রগল্‌ভতা বা ভুল-ভ্রান্তির চিহ্নলেশও মেলে না —তাঁর গদ্য তর্ তর্ ক'রে বয়ে চলেছে ভারতীয় দার্শনিক মনীষার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্য ও বিশেষজ্ঞতার এক অপরূপ সমন্বয়ে। এর বেশি আর বলব না আজ। কেবল এই সূত্রে আমাকে লেখা তাঁর দু'একটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে সমাপ্তি টানব।

একটি পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন (১৯. ২. ১৯৫৭):

"As for the meaning of religon I have understood it as the deepening of one's inward awareness and extending the objects of one's love."

(১৯. ১. ১৯৫৯):

"You are doing good work and making people who come under your influence aware of themselves and their possibilities. I am glad that your 'Among the Great' has had a wide circulation. You are always welcome to send me accounts of your activities and I will read them with interest."

এর পর থেকে আমি তাঁকে মাঝে মাঝে পাঠাতাম আমাদের পুণা মন্দিরের নানা অঘটনের কাহিনী—তিনি অবিশ্বাস করতেন না ব'লে

আরও উৎসাহ পেয়ে। এসূত্রে একবার তিনি লিখেছিলেন আমাকে (২৯-৯-৬২):

"I read the enclosures to your letter with great interest····I have a conviction based on experience that a great Pilot is guiding and taking us from one stage to another. * All that He calls for in return is complete surrender. Consciousness of the pervading presence of the Divine has helped me all these days··· I am taking the liberty of sending you a copy of my Brahmasutra. You have already my Gita and Upanishads. This will complete the classics."

আমি এই বইটি পাই মুসুরিতে—অক্টোবরে। এতে তাঁর নানা ভাষ্য ও টীকা প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আমি লিখি যে আমি এথেকে যথেষ্ট লাভ করলেও আমি স্বভাবে ভক্তিমার্গী, বৈদান্তিক ভূমাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞও নই, হতেও চাই না। উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন (১৮-১০-৬২):

"I am glad to know that you have started reading the book. You need not think that because I am interested in philosophical investigation, I am unmindful of the important role of bhakti. The Gita defines four types of devotees :

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

Those who are sick and seek help, those who seek

---

* মনে পড়ে হ্যামলেটে সেক্সপীয়রের বিখ্যাত সমধর্মী উক্তি :
"There's a divinity that shapes our ends
Rough-hew them how we will."

wealth ; those who seek knowledge and, lastly, the knower who surrenders himself to the Divine and allows the Divine to handle his life and use it for purposes other than his own."

তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (১৬৭ পৃঃ) যে ভক্তির ব্যভিচার হ'তে পারে কিন্তু ভক্তির প্রয়োজন আছেই আছে এবং ভক্তি "touches the deepest springs of man's inner life," সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন একটি বিখ্যাত শ্লোক "ভাগবত-মাহাত্ম্য" থেকে :

অলং কলৌ ব্রতৈঃ তীর্থৈঃ যোগৈঃ শাস্ত্রৈঃ অলম্ মখৈঃ ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈঃ ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা ॥

অর্থাৎ কলিযুগে ব্রত তীর্থ শাস্ত্র যোগ যজ্ঞ—এসকলই বৃথা, জ্ঞান-গম্ভীর কথালাপও বৃথা, ভক্তিগানেই মুক্তিগীতা।

এহেন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় বৈকি—আরও এই জন্যে যে, এ-যুগে আমরা নিরন্তর অত্যাধুনিক হ'তে চেয়ে রুখে উঠেছি ভারতের শিক্ষা-দীক্ষাকে সবই বাতিল ক'রে পুরোদস্তুর বিলিতি সংস্কৃতিকে অবলম্বন ক'রে হাল-আমলের নানা বিলিতি বুলির নামাবলী জড়িয়ে আমাদের সেকেলে ভারতীয় ভোল বদ্‌লে ফেলতে। বিশেষ ক'রে এযুগের কর্মবীরেরা প্রায় সবাই চান ওদের চোখে বড় হয়ে উঠতে—ওদের চালে চ'লেই ওদেরকে টেক্কা দিয়ে। এহেন যুগের নবচারণদের মাঝে শ্রীরাধাকৃষ্ণনের মতন তেজস্বী আত্মস্থ ভাবুকের দেখা পাওয়া খানিকটা অঘটনেরই কাছাকাছি বলব—যিনি দিল্লীর ধর্মবিরাগী "সেকুলার" রাজতক্তে ব'সেও শুধু যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করবার সময় পান তাই নয়, অকুতোভয়ে লিখতে পারেন :

"Though the conditions of modern life have become different and are in some ways better, we cannot say that we are superior to the ancients in

spiritual depth or moral strength to grapple with difficulties."*

আমি তাঁকে লিখেছিলাম পুণা থেকে যে, ভূপাল হয়ে দিল্লীতে রামকৃষ্ণ মিশনে গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে তাঁর সামনে ভজন গাইতে চাই, যেহেতু শুনেছি যে, তিনি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই ঘণ্টাখানেক ভজন শোনেন। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করেন ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬৷৷০টায়। আশা করি নারায়ণ, তুমি ঘা খেয়ে বলবে না, তিনি ভজন শোনেন ভক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে?

আমরা গেলাম সদলবলে। রাষ্ট্রপতি প্রথমে আমাকে ও ইন্দিরাকে একান্তে ডেকে চা খাওয়ালেন। কথায় কথায় অনেক প্রসঙ্গই এসে গেল। সবচেয়ে ভাল লাগল, যখন তিনি ভারতের আত্মিক মহিমার কথা বললেন, যার মূলে আছে মৈত্রী ও অনুকম্পা। উদাহরণ দিলেন বিখ্যাত দ্রৌপদীর—ভাগবত থেকে। বললেন: "তুমি জান দুর্বৃত্ত অশ্বত্থামা কি ভাবে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচ পুত্রকে ঘোর রাত্রে চোরের মতন এসে হত্যা করেছিল? অর্জুন কৃষ্ণের কথায় অশ্বত্থামাকে দণ্ড দিতে তাকে বেঁধে এনে দ্রৌপদীর সাম্‌নে দাঁড় করাতেই দেবী বলে উঠলেন—'মুচ্যতাং মুচ্যতাং' †—গুরুপুত্রের বন্ধন খুলে দাও। এখনো তাঁর মা কৃপী বেঁচে—

* এ-যুগে আমাদের জীবনের ছন্দ ও পরিবেশের বদল এবং কোনো কোনো বিষয়ে উন্নতি হ'লেও বলা চলে না যে আর্য দ্রষ্টাদের যে অধ্যাত্ম-গভীরতা বা বাধাকে জয় করবার নৈতিক শক্তি ছিল তাদেরকে আমরা ছাপিয়ে উঠেছি।

† আমার ভাগবতী কথায় আমি এ-অংশের অনুবাদ করেছি এই ভাবে:

মুক্ত করো, মুক্ত করো, করিও না হত্যা এ-নির্বলে,
জননী ইঁহার কৃপী পতিব্রতা আজিও জীবিতা।
পুত্রশোকে যে-বেদনা সহি আমি আজ জীবন্মৃতা
সে ব্যথা সহিতে যেন না হয় তাঁহাকে অশ্রুজলে।

মা রোদীৎ অস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিমি অশ্রুমুখী মুহুঃ॥"

ব'লে একটু থেমে রাষ্ট্রপতি গাঢ়কণ্ঠে বললেন: "এরই নাম ভারতের নারী—যে দুঃখ পেয়ে শুধু যে দুঃখ দিতে চায় নি তাই নয় —দুঃখ যাকে দীক্ষা দিয়েছে সমবেদনার, প্রেমের, ক্ষমার।" একটু থেমে তিনি ব'লে চললেন: "আমাদের মধ্যে আর্যদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল একসময়ে। উঠেছিলাম আমরা সত্যিই আত্মিক কীর্তির শিখরে। ধরো, সংসারে থেকে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। কি ভাবে কর্ম করতে হবে হাজারো চঞ্চলতার মাঝে? না, 'মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব'—মাথায় কলসী রেখে নটী ন্যাচছে, কিন্তু কুম্ভ আছে অচঞ্চল। এ-যুগে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এ-ধরণের উপমার মধ্যে দিয়ে, দেখতে শিখতে পারি ঠিক ভঙ্গিতে।"

এইভাবে আরও অনেক কথাই বললেন রাষ্ট্রপতি—আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করলেন উদ্দীপ্ত হয়ে, ভারতের ধর্মবুদ্ধির সমর্থনে। বড় ভালো লাগল শুনে—আরও এই আশাপ্রদ সত্যটি লক্ষ্য ক'রে যে, তাঁর মন রাষ্ট্রনৈতিকতার চাপেও একটুও নুয়ে পড়ে নি, দৃষ্টি হয় নি আবিল। তিনি চলেছেন আজও তাঁর স্বধর্মের অনুসরণ ক'রে স্বভাবের সহজ প্রেরণায়। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে অকুতোভয়েই লিখেছিলেন যে, রাজাদের সব আগে হ'তে হবে দার্শনিক—Philosopher King; আমি একথার উল্লেখ ক'রে রাষ্ট্রপতিকে বললাম: "ভারতের দৈন্যের সীমা নেই, আমরা আজ এ-লক্ষ্যহারা জগতে খানিকটা হয়ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি নানা ভাবে নানা আদর্শের সংঘাতে। কিন্তু তবু এ-গর্ব আমরা করতে পারি যে, আমাদের রাজা,—খাঁটি দার্শনিক। য়ুরোপে দার্শনিক রাজার কেবল একটি দৃষ্টান্ত আছে—প্রাক্-হিটলারী যুগের মাসারিক—চেকোশ্লোভিকিয়ার প্রেসিডেণ্ট। ১৯২২-এ আমি প্রাগ-এ তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজপ্রাসাদে দেখা করেছিলাম। সান্ধ্যাহারের পর তিনি

আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কার জানেন? টলষ্টয়ের, যাঁকে তিনি চিনতেন। রাজারাজড়ার মধ্যে এহেন মনীষী সচরাচর ঠাঁই পান না—পেলেও শক্তিমদে তাঁদের মাথা গরম হয়ে ওঠে, যার ফলে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টি হয়ে ওঠে আবিল। তাই আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম ভাবতে যে, এই প্রথম আমরা রাজসিংহাসনে পেলাম এমন রাজাকে যিনি ভারতের রাজধর্মের খবর রাখেন···শান্তিপর্বে যে-রাজধর্ম্মের গুণগাণে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সোচ্ছ্বাসেই বলেছিলেন: 'কৃতস্য করণাৎ রাজা'—রাজাই সত্যযুগের প্রবর্তক।"

এরপরে গান হ'ল একটি মঞ্চে। পাদপ্রদীপের মতন সাজিয়ে সুন্দর ক'রে প্রদীপ জ্বালান হয়েছিল, আর রাখা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের একটি মর্মরমূর্তি। মঞ্চের উপরে ছিলাম আমরা ছয় জন, তাছাড়া ইন্দিরার মাতুলানী শ্রীপ্রাণনাথ নন্দার স্ত্রী, নীলকণ্ঠ, দেওয়ান সুরেন্দ্রলাল—আরও অনেকে। সামনে রাষ্ট্রপতির বন্ধু-বান্ধব অতিথি এবং আমার কয়েকটি বন্ধু, যাঁদের আমি ডেকে এনেছিলাম। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমার এক প্রিয় বন্ধু শ্রীমননকুমার মৈত্র।

এ সবের ফলে হ'ল কি, রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিসিয়াল আবহ ফিকে হয়ে যাওয়ায় গান ক্র'মে জ'মে উঠল দেখতে দেখতে। চীন তখনও ভারত আক্রমণ করে নি, তবে তোড়জোড় বাঁধছে ব'লে আমি প্রথমে গাইলাম একটি সৈন্যদের অভিযান-সঙ্গীত—march-song; গানটি ১৯৫০ সালে ইন্দিরা রচনা করে এবং জেনারেল কারিয়াপ্পার অনুরোধে আমি সুর দিয়ে গাই বম্বেতে। এবং আমি টাকা পাই মোটমাট আঠারো হাজার—ভাবতেও বুকে বল আসে আজ।

যাই হোক, অক্টোবর থেকে চীনারা ভারত আক্রমণ করার পর, মুসুরী, দিল্লী, জয়পুর ও উদয়পুরে এ গানটি আমি প্রায় প্রতি আসরেই গাইতাম—কেন, তা কি আর বলতে হবে? গানটি শুনে ১৯৫০ সালে বড় কেউ খেয়াল করেন নি তার তাৎপর্য। কিন্তু এবার গাইতে-না-গাইতেই শ্রোতারা উঠলেন সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে, বিশেষ ক'রে এর

ইংরেজী অনুবাদও আমি সঙ্গে সঙ্গে গাইতাম ব'লে। বাংলাতেও গাইতাম, তবে কেবল বাঙালীদের আসরে। হিন্দি গানটি ও তার ইংরেজী অনুবাদ ইন্দিরার তৃতীয় ভজনাবলী 'সুধাঞ্জলি'-তে পাবে। বাংলাটি কেবল 'শ্রুতাঞ্জলি'-তে ছাপা হয়েছে। তাই এখানে প্রতি গানের মাত্র দু'টি লাইন উদ্ধৃত ক'রেই থামব :

হম ভারতকে হৈঁ রখ্‌বালে দেশকা বল হম প্রাণ হৈঁ হম্।
ইজ্জৎ ইস্কী শান হমারী মা হৈঁ য়ে সন্তান ইহঁ হম্॥

We are India's sleepless sentinels,
Strength of her sinews, her heart's delight,
Jealous of her soul's inviolate honour,
Sons we remain to our Mother of might.

আমরা যে ভারতের ধর্মধারক ভাই,
দেশের আমরা বল, তনু মন প্রাণ,
তারি গরিমার মহাগৌরবে গৌরবী,
সেবক মায়ের, অনুগত সন্তান।

এ গানটির সম্বন্ধে দু'চারটি কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশে স্বদেশী গানের রেওয়াজ সুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' থেকে। তার পরে অনেক কবিই স্বদেশী গান লিখেছেন ভারতের নানা ভাষাতেই—বাংলা ভাষায় সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও উদ্দীপক গান লিখেন নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তিনিও সৈন্যদের রণাভিযান-সঙ্গীত লেখেন নি। ইন্দিরার এই গানটিই প্রথম রসোত্তীর্ণ গান হিন্দি মার্চ-সঙ্গীতের মধ্যে। ফরাসী ভাষায় সৈন্যদের রণাভিযান সঙ্গীত হ'ল বিখ্যাত La Marseillaise ; কিন্তু সে গানে রক্তারক্তি কাণ্ড বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। ইন্দিরার গানটির মধ্যে রক্ততাণ্ডব-বর্জিত আত্মোৎসর্গদীপ্ত রণবাণী ছত্রে ছত্রে স্ফুট হয়েছে, তাই চীনাদের অত্যাচার সুরু হওয়ার পরে আমি এ গানটির বহুল প্রচার চেয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—জয়পুরে, দিল্লীতে,

মুসুরীতে ও উদয়পুরে এ গানটি শুনে হাজার হাজার লোককে উজিয়ে উঠতে দেখেছি—জয়পুরে ছাত্রছাত্রীদের এত উৎসাহ হ'ল যে তা'রা এল টেপ রেকর্ড করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে—পরে জয়পুর রেডিও কর্তৃপক্ষ লিখলেন, এ গানটি ব্রডকাষ্ট্ করবার অনুমতি চান, এবং দিল্লী থেকে পুনা রেডিও অফিসে বিশেষ নির্দেশ এল এ গানটি রেকর্ড করার। এ-সূত্রে বলার লোভ সামলাতে পারছি না (ত্রুটি মার্জনীয়) যে, দিল্লীর কর্তারা আমাকে হার্মোনিয়মের সঙ্গেই এ গানটি গাইতে অনুমতি দিয়েছেন ব'লে গতকাল—৩রা ডিসেম্বর এখানকার পুনা রেডিওতে এ গানটি গেয়ে এলাম পরমানন্দে এবং ঐ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ তর্পণও গাইলাম—যে বন্দনা দু'টি রামকৃষ্ণ মিশনে গেয়েছিলাম ও তোমাকে পাঠিয়েছিলাম।

রাষ্ট্রপতি ভবনে সেদিন প্রথমেই গেয়েছিলাম জয়দেবের বিখ্যাত—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং
কেশবধৃত-মীনশরীর জয় জয় জগদীশ হরে!

এ গানটি আমি মালকোষ ও ভৈরবী মিশিয়ে গাই মন্দিরে আর সবাই কোরাসে যোগ দেন—জয় জগদীশ হরে।—এবার কলকাতায় গিয়ে তোমাকে শোনাবই শোনাব। হরিদ্বারে গিয়ে যখন পাঁচ দিন গঙ্গাতীরে ছিলাম— একটু পরকালের পারানি যোগাড় করতে, তখন সেখানে একদিন ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাতীরে খোলায় অজস্র ভক্ত শ্রোতার সামনে গেয়েছিলাম পিতৃদেবের গঙ্গাস্তোত্র—পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে, এবং পরম ভক্ত নারায়ণ দাস বাজোরিয়ার মন্দিরে গেয়েছিলাম এ গানটির জুড়ি ঐ একই সুরে :

হরিপদকমলসমুদ্ভবকোমলকায়ে!
পাতকমঙ্গজময়ি শিবজায়ে!

জাহ্নবি! হর দেবি! মমাম্ব ওঁ দশবিধপাপহরে!

অবশ্য গঙ্গাকল্লোলিত অনিন্দ্য হরিদ্বার তীর্থভূমিতে এ ধরণের সংস্কৃত স্তোত্র যে রকম জমেছিল, রাষ্ট্রপতি ভবনে সে রকম জমে নি। কিন্তু তবু সুরটি এমন জমকালো হয়েছে যে, সবাই মুগ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলি "দশবিধপাপহরে"গঙ্গাস্তোত্রটির রচয়িতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। ইনি শুধু মহাপণ্ডিতই নন, সেই সঙ্গে সংস্কৃতে একজন মনোহর কবি। এঁর অনেক পদাবলীই আমি সুর দিয়ে গেয়ে থাকি যত্র-তত্র। কারণ, জয়দেবের পর এত সুন্দর ভক্তিস্নিগ্ধ সুললিত সংস্কৃত গান আমি আর পড়ি নি। এঁর একটি আবাহনের দুটি মাত্র চরণ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না:

এহি দয়াধন! রসঘনবিগ্রহধারণ! সুন্দরমূর্তে!
মায়াসংবৃত-কায়ালঙ্কৃত-বিশ্বচরাচরপূর্তে!

এর আমি অনুবাদ করেছি—

এস দয়াধন! এস রসঘনবিগ্রহ হে শ্রীকান্ত!
নিজ কায়াভায় রঞ্জি' ধরায় কেন কর মায়াভ্রান্ত?

যা হোক রাষ্ট্রপতি ভবন প্রসঙ্গের হারানো খেই ধরি ফের। গান সত্যি জ'মে গেল শেষের দিকে—যখন ধরলাম ইন্দিরার জনপ্রিয় মীরাভজন—

দীপক জলনা সারী রাত।
আজ সুনা হৈ ইস পথ পর আয়েঙ্গে মেরে নাথ॥

প্রদীপ! জ্বল্ তুই সারারাত,
শুনেছি যে আজ এই পথ বেয়ে আসিবে সে প্রাণনাথ।

এ গানটি কলকাতায়ও গেয়েছিলাম দশ হাজার শ্রোতার সামনে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে—তোমার সামনেই, মনে পড়ে কি? পরে এ

গানটি কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনেও গেয়েছিলাম সাদার্ণ এভেনিউএ—বহু শ্রোতার অনুরোধে।

গানটিতে রাগসঙ্গীত ও কীর্তন মিশিয়েছি ব'লে দেখতে দেখতে জ'মে যায়—রাষ্ট্রপতি ভবনেও জ'মে গেল এবং আশাতীত ভাবেই বলব—বিশেষ যখন তান ও আঁখরের প্রেরণা এসে গেল। রাষ্ট্রপতি গানের শেষে মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং আমি নেমে আসতেই আমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—"তুমি আত্মহারা হয়ে গেয়ে শেষের দিকে আমাদের সবাইকেই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিলে।" ("You forgot yourself and lifted us all up.")

আনন্দ হ'ল বৈকি—আরও এই জন্যে যে, ১৯৫২ সালে যখন আমি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রথমবার ভজন করেছিলাম তখন সে ভজন গান গেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভজন হয় নি। সেখানে ছিলেন পণ্ডিতজী, আজাদ, তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আরও বহু রাজপুরুষ। হয়ত সেই জন্যেই—অর্থাৎ পরিবেশটি অত্যধিক গুরুগম্ভীর (official) ছিল ব'লেই আমার গান সেদিন জমেনি। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণণকে আমার সে সুন্দর সন্ধ্যায় সত্যিই পর মনে হয় নি—বিশেষ ক'রে সম্প্রতি তাঁর গীতা ও উপনিষদ্ ভাষ্য প'ড়ে মুগ্ধ হওয়ার জন্যেই হয়ত। তা ছাড়া তিনি প্রেক্ষাগৃহটিকে গুরুগম্ভীর ক'রে সাজান নি ত, স্নিগ্ধ দীপালোকে প্রদীপ্ত ক'রে কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন ক'রে তবে ডেকেছিলেন আমাকে ভজন-কীর্তন-স্তোত্র গাইতে। নইলে গাইতে গাইতে আমার মনে এত সহজে ভক্তিভাবের ঢলও নামত না—বা শ্রোতাদের মনও তেমন গলত না। গাইছে ত গাইছে—মনে হ'ত সবার। বড়জোর বাঃ—বেশ! দুটো খুশির হাততালি—ব্যস্। এই কথাটি তোমাকে বার বার বলেছি নারায়ণ, (যদিও তোমার মন পাই নি) যে, ভক্তি বাদ দিয়ে ভজন বা মূর্তি বাদ দিয়ে কীর্তন হয় না। কিন্তু এ-তর্ক এখন মুলতুবী থাক—তোমার উপর বেশি জুলুম করা সমীচীন হবে না—পূর্ব বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই

আমার ধর্মপ্রলাপে চম্পট দিয়েছেন, তোমাকেও হারাতে চাই না। তাই শুধরে নিই, বলি : আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, তুমি ভক্তি বাদ দিয়ে সাধ মিটিয়ে কীর্তন ও আঁখর উপভোগ ক'রো—কেবল আমি যদি তা না পারি ত অক্ষম ব'লে কৃপা ক'রো—বেদরদী না হয়ে। কেমন ?

এর পর অন্তিম অধ্যায় তাড়াতাড়ি সারি। চিঠিটা দশ-পনের পাতায় শেষ করব ভেবে ব'সে দেখ দেখি, কি কাণ্ড ক'রে ফেললাম ! হয়ত সবটা পড়বেই না তুমি। যাই হোক, খোলা চিঠি ত—ছাপা হ'লে তুমি না পড়লেও দু'চারজন পাঠক অন্ততঃ পড়বেন।

মুসুরীতে ইন্দিরার পিতৃদেব কৃপারামজির আতিথ্যে প্রতি বৎসরে একবার ক'রে যাই পূজার সময়ে। কেবল গত বৎসরে যাওয়া হয় নি, কলকাতা, কাশী ও অযোধ্যায় যেতে হয়েছিল ব'লে।

কৃপারামজি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন—angina pectoris, বড় সাংঘাতিক অসুখ। জানো নিশ্চয়ই। এবার বাঁচার আশা ছিল না বললেই হয়। যখন অবস্থা খুব খারাপ তখন তিনি ইন্দিরা আর আমাকে তার করেন। তার পর ইন্দিরার বোন কান্তা যায় ও পুনায় ফিরে এসে বলে : অবস্থা সঙিন। এই সময়ে প্রথম আমি তাঁর জন্যে দৈনিক প্রার্থনা সুরু করি আমাদের পুনার মন্দিরে—বিগ্রহের সামনে। সচরাচর আমি কারুর দৈহিক বা ঐহিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করি না। কিন্তু কৃপারামজি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন ব'লেও বটে এবং তিনি সত্যিই শ্রদ্ধাবান্ ধার্মিক ও মহৎ মানুষ ব'লেও বটে, আমি এ যাত্রা প্রার্থনা না ক'রে পারি নি। তার পরে কী যে হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে, তিনি সেরে উঠলেন, লিখলেন, (৯ই জুলাই) যে হৃদ্‌রোগ "gone with the wind"। পরে আমাকে সস্নেহ তিরস্কারও করলেন এই বলে যে, গত বৎসরে আমি যাই নি ব'লেই তিনি এত ভুগলেন। এবার আসতেই হবে—এবং কথা দিতে হবে যে, অন্ততঃ দু' সপ্তাহ থাকব।

তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না যে, এ-যুগেও অঘটন ঘটে—

প্রার্থনায় অসুখ সারে। নাই করলে। আমি দেখেছি সারতে, আর একবার নয়—অনেক বার। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি একথার উল্লেখ করলাম তোমাকে প্রার্থনার শক্তি সম্বন্ধে ভাগবতী কথা শোনাতে নয়—শুধু জানাতে, কেন আমাদের মুসুরী যেতে হয়েছিল সদলবলে—বারো জন: আমাদের ছ'জনের পরে যোগ দিলেন এসে (ইন্দিরার ভজনাবলী ও আমার Miracles Do Still Happen-এর প্রকাশক) শ্রী মোহন সাহানি, তাঁর স্ত্রী, ছুই মেয়ে ও ছুই ছেলে। পরে ইন্দিরার স্বামীও যোগ দেন।

মুসুরীতে গিয়ে প্রায় রোজই ভজন করতাম। একদিন ওখানে 'গান্ধি হলে' এবং কমুনিটি প্রোজেক্ট হলেও ভজন করলাম। উভয়ত্রই বহু লোকে সাড়া দিল ভক্তিতে। ভারত আজও ভারত, হিন্দু আজও কৃষ্ণ রাধা মুরলী নূপুর শিব-দুর্গা-স্তোত্র দোঁহায় সাড়া দেয় মনেপ্রাণে—শুধু শিক্ষিত হিন্দুরা নয়, অশিক্ষিতরাও। তাই মুসুরীতে একাদিক্রমে প্রায় দিন পনের গাইলাম পরমানন্দে এবং প্রত্যহই ভিড় হ'ত, সাভয় হোটেলের মস্ত ঘর ভ'রে যেত।

ঠিক এই সময়ে চীন আক্রমণ করল আমাদের দেশ এবং আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ফের তারস্বরে সুরু করলাম স্বদেশী গান গাইতে—প্রত্যহ। পরে স্থির করলাম, সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকাও তুলতে হবে। কিন্তু হাতে সময় কম, তাছাড়া দেশে অশান্তি চাঞ্চল্য চারদিকেই—দিল্লীতে অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই কন্সার্ট দিতে পারলাম না। এতে আমি দুঃখ পেয়েছি।

প্রাণবন্ত মানুষ কোন দেশেই কোন অনড় অচল নীতি মেনে চলতে পারে না—চললে পথভ্রষ্ট হয়। প্রায় সব সাধারণ নীতির ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ব্যতিক্রমকে জানতে হয়। তুমি জান শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরি আশ্রমে রাজনীতির চর্চা করতে আমাদের নিষেধ করতেন, কিন্তু হিটলারের বীভৎস নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারকে শুধু যে সমর্থন করেন তাই নয়—আশ্রমের তহবিল থেকে

টাকা পাঠান—যা তিনি কখনও করেন নি। এ-দৃষ্টান্ত দিলাম কেন তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। আমি এ সূত্রে বলতে চাই খুব জোর দিয়েই যে দেশের দারুণ বিপদে প্রতি ধার্মিকেরই কর্তব্য নিজের ধর্মকে বিপন্ন মনে ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান—সাধ্যমত কিছু অন্ততঃ দেশের সেবা করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ শ্রীঅরবিন্দ জীবিত থাকলে আমাকে বলতেনই বলতেন দেশের জন্যে গান গেয়ে টাকা তুলতে। না, এ আমার শুধু বিশ্বাস নয়—প্রাণের সানন্দ সাড়া। তাই আমি আজকাল মন্দিরে প্রতিদিন স্বদেশী গান ও মার্চ-সঙ্গীত গাই ও সাধক-সাধিকাদের শেখাই। ইচ্ছা আছে পুনাতে একটি হলে গেয়ে কিছু টাকা তুলব—যদি যুদ্ধ চলে অবশ্য। প্রার্থনা করি—চীনের সুমতি হোক—সে অধর্ম ছেড়ে ধর্মকে বরণ করুক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিকদের সুমতি হওয়া দুর্ঘট ব'লে বোধ হয় এ-আশা দুরাশা যে, এ-নাস্তিক আবহেও চীন শুনবে "ধর্মের কাহিনী"।

যাই হোক ঠাকুরের কৃপায় এর পরে আমার স্বদেশী গান গাওয়া সফল হয়েছিল—শুধু মুসুরী ও দিল্লীতেই নয়, রাজস্থানেও বহু লোককে স্বদেশী গানে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলাম এ-৬৬ বৎসর বয়সেও। দিনের পর দিন গেয়েছি জয়পুরে ও উদয়পুরে স্বদেশী গান ভজনের সঙ্গে—যে কথা অন্য একটি চিঠিতে লিখেছি—আমার আর এক প্রিয়বন্ধু শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্রকে। আমি এ-দুটি চিঠিই-তোমাকে পাঠাচ্ছি এক সঙ্গে এই অনুরোধ জানিয়ে যে তুমি প'ড়ে পাঠিয়ে দেবে প্রবাসীতে ছাপতে—শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী মহাশয়কে। আমার বিশ্বাস যে, এ-চিঠি দুটির মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি সানন্দেই ছাপবেন, কেননা এর বাদী সুর—আত্মকথা নয়।

আমি জানি অনেকেই আপত্তি করবেন, আমি এত হাল্কা ভাষায় নানা গুরুগম্ভীর কথা পেশ করেছি ব'লে। কি করব নারায়ণ? আমাকে চলতেই হবে নিজের ছন্দে, নিজের বুদ্ধি বিচার বিবেক মেনে। আমার বুদ্ধি বলে যে, বিশেষ ক'রে খোলা চিঠির ভাষায়

যত বেশি যাবে মৌখিক ইডিয়ম ততই ভাল। বার্নাড শ'র একটি উক্তি আমার মন নিয়েছে : ভাল শৈলী (style) বলব তাকেই যা জোরাল (effective); আমার মনে হয় আমার লৈখিক ভাষা আজকাল আত্মস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে শুধু যে সত্যিকার জোরাল হয়েছে তাই নয়—ভাষায় আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। একথা সত্য হোক বা না হোক, আমি মানি গীতার কথা : "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" ইতি

তোমার নিত্যশুভার্থী দিলীপ-দা।

নভেম্বর, ১৯৬২
উদয়পুর, সার্কিট হাউস

শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্র স্নেহাস্পদেষু,

অনেকদিন বাদে তোমাকে লিখতে বসেছি। এখানে শেষ করতে পারব ব'লে ভরসা হয় না, কারণ, আজ, কাল ও পরশু তিন দিনই গাইতে হবে—একদিন আবার কলেজে। তাই এ-চিঠি পুনায় ফিরে পাঠাব। তবু যতটা পারি লিখে রাখি—মনে নানা ভাবোদয় হচ্ছে, এ অপরূপ স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরী স্মৃতি-দিয়ে ঘেরা রাজ্যে।

কিসের স্বপ্ন? হ্রদ, বীথি, শৈলমালা, হ্রদের-বুক-থেকে ওঠা মর্মর প্রাসাদ। সে না দেখলে ব'লে বোঝাবার নয়। রূপের বর্ণনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলি না। কিন্তু সেজন্যে চাই কাব্যকে তলব করা, অথবা কাব্যধর্মী গদ্য। কিন্তু তার আবার মুশকিল এই যে, যে দেখে নি তার মনে হবে—উচ্ছ্বাস।—তাই থাক বর্ণনা। এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, চারদিকে শ্রী ও মহিমার আগুন লেগেছে, দেখতে দেখতে সত্যিই আবেশ আসে।

কিন্তু স্মৃতির কথা বলতেই হবে কিছু।

আমি কীর্তন গেয়ে এসেছি সে কবে থেকে! পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি। শৈশবে পিতৃদেবের মুখে শুনতাম কত যে কীর্তন: ছিল বসি সে কুসুম কাননে, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখপানে—আরও কত গান কত কীর্তনীর মুখে: যমুনা এই কি তুমি সেই যমুনা, শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ, সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি…ইত্যাদি। অতঃপর কৈশোরে শুনি পিতৃদেবের অবিস্মরণীয় গৌরকীর্তন: ও কে গান গেয়ে চ'লে যায়। আজও মনে পড়ে, এ-গানটি গাইতে গাইতে পিতৃদেবের গৌরবর্ণ মুখ ভক্তির আবেগে রাঙা হয়ে ওঠা—বিশেষ ক'রে তাঁর অবিস্মরণীয় চরণটি গাইবার সময়ে: "ও কে দেবতা ভিখারী মানবদুয়ারে দেখে যা রে তোরা দেখে যা।" তাঁর মুখে এ-গানটি শুনতে শুনতে অভক্তকেও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখেছি।

তার পরেই আমার জীবনে এল হিন্দি ভজন পর্ব। এ-পর্বে তুলসীদাসের গানই প্রথম আসে; দ্বিতীয়, অপরাজেয় মীরা ভজন। বোলপুরে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের কাছে শিখি সহজ সুরে—চাকর রাখো জী, শুনি ময় হরি আওনকী আওয়াজ, চিতনন্দন বিলমাঈ, তুমরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা, নয়ন ললচাওত জিয়ারা উদাসী, ইত্যাদি। পরে এ-গানগুলি নতুন ক'রে সুর দিয়ে নানা সভায় ও আসরে গাওয়া সুরু করতে না করতে বাইরণের মতন প্রখ্যাত হয়ে উঠি—হিন্দু মহাসভায়, কাশীতে—১৯১৮ সালে। বিশেষ ক'রে আমার মুখে মীরাভজন শুনে অবাঙালী বহু গণ্যমান্য ভক্ত তথা অভক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন: স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ভগবান্ দাস, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, যুগলকিশোর বিড়লা, শ্রীপ্রকাশ…আরও কত। ফলে একদিকে আমার খুব ক্ষতি হয়—আমি নিজেকে বাহবা দিতে সুরু করি। কিন্তু লাভও আসে অন্য পথ দিয়ে—গাইতে গাইতে মীরার বিরহব্যথা,

ব্যাকুলতা ও ভক্তির অন্দরমহলে কিছুটা রস প্রাণে জেগে ওঠে ও আমি মীরাকে ভালবেসে ফেলি।

অতঃপর যৌবনে বিলেতেও গাইতাম মীরাভজন নানা মজলিশে। স্থির করি—দেশে ফিরে মীরার আরও ভজন সংগ্রহ করবই করব—এমন ভজন আর কে লিখেছে হিন্দি ভাষায়? তখন কি জানি ইন্দিরাই আমার মীরাভজন তৃষ্ণা মেটাবে সমাধিতে শোনা সাত-আটশো মীরাভজন রচনা ক'রে? কিন্তু সে পরের কথা থাক্।

দেশে ফিরে নানা স্থানে নানা মীরাভজন সংগ্রহ করি—কারণ, মীরাভজনাবলীর বইও তখনো প্রকাশিত হয় নি বা হ'লেও আমার হাতে পড়ে নি। কাজেই আমাকে হাত পাততে হ'ল প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশের নানা অখ্যাতনামা গায়কের কাছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই বাণী অশুদ্ধ ছিল, তবু মীরার নানা চরণ মনকে আমার চমকে দিত: "সন্ত দেখ দৌড় আঈ জগত দেখ রোঈ।" কী অপরূপ!—জগৎ দেখে যে মহিমময়ীর বুকে কান্না জেগে উঠত, সে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত শুধু সাধুসন্তকে দেখে। "দাসী মীরা লাল শ্যাম হোনী থী সো হোঈ"—মীরা দাসী শ্যামপ্রিয়, এইই ত মীরার নিয়তি—তাই যা হবার তা হ'ল, না হয়ে উপায় ছিল না ব'লে। আমার জীবনে কৃষ্ণভক্তি প্রথম জেগে উঠেছিল কৈশোরে। যৌবনে সে-ভক্তিকে উস্কে দেয় প্রধানতঃ মীরার পথেঘাটে-গাওয়া ভজন।

জয়পুরে আসি ১৯২৪ সালে। ছিলাম সংসার সেনদের মনোজ্ঞ নিলয়ে। আমার আপ্যায়নকর্তা বীরেন সেন আমাকে নিয়ে গেলেন বিখ্যাত গায়িকা গহরবাঈয়ের ওখানে। তিনি শুধু সাদরে আমাকে গান শোনানো নয়, আমার গানও শুনলেন বাহবা দিয়ে। মনে আছে—তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছিল অতুলপ্রসাদের একটি বাংলা গান: "ও আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?" অতুলদা প্রায়ই আমাকে হেসে বলতেন—বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার করেছেন তিনি। শাখী মানে ত পাখী নয়—গাছ, আর বিমান

মানে ত আকাশ নয়—উড়ো জাহাজ। তবু অম্লান-বদনে আমি গাইতাম শাখীকে পাখী ও বিমানকে আকাশ মনে ক'রে। Where ignorance is bliss, it is folly to be wise—বলে না ?

কিন্তু এ-ও অবান্তর। জয়পুরে এসে আমার সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল একটি চমৎকার মীরাভজন পেয়ে—গায়ক ফুলজি ভট্ট-র কাছে : কৃপা ভঈ সদ্‌গুরু আপনে কী বেরে বেরে হরি নাম লিয়ো রে। এ-গানটির ভাবার্থ—সব ভক্তকেই তুমি দেখা দিলে ঠাকুর, কেবল মীরার কান্নায় সাড়া দেবার বেলায়ই কিনা ঘুমিয়ে পড়লে—"সব ভক্তন কে সহায় হো হরি, মেরে বের কহাঁ সোয় রহিয়োরে ?" গানটি কত জায়গায়ই যে গাইতাম ও কত লোকের চোখেই যে জল ঝরত—সে কী বলব ? এ-গানটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর রাগটি ছিল শুদ্ধ—দেশী আসাবরী—আরোহণে জৌনপুরীর ঠাট সা রে মা পা…ইত্যাদি। অবরোহণে ভৈরবী—কোমল রেখাবের সোপানে। কাজেই ওস্তাদরাও আমার পিঠ চাপড়াতেন। সময়ে সময়ে—"বহুৎ আচ্ছা বেটা—মহশাল্লা।"

সেই জয়পুরে ফের এলাম দিল্লীতে তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে। তোমাকে বলেছিলাম যে জয়পুরে যাচ্ছি দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে—শ্রীরাধার একটি শাদা পাথরের বিগ্রহ সংগ্রহ করতে আর সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তুলতে, যদি সম্ভব হয়।

দু'টি উদ্দেশ্যেই লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে। চমৎকার রাধাবিগ্রহ পেয়েছি এবং কিছু টাকা অন্ততঃ তুলেছি। কিভাবে—বলি।

তুমি ষ্টেশনে এসেছিলে দিল্লীতে। দেখলে তো আমাদের বিরাট্ দল—রাউণ্ড ডজন্ যাকে বলে : আমার সঙ্গে ইন্দিরা, শ্রীকান্ত (ব্রিগেডিয়ার শিব থাডানি), একান্ত (রিচার্ড মিলার), প্রশান্ত (ডন ট্যাক্সে), ইন্দিরার কিশোর পুত্র প্রেমল, শ্রীমোহন সাহানি সপরিবারে—স্ত্রী, দুই কন্যা ও দুই পুত্র সহ। এ-রেজিমেণ্ট নিয়ে কোন ছাপোষা মনিষ্যির স্কন্ধে ভর করা ত সম্ভব নয়। কাজেই শরণ নিতে হ'ল

রাজস্থানের রাজ্যপাল সম্পূর্ণানন্দজির। ইনি শুধু পণ্ডিত নন, আমার গান ভালবাসেন। তাই সুবিধা হ'য়ে গেল, তাঁর রাজভবনেই উঠলাম সদলবলে। তাঁকে লিখেছিলাম সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তুলতে চাই। তিনি খুশী হলেন: প্রথম দিন এসেই গাইলাম তাঁর বিরাট্ হলে—৮ই অক্টোবর রাত্রে। প্রধানমন্ত্রী মোহনলাল সুখদিয়াজীও এসেছিলেন। তিন-চারশ অতিথি। সবাই কিছু কিছু দিলেন সৈন্যদের বাক্সে।

পরদিন বিরাট্ রামলীলা মাঠে গান হ'ল। দশটাকা পাঁচটাকা, তিনটাকা, দু'টাকা টিকিট। প্রায় তিন হাজার লোকের সামনে গাইতে হ'ল। দেহের গঙ্গাবাগে পা হ'লেও কণ্ঠ এখনও মরণাপন্ন হয় নি। তাই পরপর দুদিনই তারস্বরেই গাইলাম দেড়ঘণ্টা ধ'রে। জমেছিল বিশেষ ক'রে ইন্দিরার রচিত—"হম্ ভারতকে হৈঁ রখবালে দেশকা বল হম্ প্রাণ হৈঁ হম্"—সৈন্যদের মার্চসঙ্গীত—"লা মার্সেয়েজ্"-এর মতন। গানটি সেনাপতি কারিয়াপ্পার অনুরোধেই ইন্দিরা বেঁধেছিল ১৯৫০ সালে ও আমি বম্বেতে প্রথম সুর দিয়ে গেয়েছিলাম, তারপর আর বড় গাওয়া হয় নি। কম্যুনিষ্ট জগত্তারক চৈনিকরা আমাদের দেশে অভাবনীয় "আত্মরক্ষার্থে" হু হু ক'রে ট্যাঙ্ক-আদি নিয়ে দু'হাজার বর্গমাইল অধিকার করার পরে এ-গানটি ফের গাওয়া সুরু করি মুসুরীতে—অক্টোবরের শেষে। দিল্লীতেও প্রতি আসরে গাইতাম তুমি স্বকর্ণেই শুনেছ। জয়পুরে এ-গানটি প্রথম দিন সম্পূর্ণানন্দজির রাজপ্রাসাদে গাইলাম সদলবলে হিন্দি, ইংরাজীতে। গানটি সবাইকেই চমকে দিয়েছিল জয়পুরে—বিশেষ ক'রে রামলীলা উদ্যানে স্বদেশী পাখোয়াজ ও বিলিতি ড্রামের সঙ্গতে দ্বাদশী কোরাসে। তুমি যদি শুনতে ত তুমিও নিশ্চয় বলতে: "হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।"

এ-দুটি আসরে ভজন তথা পিতৃদেবের স্বদেশী গানও গেয়েছিলাম। এবং বলাই বেশি—তাঁর স্বদেশী গান সবাইকেই মুগ্ধ করেছিল—আরও এইজন্যে যে, তাঁর প্রতি গানই আমি বাংলায় গেয়ে ইংরাজী ও

হিন্দিতেও গাইতাম একই সুরে—তুমি ত শুনেছ কতবারই। বাংলা-দেশে আমার প্রিয়বন্ধুরা এসব গানের হিন্দি বা ইংরাজী অনুবাদে সাড়া দেন না। কিন্তু এ দেশের লোকে দিল সোৎসাহেই। তাই মনটা খুশী আছে—অনুবাদেও গানগুলি উদ্দীপক হয়েছিল দেখে।

জয়পুরে এবার একটি নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। সরকারী পাবলিক রিলেশনস্ অফিসে গিয়ে নানা প্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে আমাকে তাঁদের রকমারি প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল। কেমন প্রশ্ন—শুনবে নমুনা?—আপনি সাধু হয়েও সৈন্যদের জন্যে টাকা তুলতে চাইলেন কী ভেবে? সাধুদের সমাজ-সেবায় নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আপনার কি মত?...ইত্যাদি। উত্তরে অনেক কথাই বলতে হ'ল। শুনে ওরা খুশী হ'ল কি না বলতে পারি না, তবে বন্ধুবর্গীয় কয়েকজন প্রীত হ'লেন, যখন আমি বললাম খাঁটি সাধুরা সমাজ সম্বন্ধে উদাসীন নন—বস্তুতঃ তাঁরা ভগবৎসাধনায় ভগবৎকৃপার আবাহন ক'রে সমাজের বহু হিতসাধনই ক'রে থাকেন—ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গাবতরণের উপমা দেওয়া চলে। সংসারীরা সাধুদের দেখাশুনা করবে, প্রতিদানে সাধুরা সংসারীদের পরম সার্থকতার—শান্তির, জ্ঞানের ও ভক্তির—দিশা দেবেন—এই লেনদেনই ঐহিক সংসারী ও সাধু বৈরাগীকে আনন্দের রাখীবন্ধনে বাঁধে। তবে সাধুদের তলব ক'রে সমাজসেবকের রেজিমেণ্ট গঠন করলে ধর্ম যাবে রসাতলে, একথাও বললাম সমানই জোর দিয়ে। বললাম: সংসারে একদল ধার্মিক থাকা দরকার যাঁরা চিরদিন থাকবেন মুক্তিসাধক, ধ্যানমন্ত্রী, ভক্তিপন্থী ও জীবন্মুক্ত। এঁরাই সমাজকে ধারণ করেন, কারণ আধ্যাত্মিকতাই হ'ল নৈতিকতার শেষ ভিত্তি। তাই সাধুদের স্বাধীনতা দিতেই হবে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে। না দিলে তারা ধ্যানলোকের আলোর দিশা পেতে পারে না। ভগবৎকরুণার আবাহন হয় বহু তপস্যায় তবে।

শেষে বললাম—আমি চিরদিন নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক মেনেই চ'লে এসেছি। চৈনিকরা যখন আমাদের পুণ্যভূমি আক্রমণ করে,

তখন আমার মন রুখে উঠে বলে—স্বদেশী গান গাইতেই হবে নানা সভায়। তারপরে ইন্দিরা বলে—গান গেয়ে কিছু টাকা তোলা মন্দ কি? মন তৎক্ষণাৎ সায় দিল আমার। ভাবলাম—গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে আড়াই লক্ষ টাকা তুলেছি দশ-বার বৎসরে, সৈন্যদের জন্যে কি কয়েক মাসে দশ-বিশ হাজারও তুলতে পারব না? বয়স একটু বেশি হয়েছে সত্যি, তাই হয়ত বেশি টাকা তোলার জন্যে আগেকার মতন খাটতে পারব না। কিন্তু যতটা সয় ততটা খাটতে বাধা কি? সাধু হ'লে দেশকে ভালবাসতে পারা যাবে না একথা ত কোনও শাস্ত্রেই লেখে নি। বরং আরও বেশি ভালবাসতে হবে দেশের মাটিকে, জগন্মাতাকে বরণ ক'রে। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র ত চিরন্তন মন্ত্রই বটে, কাজেই সাধু হ'লে দেশের জন্যে গান করতে বাধবে কেন? গীতায় কি ঠাকুর বলেন নি—সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মৎপ্রাসাদাদবাপ্নোতি পদং শাশ্বতম্ অব্যয়ম্?" অর্থাৎ,—যে কোন কাজ ভগবদাশ্রয়ী হয়ে করলে ভগবৎপ্রসাদে পরম পদ মিলবেই মিলবে। (অবশ্য কুকর্ম নয়—সৎকর্ম। কেননা যাকে ভালবাসা যায় তাকে কেউ কু কিছু দিতে পারে না, সু-ই দেয়—এই প্রেমের চিরন্তন ধর্ম) কিন্তু আর না, ধর্মের কথা বেশি বলা সমীচীন নয়—বিশেষ এ যুগের "সেকুলার" রাষ্ট্রে। কে জানে কর্তারা ডরিয়ে উঠে বলবেন হয়ত (ডি. এল. রায়ের ঢঙে):

ঐ যায় যায় যায়!
ফের ধর্ম ধর্ম ক'রে বুঝি কর্ম ডোবে হায়!

মনে প'ড়ে গেল এক রাজনৈতিক ধনুর্ধরের কথা। তিনি পণ্ডিচেরীতে এসে আমাকে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলেন যে, তিনি কর্মগাণ্ডীবী—নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পান না, কেবল বুঝতে পারছেন না টঙ্কার দিতে দিতে ঠিক পথে চলেছেন কি না। তা'তে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন: পথে আলোর দেখা না পেলে আলোর জন্যে

অপেক্ষা করাই ভাল, দাপিয়ে চ'লে খানায় পড়ার চেয়ে। এযুগে আমরা ভাবি কর্মসিদ্ধিই একমাত্র সত্য, ব্যস্ততার মধ্যেই সুস্থতা, ইত্যাদি। কিন্তু ধ্যান প্রেমপন্থী আত্মজ্যোতি সমাহিতির মধ্যেই যে শুভকর্মের চিরন্তন প্রেরণা নিহিত, ভগবৎমুখী জ্ঞানালোকের মধ্যেই যে পরম সার্থকতার নিত্যদিশা অন্বেষণীয়—একথা এ যুগের সেই সব কর্মবীরদের বলা বৃথা, যাঁদের ধারণা—কর্মব্যস্ততার উপনামই কর্মযোগ। মরুক্ গে—জয়পুরের কথায় ফিরে আসি।

পাবলিক রিলেশনস্ প্রতিষ্ঠানের এক দিক্‌পাল মন্ত্রী আমার কাছে এসে বললেন—জনসাধারণকে সরকার নানাভাবে বিশ্ববুদ্ধি ও বিশ্বজ্ঞান দিয়ে বিশ্বকর্মা ক'রে তুলতে চাইছেন কি ভাবে আমার দেখা দরকার। এই মানুষটি বড় সদাশয়—মিষ্টভাষী, মিষ্টহাসি, দরদী। কেবল জানেন না কি চাইছেন তিনি। তাই মনে করেন কার্লমার্ক্স ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই মহর্ষি। তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন (উভয়-সঙ্কটে প'ড়ে) যে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও যেমন কার্লমার্ক্সের কথা নেওয়া যায় না, তেমনি কার্লমার্ক্সের সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দের কথা নেওয়া চলে না। অথচ উভয়েই মহর্ষি! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!!

বন্ধুটির নাম দেওয়া যাক সদাশয় শাস্ত্রী। এঁর সঙ্গে ব'নে গেল, ইনি শুধু আমার লেখার অনুরাগী ব'লেই নয়—পিতৃদেবের লেখারও বিশেষ ভক্ত। বললেন: রাজস্থানে পিতৃদেবের "মেবারপতন" নাটকের খুব নামডাক। আমিও মনে করি, এ নাটকটি পিতৃদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, তথা জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকদের অন্যতম, তাই ভাব জমে গেল। তারপর দেখি—কী আনন্দ!—শ্রীঅরবিন্দেরও নানা লেখা ইনি সত্যিই প'ড়ে ফেলেছেন, ও শুধু পড়া নয়, পড়ে কিছু কিঞ্চিৎ লাভবান্‌ও হয়েছেন বৈকি। ভাবলাম মনে মনে—বিচিত্র মানুষের চরিত্র। আমার এক কম্যুনিষ্ট নওজোয়ান বন্ধু বলতেন (ধন্য ভাবুক!) যে, শ্রীঅরবিন্দের লাইফ ডিভাইন ও কার্লমার্ক্সের দাস কাপিতাল এযুগের দুই সেরা সহোদর জীবনবেদ! শ্রীঅরবিন্দ—যিনি ভগবৎ-

সাধনকেই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করেন এবং রাষ্ট্রের চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব নিষ্পিষ্ট হচ্ছে ব'লে তাঁর নানা রচনায়ই দুঃখ করেছেন —তাঁর অন্তরঙ্গ সতীর্থ কিনি ? না, উগ্রপন্থী কার্লমার্ক্স, যিনি রাষ্ট্রের একাধিপত্যকে বরণ করেছেন মনে-প্রাণে, হিংসা-দ্বেষকেই আবাহন করেছেন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর যুদ্ধে—যিনি (রাসেলের ভাষায়) প্রচার ক'রে এসেছেন পরমানন্দে gospel of hatred! কিন্তু সদাশয় শাস্ত্রীর চিন্তা কাঁচা তথা ঝাপসা হ'লেও প্রাণটি উদার ও দরদী—দিল-খোলা যাকে বলে। জ্বলন্ত উৎসাহ তাঁর সব তাতেই। প্রাণবান্ পুরুষ, তাই যাই ধরুন না কেন—ধরেন মোক্ষম আঁকড়ে! এর ফল ফলেছিল পরে—উদয়পুরে, কিন্তু এখানেই সে কাহিনী বলা ভাল। হ'ল কি, তিনি ও জয়পুরের এক মন্ত্রী (তাঁর নাম হো'ক কর্মবীর দোবে) আমার নামে এক চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছাপিয়ে ফেললেন, আমার ও ইন্দিরার ছবি সমেত। সেই সঙ্গে ছিল একাসনে তোলা ছবি শ্রীসুখাদিয়া ও সম্পূর্ণানন্দের। সে পুস্তিকাটি পেলাম আমি উদয়পুরে এসে। চমৎকার ছাপা কাগজ ছবি—কেবল আমার সম্বন্ধে নানা উচ্ছ্বাসে ভরা—দিলীপকুমার হেন-তেন, কত কি। প্রায় মার্কিন বিজ্ঞাপন। আমি যে এত চমৎকার লোক একথা আবিষ্কার ক'রে আমি অবশ্য উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমার শত্রুরা ও বিশেষ ক'রে আমার বাংলাদেশের বন্ধুরা কেউই বিশ্বাস করবেন না, বলবেন : পাগল না ক্ষ্যাপা! কিন্তু এখানেই সদাশয় শাস্ত্রীর উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি নয়। হ'ল কি, এখানে (উদয়পুরে) পরশু —১৫ই সন্ধ্যায় একটি বড় প্রেক্ষাগৃহে আমার গানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সদলবলে পৌঁছালাম ১২ই। সকাল দশটায় সদাশয় শাস্ত্রী ও কর্মবীর দোবে জয়পুর থেকে যুগলে মোটরে রওনা হ'লেন—১৩ই। আট ঘণ্টায় মোটর আসে জয়পুর থেকে উদয়পুর, কিন্তু শাস্ত্রীজি দোবেজিকে মোটরে শোনাতে লাগলেন আমার ইংরাজী নাটক Sri Chaitanya ও নানা ইংরাজী কবিতা। ফলে মোটরে পশ্চিম

মুখে মোড় নিয়ে আজমীড়ে না পৌঁছে দক্ষিণে বেঁকে হু হু ক'রে চ'লে পৌঁছলেন টঙ্ক-এ। সেখানে তাঁদের চৈতন্য হ'ল যে খুশখেয়ালে চ'লে কাব্যরসিক হ'লে বেঠিক পথের পথিক হ'তে হয়। সে যাই হোক, অতঃপর তাঁরা শর্টকাটে কাজ হাঁসিল করতে যেয়ে পড়লেন এক নদীর চরে—মোটর হ'ল পঙ্কগর্ভে কর্ণের রথের মত অচল। এক জীপ এল মোটরকে উত্থিত করতে, কিন্তু ওমা, সেও পঙ্কের আলিঙ্গনে হাঁসফাঁস করতে করতে হ'ল স্থাবর। তখন অগত্যা সনাতন গোযানকে এসে মোটরযানকে উদ্ধার করতে হ'ল—পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে, বলে না? অবশেষে জীপে চ'ড়ে উভয়ে উদয়পুরে পৌঁছলেন রাত আড়াইটেয়। মনে রেখো আজমীরের পথে এলে দুই বন্ধু উদয়পুর পৌঁছতেন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এবং তার পর আমাকে নিয়ে যেতেন নক্ষত্রবেগে কলাভবনে। সেখানে আহূত সুভদ্র ও সুভদ্রারা এসেওছিলেন অনেকেই, কিন্তু সদাব্যস্ত কর্মকর্তারাই গায়েব, কাজেই তাঁরা করেন কি—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। এদিকে সার্কিট হাউসে আমরা (হায় রে) "সেজেগুজে রইলাম ব'সে (কেউ) নিয়ে গেল না কপালদোষে"—অবস্থা! হাসব, না কাঁদব বল ত? কেবল ভাব বন্ধু, একবার বন্ধুযুগলের দিলীপ কাব্যপ্রীতির বহরের কথাটা ভাবো—কবিতার মোহন কূজনে কি না পশ্চিম ছেড়ে দক্ষিণে নিরুদ্দেশ যাত্রা! দিগ্বিদিক্ কাণ্ডজ্ঞান হারানো—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! এরও পরে কে বলবে—এ যুগে কবির আদর নেই? ধন্য সদাশয় শাস্ত্রী! ধন্য কর্মবীর দোবে!

সদাশয় শাস্ত্রীর সদাশয়তার আর একটি প্রমাণ মিলল তাঁর দিলীপবিজ্ঞপ্তি-পুস্তিকায় একটি উদ্ধৃতিতে। উদ্ধৃতিটি তিনি আমার Eyes of Light কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা থেকে আহরণ করেছেন, যথা:

So Thee to adore in rhythm and rhyme
And perfect songs the heavens I move:

Flirting with art is a waste of time,
But touching Thee through art is Love.

(ছন্দে ও মিলে তোমার ভজন গাহিতেই সাধি আমি
বিপুল স্বর্গসাধনা—ফুটিতে মধুকীর্তনে গানে :
শিল্পবিলাস—মায়া সে, যখন সে তোমারে নমে স্বামী,
তখনই সে হয় ধন্য তৃপ্ত মঞ্জরি' প্রেমে প্রাণে।)

সদাশয় শাস্ত্রীর কৃপায় কিন্তু এই সূত্রে আমি একটি আত্ম-আবিষ্কার করলাম যেন নতুন ক'রে : আত্মাদর অভিমান কি ভাবে ঠাঁই পায় মায়া যুক্তির প্রশ্রয়ে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই : আমেরিকায় এভাবে আত্মবিজ্ঞপ্তির প্রশ্রয় দিয়েছি নানা রিপোর্টারকে নিজের নানা কীর্তিকলাপের কথা ব'লে। এ-অপকর্মের ফলে আত্মগ্লানি হয়েছে বৈকি, তবু নিজেকে সাশ্রুনেত্রে বুঝিয়েছি—যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। কিন্তু এদেশে—বিশেষ পুণায় মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে আর এ-অপকর্ম করি নি এবং মনে মনে পণ নিয়েছিলাম, করব না কিছুতেই। কিন্তু সৈন্যদের জন্যে টাকা তুলব একথা শাস্ত্রীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উৎফুল্ল হয়ে এইভাবে আমার বিজ্ঞাপন জাহির করেছিলেন সত্যিই আমাকে না ব'লে। আমি বললে নিশ্চয়ই বারণ করতাম। কিন্তু মজা এই যে, যখন আমাকে না ব'লে এভাবে আমার গুণপনার আমেরিকা-ভঙ্গিম বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিলেন, তখন দেখলাম—কই, খুব দুঃখিত ত হই নি, যদিও মুখে বলেছিলাম তারস্বরেই যে, এ অশোভন। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি ক'রে কে কবে ভগবান্ পেয়েছে ? তাই এতে খুশী হওয়ার জন্যেও পরে আমাকে সত্যিই পরিতাপ করতে হয়েছিল। কারণ, এ-সূত্রে আত্মপ্রচার সাধুকে সাজে না। তাই বলছি—নতুন ক'রে বুঝলাম কত ছলে আত্মাদর এসে অলক্ষ্যে গহন মনে বাসা বাঁধে ও প্রশ্রয় পেলে পুষ্টকায় হ'য়ে ওঠে শনৈঃ শনৈঃ। এসূত্রে মনে পড়ে ভগবান রমণ মহর্ষির একটি কথিকা। আমাকে তিনি বলেছিলেন :

"বাবা, মায়া নানা ভাবে এসে এমনই মন ভোলায় যে তাকে অনেক সময়ে মায়া ব'লে চেনাই যায় না—বিশেষ ক'রে এই আত্মাদরের আরামবাগে। কি ভাবে, বলি শোন। এক ধনী মানী পরিবারের কুলতিলক ভগবৎসন্ধানে সর্বত্যাগী হয়ে বনে গিয়ে বহু বৎসর তপস্যা করেন একটি কুটিরে। একদা তাঁর এক অনুরাগী বন্ধু সেই বনে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে তাঁকে: 'ভগবানের জন্যে কত কৃচ্ছ্রসাধনই না করেছ তুমি, বন্ধু! ধন্য ধন্য হে সর্বত্যাগী!' ধনীপুত্র সত্যিই ত্যাগ করেছিলেন অনেক কিছু—সুখ আরাম বিলাস স্ত্রীপুত্র পরিবার। কিন্তু এই স্তবগানে তিনি খুশী হ'য়েছিলেন এতশত তপস্যার পরেও।" ব'লে আমার দিকে চেয়ে রমণ মহর্ষি বলেছিলেন: "ভগবান্ তাঁর কাছ থেকে এখনও অনেক দূরে।"

কথিকাটি আমাকে অভিভূত করেছিল। কারণ এই সূত্রে আমি যেন নতুন ক'রে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের গহন মনে প্রশংসার প্রচ্ছন্ন তৃষ্ণা কত গভীর দুরপনেয়। তাই না পরমহংসদেব বলতেন: "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল! কিন্তু আমি কি যায়—অশ্বত্থ গাছ যতই কাটো দেখবে এক নতুন শিকড় বেরিয়েছে কোত্থেকে। তাই আমি যখন যাবে না—থাক্ শালা দাস আমি হয়ে।"

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি। ধান ভানতে শিবের গীত। হোক গে—যখন এ সৎকথাই বটে। তাছাড়া আত্মপ্রচারের প্রায়শ্চিত্তও ত চাই। আশা করি ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হব—আত্মাদরকে এভাবে প্রশ্রয় দেব না আর। এবার ফিরে আসি জয়-পুরের প্রসঙ্গে। অবহিত হও।

জয়পুরে গেলাম একদিন অম্বর প্রাসাদে। ১৯২৪এ যাইনি, কারণ ঐতিহাসিক ঔৎসুক্য আমার আদৌ নেই, তুমি জানো নিশ্চয়ই। তবু অম্বর প্রাসাদে এবার গেলাম, শুনলাম ব'লে যে সেখানে একটি

মন্দিরে মীরা এসেছিলেন। মন্দিরটির নাম জগৎশিরোমণি মন্দির। এই সূত্রে অম্বর প্রাসাদও দেখতে হ'ল বৈ কি। শুনলাম, রাজা মানসিংহ ছিলেন এই বিরাট্ প্রাসাদে। কি আশ্চর্য কারুকাজ—বিশাল অঙ্গন প্রাচীর ছাদ কত কি! সব জড়িয়ে একটি মহিমময় অট্টালিকা মানতেই হবে। কেবল মন খুঁৎ খুঁৎ করে ভাবতে—একটি রাজার সুখের জন্যে কি বিপুল শ্রম ও অর্থব্যয়? তবে এ ত সার্বভৌম ও সার্বকালিক অপকর্ম: সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই ধনীদের জন্যে, দুর্গতদের কথা ভাবে কে—কার প্রাণ কাঁদে তাদের জন্যে? স্বামী বিবেকানন্দের মতন প্রাণ সাধুদের মধ্যেই বা ক'টা?

যাই হোক, এখানে আমাদের মস্ত বাঁচায়ো এই যে, আমরা রাজারাজড়া নই, মধ্যবিত্ত। পরে উদয়পুরের মহারাজার আরো বিশাল প্রাসাদ দেখে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম কিন্তু এই ভেবে যে, অন্ততঃ আমরা এভাবে বিলাসে গা ভাসিয়ে দিই নি। তবু মানতেই হবে যে আমরাও (মানে মধ্যবিত্তরাও) দুর্গতদের কথা বেশি ভাবি না। সত্যিকার সাধুদের কথা অবশ্য আলাদা, কারণ তাঁরা স্বভাবে বিলাসী হ'তেই পারেন না, যেহেতু অনাসক্ত ও নিরভিমান হ'লে খাঁটি সাধু হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে বিবেকদংশন হয় বৈকি: সত্যিই ভগবান্‌ই আমার একনাথ বটে ত, না নিজেকে ঠকাচ্ছি, আরাম পেয়ে তারই মধ্যে বিশ্রাম চাইছি না ত? ভরসা এই যে, এ পর্যন্ত অন্ততঃ এই চাওয়ার ক্ষেত্রে কোন আত্মপ্রতারণার খবর পাই নি। কিন্তু পরে কবে কি নব আত্ম-আবিষ্কার ক'রে অনুতাপে তনু দগ্ধ হবে—কে জানে? বঙ্কুবিহারীর কোন্ চালটা বাঁকা নয় বল? ডাকেন তিনি বাঁশির ডাকে, ঘরছাড়া ক'রে বসান পথে—পরে দেখা দেবার নামটি নেই! প্রতিষ্ঠা দেন, ধনমানও দেন অনেক সময়েই, পরে বলেন মুচকে হেসে, "বেশ বেশ! এইসব নিয়ে যখন খুশী আছ তখন আমার আর কি দরকার?" একটু শান্তি; একটু আনন্দ একটু ভক্তিতেই মন নেচে ওঠে, বলে: বা রে আমি!—করুণা

পাই, কিন্তু তাকে ভাঙিয়ে খেতে না খেতে সেও গায়েব। বলিহারি!

জয়পুরে কতরকম লোকের সঙ্গে যে আলাপ হ'ল দুটিমাত্র গানের আসরের পরে সে কি বলব? কাউকে মনে হ'ল দরদী, কাউকে বা সুদূর—যেমন হয় জীবনের পথ চলায়। কেবল গানের গুণীর ক্ষেত্রে একটি অভিনব অভিজ্ঞতা হয়—বলতেন প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ—যে, যার সঙ্গে কোন মিলই নেই চলনে, বলনে, চিন্তায়, দৃষ্টিতে—গানের আসরে মনে হয় অনেক দিনের চেনা যেন। পরে এরাও অবশ্য দূরে স'রে যায়—জীবন চলমান, কোন কিছুই দাঁড়ায় না—প্রায় জলে দাগ টানার মত, তবু দাগ যখন পড়ে তখন তাকে ত দাগই বলতে হবে।

এম্‌নি একটি মানুষ জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায় শ্রীমোহনসিং মেতা। দেখতে ভাল লাগে, কথা কইতে মন চায়, কাছে এলে প্রাণ খুশী হয়। আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন জয়পুর কলেজে ভাষণ দিতে। গিয়ে দেখি হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী মাটিতে ব'সে, আর সিঁড়ির উপরে চাতালে আমার, ইন্দিরার ও মেতা মহোদয়ের চেয়ার। বললাম বাধ্য হয়ে যা মনে এল; কম্যুনিষ্ট চীনের পরস্বাপহারী, হিংসার পথে চিরজীবী স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার হাঁকডাক; দেশের দুর্দিনের কথা; নিজের নিয়তি, জাতির নিয়তি এখন আমাদের নিজের হাতে আসার কথা; মানুষের মানুষের কাছে আসার কথা; দুঃসাহসের প্রতিমূর্তি তেজস্বিতার মূর্ত বিগ্রহ সুভাষের কথা। ওরা সাড়া দিল মহোৎসাহেই। সবশেষে বললাম: "কিন্তু এবার বলতে চাই একটু ধর্মের কথা—কারণ, ভারত বেঁচে আছে আজও এই জন্যে যে, আমাদের বহু গ্লানি সত্ত্বেও ধর্ম এখনও এদেশে জীবন্ত। তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ মন তার সমস্ত প্রাণশক্তি ঢেলে ধর্মের বীজকে আজও লালন করে গহন অন্তরে। এই কথাই শিখেছি আমি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দের চরণে। তাই জেনেছি যে ধর্ম ধারণ করে

এই উপলব্ধিই আমাদের কাছে বরণীয়—সব আগে। আমরা বিদেশ থেকে শিখব অনেক কিছু, জানব অনেক কিছু; কিন্তু মানব সব আগে ধর্মকে—অর্থাৎ আত্মিক ইষ্টার্থকে—spiritual values; এ যদি না মানি তবে আমরা বড়জোর হয়ে দাঁড়াব নাজি, চীন বা রুশদের মতন সিংহনাদী হিংসাবাদী রণদৃপ্ত জাতি—অস্ত্র শানাব, গর্জন করব, লোভ ও শক্তির মদে মাতোয়ারা হয়ে ধুমধাম করব দু'দিন—তার পরে যাবই যাব নিভে, যেমন সব ঐহিক গর্বী জাতিই নিভে গেছে দু'দিন হাঁকডাক ক'রে। আর ধর্ম বলতে বোঝায় চিরন্তন-প্রীতি। সাময়িক অনেক কিছু যে আমাদের মাতিয়ে তোলে, অল্পের মোহ যে অনল্পকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে—এরই ত নাম মায়া, কারণ যা ক্ষণায়ু তাকে চিরায়ু মনে করার অন্তে আসেই আসে অবসাদ। খতিয়ে শুধু সত্যই হয় জয়ী—মিথ্যা যায়ই যায় লীন হয়ে। আর মানুষ সত্যের সত্য ব'লে বরণ করে শুধু তাকেই যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয়।" ব'লে শেষে গাইলাম একটি বিখ্যাত ইংরেজী স্তোত্র Abide with me: "এতে দু'টি চরণ আছে আমার অতি প্রিয়"—বললাম আমি—

"Change and decay in all around I see:
O Thou who changest not abide with me"...

ইত্যাদি।

ছাত্ররা শুধু যে সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিল তাই নয়, পর দিন এল রাজভবনে আমাদের গাওয়া "হম ভারতকে" ও Abide with me গানটি টেপরেকর্ড করতে। শ্রীমেতা পিতৃদেবের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির ইংরেজী অনুবাদ আমার মুখে শুনেছিলেন লণ্ডনে। সেটিও রেকর্ড করা হ'ল তাঁর অনুরোধে।

জয়পুরের শেষ অধ্যায় এল ১১ই তারিখে সকালে বড় মনোরম পরিবেশে—বাঙালীদের দুর্গাবাড়ীতে সেখানে গাইলাম পিতৃদেবের চিরনবীন আনন্দগীতি—"ধনধান্যপুষ্পভরা"—বাংলায়, ইংরেজীতে,

হিন্দীতে ও সংস্কৃতে। গাইতে গাইতে আবেশ এসে গেল। ধরলাম শ্যামাসঙ্গীত ইন্দিরার একটি হিন্দী ভজনের অনুবাদ :

শ্রীচরণে লুটিয়ে ডাকি, কোলে
তুলে নে মা এসে।
বল্ মা তারা, মাকে ছেড়ে থাকে
শিশু কোন্ বিদেশে !
সাঙ্গ হ'ল দিনের খেলা,
শরণ দে মা সন্ধ্যেবেলা,
কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানি গান শোনা মা মধুর রেশে।...

দীর্ঘ গান—সবটুকুর উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য হবে। এটুকু উদ্ধৃত করলাম শুধু এই কথাটি জানতে যে, গানটি শুনে শুধু বাঙালী নরনারী নয়, অবাঙালী অনেকেও চোখের জল ফেলেছিলেন—বলেছিলেন গাঢ়কণ্ঠে : "এমন আনন্দ আমরা দুর্গাবাড়ীতে কখনও পাই নি।" এরি ত নাম চিরন্তন নিত্যানন্দের আবাহন। অথচ লোকলস্কর ধুমধাম যুদ্ধবিগ্রহ ফেঁপে উঠে আড়াল ক'রে এই শাশ্বত উপলব্ধিটিকে যে আমাদের অন্তরাত্মা আশ্রয় পায় জাঁকজমকে নয়, আরাম বিলাস যশমান ধনজনের প্রসাদে নয়, তার শেষ শিথান জগন্মাতার কোলেই বটে—ভক্তি ও শান্তিই হ'ল জীবনের শেষ ঠাঁই—আলোর আলো, যার ক্ষয় নেই, ভয় নেই, আছে শুধু জয়জয়কার—বিন্দুর সমাপ্তি সিন্ধুবুকে, স্ফুলিঙ্গের মজ্জন চিরশিখায়, জীবের শরণ চাওয়া শিবের পায়ে। ওঁ শান্তিঃ।

এর পরে এলাম উদয়পুরে নবনির্মিত সার্কিট হাউসে। ১৯২৪-এ উদয়পুরে ছিলাম তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্যে। এবার উঠলাম রাজভবনেই বলব—অর্থাৎ সার্কিট হাউসে।

একটি পাহাড়ের চূড়ায় এই সুরম্য দুগ্ধশুভ্র বিলাস-ভবনটি আসীন। এখানেই সাহেবরা এসে থাকেন যাঁরা

ছাড়পত্র পান। আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন শ্রীসম্পূর্ণানন্দ। তাঁর জয় হোক্। এমন অনিন্দনীয় আলোভরা আরামনিলয় কমই দেখেছি। বারান্দা প্রশস্ত—সকালে রোজ বেড়াই প্রায় এক ঘণ্টা, দু'দিকে হ্রদ ও পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে। রাজরথ হাজির—কোথায় না বেড়ালাম বল? গেলাম হ্রদের মধ্যে অবস্থিত দু'টি রাজপ্রাসাদে মোটর বোটে। একটিতে এখন হোটেল রচনার কাজ চলেছে। চারদিকে জলের ও পাহাড়ের বেষ্টনীর মাঝে এই দ্বীপ হোটেলটি হবে একটি আশ্চর্য বিলাস-নিকেতন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হোটেলটি থেকে দেখা যাবে বিশাল রাজপ্রাসাদ, যেখানে মেয়ারে রাণারা রাজত্ব ক'রে গেছেন। কি বিরাট প্রাসাদ—দরবার গৃহ, চাতাল, প্রাচীর, সে বর্ণনা ক'রে লাভ কি? সুন্দরী রমণীর রূপ বর্ণনার মত বিশালতার স্তবগান ত পণ্ডশ্রমই বটে। উপমা দিয়ে একটু-আধটু আভাস দেওয়া যায় মানি, কিন্তু তার জন্যেও চাই বিকশিত প্রতিভা বা বিশিষ্ট্য নৈপুণ্য। তাছাড়া প্রাসাদ অট্টালিকা স্মৃতিসৌধ জাতীয় ঐতিহাসিক আলোকস্তম্ভে আমার মন কোনদিনই সাড়া দেয় নি। তাই শুধু বলি যাতে আমার মন সাড়া দিয়েছিল: দু'টি ছবিতে। একটি রাণা প্রতাপের ছবি—রণতুরঙ্গ চৈতক তাঁকে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসেছে প্রভুর প্রাণ বাঁচাতে। কিন্তু প্রভুকে বাঁচাল সে নিজের প্রাণ দিয়ে। রক্তক্ষরণে মরণাপন্ন চৈতকের সে কি করুণ চাহনি! দেখে চোখে জল আসে। অন্য ছবিটি বিখ্যাত হলদি-ঘাটের যুদ্ধের। কত যানবাহন অশ্ব গজ রথাদি! প্রকাণ্ড তৈলচিত্র। কেবল মনে হ'ল সঙ্গে সঙ্গে—বীরত্বের ছবি বটে, কেবল হায় রে, এই বীরত্ব সাহস তেজ যদি বিশ্বপ্রেমের সেবার উপচার হ'ত, হ'ত যদি ভগবানের চরণার্থী নৈবেদ্য! দেশভক্তির আমি বিরোধী নই। অহিংসবাদী নই। গীতার বাণীতেই আমার মন সাড়া দেয়: ধর্মযুদ্ধ শুধু যে সমর্থনীয় তাই নয়, করণীয় বরণীয়ও বটে। তাই ত

মিথ্যা ও নিষ্ঠুরতার পুরোহিত কাপালিক চীনের আক্রমণের পর থেকে প্রত্যহই পিতৃদেবের বাঁধা স্বদেশী গান ও ইন্দিরার রচিত সৈন্যদের মার্চ-সঙ্গীত "হম ভারতকে হৈঁ রখবালে" গেয়ে বেড়াচ্ছি, যাতে আমাদের সবার মনেই দেশভক্তির উদ্দীপনা চারিয়ে যায়। রাজস্থানে এসে সুবিধা হ'ল এই যে, এখানকার বহু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবার গান করার সুযোগ মিলল ঠাকুরের দয়ায়। প্রথম জয়পুর কলেজে—যার কথা বলেছি, তারপরে উদয়পুরে মহারাজা ভূপাল কলেজে গাইলাম—আমার এক গুরুভাই ভীমসেন—সেখানকার প্রিন্সিপাল—তাঁর সাদর নিমন্ত্রণে। সবশেষে গাইলাম ও বক্তৃতা দিলাম ভূপাল নোব্‌ল্‌স কলেজের প্রিন্সিপালের নিমন্ত্রণে। ছু'টি আমারই পিতৃদেবের "ভারত আমার" ও "হম ভারতকে" জমেছিল আমাদের দ্বাদশী কোরাসে। জয়পুরেও বহুলোক সাড়া দিয়েছিল যার ফলে জয়পুর রেডিওর কর্তা রেকর্ড করলেন গানগুলি ও পরে আমাকে লিখলেন প্রতাপভূষণ ষ্টেশন ডিরেক্টর—১৪ই নভেম্বরে : "We wish to use a few of your songs recorded during your stay at Jaipur for broad-cast purposes. They would suit the mood and temper of the present time." তারপরেই অনুমতি চাওয়া ও আমাদের তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে অনুমতি দেওয়া। এইই ত আমি চাইছি, গান গেয়ে শুধু সৈন্যদের জন্যে টাকা তুলতে নয়—"বাপকা বেটা সিপাইকো ঘোড়া" মন্ত্র জপতে জপতে কিছু অন্ততঃ উদ্দীপনা জাগাতে দেশ-ভক্তির তথা ভগবদ্ভক্তির।

উদয়পুরে ভূপাল মহারাজের বিরাট্ কলেজে এক নতুন ধরনের প্রেক্ষাগৃহ দেখলাম : গায়ক ছাউনির নিচে মঞ্চাসীন, আর শ্রোতারা খোলা আকাশে গড়ানে মাঠে চেয়ারে শোভমান। প্রায় পাঁচ-ছশো ছাত্রছাত্রী এসেছিল। কাজেই গাইলাম দুর্দান্ত প্রতাপে, প্রাণের মায়া ছেড়ে এই ৬৬ বৎসর বয়সেও। আমার এক বন্ধু দিল্লীতে

সেদিন বলেছিলেন: "করছ কি দিলীপ, এতক্ষণ ধ'রে গাওয়া! মরবে যে!" অর্থাৎ কোনমতে টিমটিম ক'রে বেঁচে থাকাই পন্থা—যেহেতু আপনি বাঁচলে বাপের নাম—শাস্ত্রেই রয়েছে, অকাট্য! যাহোক যা বলছিলাম: গাইলাম পিতৃদেবের 'ভারত আমার' ইংরাজি ও হিন্দীতে। ইংরাজি অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দের, হিন্দী ইন্দিরার। ধরতে না ধরতে গান জমে উঠল। সবাই সাগ্রহে নীরবে শুনলেন—যাকে বলে "পিনপড়া নৈঃশব্দ্যের মাঝে।" শেষে গাইলাম ইন্দিরার বাঁধা "দীপক জল না সারী রাত"—মীরাভজন। এরা ইন্দিরার মীরাভজন শুনে এত মুগ্ধ হয়েছে যে নোব্‌ল্‌স্‌ কলেজের প্রিন্সিপাল চাইলেন তার ভজনাবলী। এঁর কথা একটু না বললেই নয়।

ইনি ধার্মিক মানুষ। আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি ভাগবতের মহাভক্ত, এখন গুরু খুঁজছেন···ইত্যাদি। অতএব আলাপে মন ব'সে গেল দেখতে দেখতে। শেষে বন্ধুবর আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের কলেজেও ভাষণ দিতে, তথা গান করতে। আমি বললাম, তথাস্তু। কিন্তু তারপরেই তিনি বললেন যে, তাঁর কলেজে এসে কিন্তু গাইতে হবে ক্ল্যাসিকাল গান—খেয়াল ও ঠুংরি। আমি বললাম, আমি স্বদেশী গান ও ভজন ছাড়া আর কোনও গান গাই না। তিনি নাছোড়বন্দ, বললেন: "আপনি চমৎকার খেয়াল ঠুংরি গাইতেন—কেন গাইবেন না শুনি।" আমি বিরক্ত হয়ে তাঁকে পরদিন শ্রীকান্তকে দিয়ে টেলিফোন করালাম যে, আমি গুরুদেবের কাছে যোগদীক্ষা নেওয়ার পর থেকে খেয়াল ঠুংরি গজল জাতীয় নিছক শিল্পসঙ্গীত বা জাঁকালো ওস্তাদী গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, আমি আজকাল চাই শুধু সেই সব গান গাইতে যা ভগবান্‌কে নিবেদন করতে পারি সহজেই—অর্থাৎ কি না ভক্তিসঙ্গীত। তাঁকে পাঠাতে ইচ্ছা হ'ল পুস্তিকাটি যা ছাপিয়েছেন সদাশয় শাস্ত্রী। কিন্তু ভাবলাম তিনি আমাকে বিপন্ন করলেও তাঁকে অপ্রতিভ করা আমার পক্ষে অশোভন হবে—আরও এই জন্যে যে মানুষটি সত্যই সদাশয়,

তাছাড়া পীড়াপীড়ি করেছিলেন ওস্তাদী গান ভালবাসেন ব'লেই ত। এ প্রীতিকে কিছু অপরাধ বলা চলে না, এক সময়ে আমিও ত সত্যিই গভীরভাবে ভালবাসতাম ওস্তাদী গান। মরুক গে। বলি তারপর কি হ'ল।

নোব্‌ল্‌স্‌ কলেজের এই প্রিন্সিপালটির নাম—শ্রীশ্যামসুন্দর চতুর্বেদী—আমার টেলিফোনের পরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে লোক পাঠালেন —কিছু মনে করবেন না, ক্ষমা করবেন....ইত্যাদি। অগত্যা রাজি হ'তে হ'ল। পরদিন গিয়ে পড়লাম তাঁর কলেজের হলে—প্রায় হু'তিনশো ছাত্রের মধ্যে। গানের আগে বললাম ভারতের দেশাত্মবোধের কথা। যা বললাম তার সারমর্ম এই যে, আমাদের দেশপ্রীতি মাতৃপূজা—অপরের রাজ্য জয় করার বিক্রমভিত্তিও নয়, ঐহিক রাষ্ট্রবাদও নয়। আমাদের মন্ত্র হ'ল— দেশ শুধু দেহধাত্রী নয়—প্রাণদেবী, জগন্মাতা। ব'লে গাইলাম বন্দেমাতরম্—ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমলদল-বিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, গাইলাম সকলের অনুরোধে পিতৃদেবের বিখ্যাত,

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর
বিরাট্ দৈন্যে দুঃখে তাহার শৃঙ্গের সম, অটল স্থির।

রাণা প্রতাপের দেশ ত, ওরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল—অবশ্য আমি অর্থটা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আগে। তার পর গাইলাম ইন্দিরার "হমে ভারতকে।" ওদের গীতি-শিক্ষক চাইলেন স্বরলিপি। আমি বললাম, "পরশু মহারাজ ভূপাল কলেজে ওরা এ গানটি টেপ্‌রেকর্ড ক'রে নিয়েছে।" তবু ছাড়ে না ওস্তাদজি। বলেন: আমি স্বরলিপি ক'রে নেব···ইত্যাদি। আমি বললাম: "টেপ্‌রেকর্ড থেকে শিখে নেবেন, আমরা আজই প্রস্থান করছি। কাজেই সময় নেই।" এ বাদানুবাদের উল্লেখ করলাম ওদের আগ্রহের খবর দিতে। ইন্দিরাকে

শেষে বললাম, "এবার আমাদের রাজস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ছয়টি : এখানে সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তোলা ; ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশভক্তির উদ্দীপনা জাগানো ; 'হম ভারতকে' গানটি প্রচার ; জয়পুরে শ্রীরাধার সুন্দর প্রতিমা সংগ্রহ ; সর্ব্বোপরি উদয়পুরে মীরার মন্দির দর্শন ও মীরার ভক্তির কিছু ছিটেফোঁটা পাওয়া এ-পুণ্য আবহে। এই ছয়টি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে।" এই ছয়টির মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যটি অবশ্য শেষেরটি—অর্থাৎ মীরার দেশে এসে তাঁর পুণ্য স্মৃতিজড়িত পরিবেশে কিছু ভক্তির প্রেরণা পাওয়া নতুন ক'রে।

যদি বলি উদয়পুর রূপে অতুলন মানসমোহন রাজধানী, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। জল স্থল প্রাসাদ ও শৈলমালার সৌন্দর্য সমন্বয়ে উদয়পুরের জুড়ি মেলা ভার—বটেই ত। কিন্তু এ সৌন্দর্য চিত্তচমৎকারী, হ'লেও আমাদের—মানে, অন্ততঃ আমার ও ইন্দিরার—মনপ্রাণ দুলে উঠেছিল শুধু মীরার কথা ভেবে। তাই তাঁর কথা কিছু বলা অবান্তর হবে না এ প্রসঙ্গে।

ভারতবর্ষে ভগবানের জন্যে মানুষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গৃহ পরিজন ছেড়েছে অগুন্তিবার। সাধু-সন্ত মুনি-ঋষি যোগী যতি অবধূত কাপালিক শৈব শাক্ত বৈষ্ণব—আরও কত সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মপন্থী সংসার ছেড়ে বৈরাগী হয়েছে, অচিনের টানে অদেখার অভিসারে চলতে চেয়ে। কিন্তু মীরার সর্বস্ব ছাড়ার মধ্যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী রোমান্স আছে। পর্দানশীনা মহারাণী। তিনশ' দাসী ছিল তাঁর। থাকতেন বিশাল অট্টালিকায় অসূর্যম্পশ্যা সুন্দরী সুরকন্যা। এ হেন মহীয়সী সব ছেড়ে হ'লেন কি না সর্বহারা, কুলত্যাগিনী! তাঁকে দেবর ও ননদ দিল বিষ, সে-বিষে তাঁর প্রাণ ছুটে গেল না, ছুটে গেল শুধু সংসার-বন্ধন—লোকলজ্জা কুলমর্যাদা কলঙ্কের ভয়। তিনি গাইলেন সোচ্ছ্বাসে :

সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঈ
অব তো বাত ফৈল গঈ জানৈ সব কোঈ।

সাধুদের সঙ্গে ক'রে লোকলজ্জা খুইয়েছি—সবাই জেনেছে মীরা কলঙ্কিনী, আর কিসের ভয় ?

কিন্তু কেন তিনি ছাড়লেন এ-বিলাস, ধুমধাম—কেন গাইলেন :

মেরে তো গিরিধর গোপাল দূসরো না কোই
মাতা ছোড়ী পিতা ছোড়ে ছোড়ে সগে সোঈ।

গোপালকে বরণ করার ফলে মাতা পিতা ভাই সব হারালাম। কেন হারালেন ? না,

সন্ত সদা সীস পর নাম হৃদে হোঈ
দাসী মীরা লাল শ্যাম হোনী থী সো হোঈ।

সাধুকে রাখলাম মাথায়, হরিনামকে হৃদয়ে—মনে হ'লাম শ্যামের দাসী, তিনি হলেন আমার নাথ—এই-ই যে মীরার নিয়তি।

কিন্তু এ হেন একনাথকে বরণের পর লাভ কী হ'ল ? না, কাঁটাপথ—আর অন্ধকার। দুঃখকষ্ট অনশন নিরাশ্রয় পদযাত্রা ভিক্ষা। শুধু তাই নয়, যার জন্যে সব ছেড়েছেন সেই গিরিধর নাগরও হলেন অদৃশ্য। তখনও শুধু কোথা কৃষ্ণ, কোথা নাথ ব'লে কান্না :

প্যারে দরসন দীজো আয় !
তুম বিন রহো ন জায়।
জল বিন কমল, চন্দ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী,
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈন দিন
বিরহ কলেজো খায়।
মীরা দাসী জনম জনমকী পড়ী তুমহারে পায়।

এ কি দিব্য প্রেমোন্মাদ—সর্বজনপূজ্যা মহারাণীর ভিখারিণী হ'য়ে শুধু পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ানো প্রিয়তমের দর্শনের পিপাসায় !

এ-রোমান্সের কি তুলনা আছে ? না, শুধু কান্নাই নয়, সেই কান্নার প্রকাশ তাঁর অবিস্মরণীয় বিরহের গীতাঞ্জলিতে :

তুময়ে কারণ সব সুখ ছোড়্যা অব মোহে কুঁ তরসাও ?
বিরহ বিথা লাগী উর অন্দর সো প্রভু আয় বুঝাও।
অব ছোড়া নহি বনে প্রভুজি চরণকে পাস বুলাও
মীরা দাসী জনম জনমকী অঙ্গসে অঙ্গ লগাও।

এহেন অপরূপার আবেশ বুঝি জড়িয়ে আছে উদয়পুরে—সর্বত্রই যেন তাঁর স্মৃতি। মহারাণার বিরাট্ প্রাসাদে পূজারী দেখাল মীরার সোনার গোপালকে, বলল, এই বিগ্রহই তিনি পূজা করতেন তাই হৃদমন্দির থেকে এখানে আনা হয়েছে—রোজ তাঁর পূজারতি হয় এখনও। এই বিরাট্ প্রাসাদের অন্দরমহলেই ত তিনি থাকতেন দাস-দাসী সহচরী নিয়ে। পরে এককথায় সব ছেড়ে রাণী হলেন প্রেমদিবানী—প্রেমের ভিখারিণী, গোপালের সেবাদাসী! পথে পথে গেয়ে বেড়ালেন তাঁর অবিস্মরণীয় গান—সে কত গান, বিরহমিলন ব্যথায় ভরা, প্রেমের আকুলতায় উদ্বেল। শুধু বিলাসকে বিদায় দেওয়াই ত নয়, সুনামকে বিসর্জন দিয়ে কুলত্যাগিনী উপাধি বরণ করা, অসূর্যম্পশ্যা রাণীর দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে গান গেয়ে বেড়ান,—কোথায় গোপাল, দেখা দাও, দাও রাঙা পায়ে ঠাঁই :

অঁসু অন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বেল বোঈ
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী থী সো হোঈ।

এই ছিল তাঁর নিয়তি—রাণীর হওয়া পথের ভিখারিণী, বিলাসিনীর হওয়া চীরধারিণী। এ-রোমান্সের কি জুড়ি আছে কোথাও এ-জগতে ? বলতে পারো—

তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ
মেরে গিরিধর গোপাল দূসরো ন কোঈ।

শুধু তুমি প্রভু, শুধু তুমি—আর কেউ নয়, শুধু তুমি।

মীরা কহে : লগন লগী ঐসী য়ে ন টুটে
রূঠে না গোপালজী তূ জগ রহে য়া ছুটে।

তুমি এমন প্রেম দিলে প্রভু, যার বাঁধন কখনও ছিন্ন হবার নয়—জগৎ যায় যাক্, শুধু তুমি মুখ ফিরিয়ো না গোপাল!

শেষ দিনের আগের দিন সকালে গেলাম সবাই মিলে সাত আট মাইল দূরে আর একটি হ্রদতটে। এ যে হ্রদের প্রাসাদের দেশ—এখানে ওখানে সেখানে গিরিমালার মাঝে হ্রদ ও প্রাসাদ। এ-হ্রদটির ঠিক উপরেই ফের একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ। শুনলাম, রাণা প্রতাপ সিংহ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। এখানে প্রতাপ সিংহেরও কত যে স্মৃতিচিহ্ন! সব কিছুর সঙ্গেই তার স্মৃতি জড়াতে ভালোবাসে এরা মনে হ'ল। তাই ঠিক বিশ্বাস হ'ল না, এত দূরে নির্জন বনস্থলীতে তিনি এসে থাকতেন মাঝে মাঝে। কারণ, এ-প্রাসাদটির কাছাকাছিও কোন বাড়ী কি কুটির নেই। অথচ কী সুন্দর পরিবেশ! শৈলমালা পাহারা দিচ্ছে চারদিকেই—ধূসর সন্ন্যাসী প্রহরী। সামনেই নীল হ্রদ। যোগী তপস্বীর ধ্যানের স্থান।

বললাম ইন্দিরাকে : "আমি যদি রাজা হতাম ত এখানে একটি মঠ বসাতাম। যোগী তপস্বীরা এসে থাকতেন এখানে ইচ্ছামত।"

এ যুগ নৈঃশব্দ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই হয়ত এ মৌন বিজন প্রাসাদটির পরিবেশ এত ভালো লাগল। মনে হ'ল, কে জানে, হয়ত মহারাণী মীরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন—হয়ত তাঁরই ইচ্ছায় এ-প্রাসাদটি ভোজরাজ নির্মাণ করেছিলেন এহেন নির্জন বনস্থলীতে। সেদিন সন্ধ্যায় উদয়সাগরের ধার দিয়ে তিন মাইল পরিক্রমা করতে করতেও এই কথাই মনে হচ্ছিল অস্তসূর্যের রাঙা আলোয়।

এক-একটা সন্ধ্যা হঠাৎ এসে দেখা দেয় অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে। জয়পুর ও উদয়পুরে রোজই গান করার সূত্রে লোকের ভিড় জমত সকাল-সন্ধ্যা। উদয়পুর থেকে বিদায় নেওয়ার আগের দিন গোধূলি লগ্নে হঠাৎ এ আশ্চর্য নির্জনতার ভাব হয়ত তাই এত অভিভূত করেছিল ইন্দিরা আর আমাকে। আকাশে গলা সোনার দীপ্তি ঝলমল করছে। স্তরে স্তরে রাঙা মেঘের মুখে সেই অপরূপ আভা··· হ্রদের জলে সাঁতার দিয়ে চলেছে হাজারো সোনার ঝালর। এক সার পাখী উড়ে যায়···দেখতে দেখতে মনে হয়, দূর দিগন্তে যেন একটি উড়ন্ত সাপ উধাও হয়েছে হেলে দুলে। এক-আধজন স্নানার্থী স্নান করছে। মন উদাস হয় যায়···কে জানে, এখানে হয়ত মহারাণী মীরা ভোরবেলা বেড়াতে আসতেন। তিনি ত পর্দা মানতেন না? ছিলেন স্বভাববিদ্রোহিণী। অন্ততঃ কল্পনা করতেও ভালো লাগে। লাগবে না-ই বা কেন? যাঁকে ভক্তি ক'রে এসেছি আকৈশোর—যাঁর গান আজ ভারতবর্ষে দীনদুঃখীর মুখেও শোনা যায়—(আজমীড়ে ট্রেনে বিনোবা ভাবের শিষ্যরাও একদিন গাইছিল তাঁর বিখ্যাত "চাকর রাখো জি") সেই মহীয়সী যোগিনী কবি, ভিখারিণী রাজকন্যার সঙ্গে এ-উদাস মধুর দৃশ্যের যোগ কল্পনা ক'রেও মন ওঠে আর্দ্র হয়ে। মনে হয়—কিসে থেকে কি হয় জীবনে কেউ কি জানে? রাজবালা মীরা শৈশবে গুরু সনাতনের কাছে পেয়েছিলেন একটি কৃষ্ণবিগ্রহ। বিবাহ হ'ল তাঁর মহারাণা ভোজরাজের সঙ্গে। ভোজরাজ তাঁকে ভালোবাসতেন কিন্তু বুঝতে পারেন নি—যে কাহিনী লিখেছি আমি আমার "ভিখারিণী রাজকন্যা" নাটকে। ভোজরাজ যুদ্ধে নিহত হওয়ার পরে মীরা মন্দিরে গোপালের পূজায় আরও উজিয়ে উঠলেন, সুরু করলেন নাচ গান: "ময় গিরধর আগে নাচুঙ্গি"। যোগী যতি সাধু সন্তদের সঙ্গে মেলামেশা সুরু করলেন। কলঙ্কিনী নাম রটল। ননদ উদাবাঈ ও দেবর বিক্রম সিং তাঁকে বিষ দিল শাস্তি দিতে। সে বিষ তিনি পান করতে না করতে